পুণ্য-প্রতিমা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

১০৮।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, ডিভাইন প্রেস হইতে
শ্রীহরিচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।
১৩২১

উৎসর্গ।

পরম স্নেহাস্পদ

শ্রীমান্ রাধানাথ মাজি

ভায়া দীর্ঘায় নিরাপদেষু—

ভাই রাধু! কি এক শুভ মুহূর্ত্তে তোমার সহিত আমার দেখা হয়, সেই শুভ মুহূর্ত্তেই স্মৃতিটুকু হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিতে আমার পুণ্যপ্রতিমাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। ইতি,

বসিরহাট
১লা বৈশাখ
১৩২১ সাল। }

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুণ্য-প্রতিমা।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উনবিংশ বৎসর বয়সে সুরেশচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তিনি কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর আর তাঁহার ডাক্তারী পড়া হইল না। কারণ, সংসারে তিনিই জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার আর অন্য অভিভাবক ছিল না, সুতরাং সংসারের সমস্ত ভারই তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত সুবর্ণগ্রামে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান। গ্রামখানি যদিও আয়তনে ক্ষুদ্র, তথাপি সেখানে অধিকাংশ ভদ্র-লোকেরই আবাসস্থল ছিল। পশ্চিমে কলনাদিনী জাহ্নবী গ্রাম-খানির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া মন্থরগতিতে প্রবাহিত।

ক্ষুদ্র পল্লীতে সুরেশচন্দ্রের পিতার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। জমীদারী সরকারে কার্য্য করিয়া তিনি সংসার পালন করিতে কখনও কোন কষ্টভোগ করেন নাই। তাঁহার বাটীতে ক্রিয়া-কলাপ প্রায়ই হইত, মধ্যাহ্নে উপস্থিত হইলে অভুক্ত অতিথি তাঁহার আতিথ্য-সৎকারে পরিতৃপ্ত হইত, দায়গ্রস্ত হইয়া অভাব জানাইলে তিনি দায়-ভারগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না; কিন্তু অপরিণামদর্শী সুরেশচন্দ্রের পিতা সারাজীবন অর্থোপার্জ্জন করিয়াও কিছুই সঞ্চিত করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে সুরেশচন্দ্র অবলম্বনহীন হইলেন।

বাটীতে অপরিণতবয়স্ক নাবালক একটি ভ্রাতা, দুইটি ভগিনী —একটি বিধবা, অপরটি বিবাহযোগ্যা অনূঢ়া, তাঁহার সহধর্ম্মিণী আর তিনি। এতগুলি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদনের ভার তাঁহার উপর পতিত হইল, তাহার উপর ভগিনীটির বিবাহ দিতে হইবে, ভ্রাতাকে লেখাপড়া শিখাইতে হইবে।

এইরূপ ঘোরতর দায়িত্বপূর্ণ সংসার-ভারগ্রস্ত হইয়া সুরেশচন্দ্র কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি চক্ষে যেন অন্ধকার দেখিলেন; মাথার উপর অভিভাবক এমন কেহ নাই যে, তাঁহাকে সৎপরামর্শ দেয়। তাঁহার পিতৃবিয়োগ-কাতর হৃদয় সংসার চিন্তায় আরও অধিকতর কাতর হইয়া উঠিল। শারীর-

তত্ত্বে তিনি তিন বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু সকলই বৃথা হইল। কারণ, আর ত তিনি সে বিদ্যা আলোচনা করিতে পারিবেন না। অর্থও নাই, অবসরও নাই। কিরূপে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতে পারিবেন, এই চিন্তাই তাঁহাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল।

পিতার মৃত্যুর পর প্রায় ছয় মাস কাল অতিবাহিত হইল। সঞ্চিত অর্থ যাহা কিছু ছিল, এমন কি, তাঁহার বিধবা ভগিনীর হস্তেও যাহা ছিল, সমস্তই নিঃশেষ হইল। আর ত উপায় নাই, দিন ত আর চলে না। হায় ঈশ্বর! এতগুলি প্রাণী কি অনশনে প্রাণত্যাগ করিবে? ডাক্তারী করিয়া যদি দু'পয়সা রোজগার করিতে পারেন, সুরেশচন্দ্র সে চেষ্টাও করিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে একেবারে অকৃতকার্য্য হইলেন। গ্রামে দুই তিন জন বহুদর্শী ডাক্তার ছিলেন; অর্থ দিয়া ডাকিতে হইলে লোকে তাঁহা-দিগকেই ডাকিত। কেবল দুঃখী লোকে—যাহাদের অর্থ দিবার আদৌ সামর্থ্য ছিল না, তাহারাই সুরেশচন্দ্রকে ডাকিত।

এইরূপ বিষম অবস্থায় অকস্মাৎ একদিন তাঁহার পিতার মনিববাটী হইতে এক জন পাইক তাঁহাকে ডাকিতে আসিল। সুরেশচন্দ্র কালবিলম্ব না করিয়া জমিদার-বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মাথার উপর সর্ব্বশক্তিমান্ নারায়ণ আছেন, সংসার-সমুদ্রে তিনিই বিপদের কর্ণধার। সুরেশচন্দ্র চাকরী পাইলেন, মাসিক বেতন একশত মুদ্রা।

হুগলী জেলার অন্তর্গত নারায়ণপুরের সীতানাথ রায় এক জন বড় জমিদার—রাজাবিশেষ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী বিদ্যালয়, অতিথিশালা আর দাতব্য-চিকিৎসালয়

ছিল। এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য এক জন চিকিৎসক প্রয়োজন হয়। জমিদার বাবু (সুরেশচন্দ্রের পিতা যাঁহার অধীনে চাকরী করিতেন) সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন এবং সুরেশচন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন। সুরেশ বাবুর আরও সুবিধা হইল, কারণ, সীতানাথ বাবুর ষ্টেটের ম্যানেজার তাঁহার পিতার মনিবের সহপাঠী বাল্য-বন্ধু। দরখাস্ত দ্বারা জমিদার বাবু সুরেশচন্দ্রের চাকরী মঞ্জুর করাইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

——:०:——

বিদেশযাত্রার জন্য সুরেশচন্দ্র প্রস্তুত হইলেন। পঞ্চদশ-বর্ষীয়া ভার্য্যা সুলোচনা স্বামীর প্রবাস-গমনোপযোগী দ্রব্যাদি সজ্জিত করিতেছেন এবং ম্লান-নেত্রে এক একবার স্বামীর মুখ-পানে অপাঙ্গে নিরীক্ষণ করিতেছেন। সুরেশচন্দ্র শয্যার উপর অঙ্গ ঢালিয়া অনিমেষ-নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন।

তিন বৎসর হইল সুরেশের বিবাহ হইয়াছে, তখন তাঁহার বয়স ষোল বৎসর। সেই বৎসরেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় ডাক্তারী শিক্ষা করিতে যাত্রা করেন।

বিবাহের পর হইতে দাম্পত্য-প্রণয়ের আস্বাদ অনুভব করিতে তাঁহারা বড় একটা অবসর পান নাই। স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত সুরেশচন্দ্রকে বিদেশেই অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। কলিকাতার মেশে থাকিয়া সুরেশচন্দ্র সুলোচনার অস্পষ্ট হস্তাক্ষরের দুই চারি ছত্র প্রণয়লিপির অপেক্ষা করিতেন, সুলোচনাও মধ্যাহ্নকালে আহা-রান্তে সমবয়স্কা প্রতিবেশিনীদিগের সহিত গল্প করিতে করিতে ডাকপিয়নের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। পোষ্টাফিস মাঝে থাকিয়া তাঁহাদের উভয়ের প্রণয়বন্ধন যাহা কিছু দৃঢ় করিয়াছিল।

পিতার মৃত্যুর পর এই ছয় মাসকাল তাঁহারা দুই জনে একত্রে বাস করেন। এইরূপ দীর্ঘকাল উভয়ের একত্র অবস্থিতি

তাঁহাদের ভাগ্যে এ পর্য্যন্ত আর কখনও ঘটিয়া উঠে নাই। সাংসারিক সহস্র চিন্তায় অবসন্ন দেহ লইয়া যখন সুরেশচন্দ্র শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, শান্তিময়ী সুলোচনা তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেন, বিমুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাঁহার স্বামীর ম্লান মুখের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া থাকিতেন। সে দৃষ্টির অর্থ সুরেশচন্দ্র সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সংসার-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার উত্তাল আন্দোলনে সুলোচনা স্বামীর একমাত্র অবলম্বন ছিলেন; তাঁহার নিদাঘতপ্ত মরুভূ-হৃদয়ে প্রিয়ার মধুর প্রেম স্নিগ্ধ বারিধারা। তিনি তাঁহার দুঃখে সুখ, শোকে সান্ত্বনা, মেঘাচ্ছন্ন নিশীথিনীর ঘন অন্ধকারে তাঁহার পথ-প্রদর্শিকা চঞ্চল বিদ্যুদ্দীপ্তি।

স্বামীর প্রণয় উপভোগে তখন পর্য্যন্তও তাঁহার অতৃপ্ত লালসা। প্রথম-যৌবনে স্বামি-প্রেম কত মধুর, মাধুরীময়ী সুলোচনা সে মাধুর্য্য প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার বাসনা-সাগরে নিরন্তর প্রবল ঝটিকা বহিত, হৃদয়মধ্যে আকাঙ্ক্ষার সহস্র প্রতিমূর্ত্তি প্রতিক্ষণে প্রতিফলিত হইত। স্বামি-সোহাগিনী সুলোচনা সঙ্গিনীদের সহিত গল্পচ্ছলে কত মনের কথা বলিতেন। অতীত স্মৃতি হৃদয়ে জাগাইয়া সুরেশচন্দ্রের নির্ম্মল প্রীতিমাখা মুখখানি কল্পনায় আঁকিয়া তিনি বিভোর হইতেন। অবসরমত যখন সুরেশচন্দ্র বাটী আসিতেন, সুলোচনা স্বামীর অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি অনিমেষ-নেত্রে দেখিতেন, তবুও তিনি প্রাণে তৃপ্তি পাইতেন না। ভালবাসার বস্তুকে দেখিলে দেখার সাধ কখনও মেটে না।

যে সময় স্বামিস্ত্রীর একত্র সম্মিলন স্বর্গ-সুখাপেক্ষাও মধুর,

সেই সময় সুরেশচন্দ্র প্রবাসগমনে বাধ্য হইলেন। মুগ্ধনেত্রে তিনি সুলোচনার মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। সে মুখের তুলনা নাই। হায়! আবার কত দিনে দেখিতে পাইবেন? জ্যোৎস্না-স্নাত মধুযামিনীর স্নিগ্ধ চন্দ্র-কর-রেখা বাতায়ন ভেদ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। চারুহাসিনী প্রকৃতির অপরূপ রূপমাধুরী! সুরেশচন্দ্র বিহ্বল হইলেন। প্রীতিমাখা মধুর-কণ্ঠে ডাকিলেন, "সুলোচনা!"

সুলোচনা চমকিত হইলেন। হায়! এই মিষ্ট সম্বোধন আবার কত দিনে শুনিতে পাইবেন? তাঁহার কানের ভিতর দিয়া সেই পীযূষপূরিত স্বরলহরী তাঁহার মর্ম্মে গিয়া স্পর্শ করিল। তিনি স্বামীর মুখের দিকে বিস্ফারিতনেত্রে নির্ব্বাক্ জড়পুত্তলিকার মত চাহিয়া রহিলেন।

অধীরভাবে সুরেশচন্দ্র সুলোচনার হাত ধরিলেন;—বলিলেন, "আজ অনেক রাত হয়েছে, শোবে এস।"

সুলোচনা স্বামীর পদপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। স্বামী তাঁহাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন, অধীরভাবে তাঁহার বিম্বাধরে মধুর চুম্বন করিলেন। সুলোচনা চক্ষে কিছু দেখিতে পাইলেন না। সমস্ত জগৎ তাঁহার মাথার উপর যেন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইল, আনন্দস্রোত তাঁহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইল। কিছুক্ষণ পরে সুরেশচন্দ্র দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হায়, আবার কত দিনে তোমায় দেখিতে পাইব?"

"আমার জন্য কাতর হইও না।"—স্বামীর কণ্ঠলগ্না হইয়া সুলোচনা বলিলেন, "আমার জন্য কাতর হইও না।" মন্দভাগিনীর

আগমনে তোমাদের সোনার সংসারে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। কি অশুভক্ষণেই আমার জন্ম হইয়াছিল! জন্মমাত্রেই আমার গর্ভধারিণী ইহসংসার ত্যাগ করিলেন। সূতিকাগৃহের সদ্য প্রসূত শিশু পিতার স্নেহে প্রতিপালিতা হইয়া কখন মায়ের অভাব জানিতে পারে নাই। বিবাহের পর-বৎসরেই তাঁহাকে হারাইলাম, তোমাদের সংসারভুক্ত হইলাম; কিন্তু আমার আগমনমাত্রেই যেন অমঙ্গলের আগুন চারিদিকে ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিল।" সুরেশচন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন, "সে সব কথা তুলিয়া ফল কি? অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই, তুমি আমি তার কি প্রতীকার করিতে পারি? অদৃষ্ট-চালিত হইয়া মানুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করে।"

সুলো। না না, যখন নিজের কথা ভাবি, আমার নিজের জীবনে নিজেই ধিক্কার দিই। মনে ভাবি, কেন আমি সংসারে আসিলাম? স্ত্রীর ভাগ্যে স্বামী সুখী হয়। আমার মনে হয় বুঝি, আমার ভাগ্যদোষেই তুমি এই অকালে সংসারসমুদ্রে ভাসিলে। আমার আগমনে আমার দশরথের মত শ্বশুর যেন আমার পাপের ফলে প্রাণ হারাইলেন। স্নেহশীলা শ্বশ্রূমাতা আমাকে জননীর অপেক্ষাও আদর করিতেন, ভাগ্যদোষে বিবাহের অল্প-কাল পরেই তাঁহাকে হারাইলাম। কি অশুভক্ষণেই আমি তোমাদের বাটীতে পা ফেলেছি।"

সুরেশচন্দ্র মিষ্টবাক্যে প্রণয়িনীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "তোমার অপরাধ কি সুলোচনা?"

সুলোচনার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িল; গদ গদ স্বরে বলিলেন, "লোকে বলে, আমি অলক্ষণা; প্রকৃতপক্ষে আমার আগমনেই তোমাদের সংসারে এত বিষাদ ঘটিল।"

সুরেশচন্দ্র তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন, মিষ্ট-বাক্যে বলিলেন, "লোকের সেটা ভুল। তুমি কি করিবে? কাল পূর্ণ হইলে কেহ কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না; আদরের সমস্ত সূত্র দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেও সে বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়; ভালবাসার সমস্ত আকর্ষণ শিথিল করিয়া প্রিয় বস্তু কালের কবলিত হয়।"

সুলোচনা স্বামীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন. "না না, তুমি জান না, আমার মনের মধ্যে কি যাতনা হয়। আমি মনে ভাবি, আমার কেন মরণ হয় না? আমার মরণ হ'লে বোধ হয়, তোমার সুখ-শান্তি আবার ফিরিয়া আসিতে পারে।"

সুরেশচন্দ্র বিমর্ষমুখে বলিলেন, "সুলোচনা, আমার মনে কষ্ট দেওয়া কি তোমার ভাল? এ সব কথা শুন্‌লে কি আমার মনে কষ্ট হয় না?"

সুলোচনা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "না, আর বলিব না। তুমি যাতে মনে কষ্ট পাও, আমি কি তা কর্‌তে পারি? তোমায় পেয়ে আমি সব ভুলে গেছি। তুমি কাছে থাক্‌লে আমি স্বর্গ চাই না। হায়, আবার কত দিনে তোমায় দেখ্‌তে পাব?"

সুরেশচন্দ্র তদ্রূপ কাতরবাক্যে উত্তর করিলেন, "কেমন ক'রে বল্‌ব, আবার কত দিন পরে তোমায় দেখ্‌বো? পরের অধীনে দাসত্ব কর্‌তে যাচ্ছি, তাদের অনুমতি না পেলে ত আস্‌তে পার্‌বো না।"

স্বামীর পদতলে দক্ষিণ-হস্ত স্থাপিত করিয়া অবনতমুখে সুলোচনা বলিলেন, "দেখ, বিয়ের পর হ'তে তোমায় দে'খে কখন আমার আশা মেটেনি। বরাবর তুমি বিদেশেই থাক্‌তে, আমি

কেবল তোমার আশাপথ চেয়ে ব'সে থাক্‌তুম। ভাল ক'রে তোমায় কখন দেখ্‌তে পেলুম না।—"

অনেক কথা বলিতে সুলোচনার ইচ্ছা হইল, কিন্তু তিনি বলিতে পারিলেন না। স্বামীর সহিত কখন তিনি এত কথা কহেন নাই। স্বামীর অনুপস্থিতিকালে তিনি মনে ভাবিতেন, এই বার দেখা পাইলে তাঁহাকে মনের কথা খুলিয়া বলিবেন; তাঁহার কণ্ঠলগ্না হইয়া কত কথা বলিবেন, কত গল্প করিবেন, অভিমান করিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিবেন; কিন্তু অবসরমত যখন সুরেশচন্দ্র বাটী আসিতেন, তিনি কেবল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, কদাচিৎ স্বামীর কথার উত্তরে দু একটি কথা বলিতেন। বোধ হয়, পতির মুখ দেখিয়া সুলোচনা সমস্তই ভুলিয়া যাইতেন। এ জন্য সুরেশচন্দ্র কত আক্ষেপ করিতেন। সুলোচনা কেবল মৃদু হাসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে সরিয়া বসিতেন।

আজ যেন তাঁহার মুখের বন্ধন খুলিয়া গিয়াছে। রজনী প্রভাতেই স্বামী বিদেশযাত্রা করিবেন, আবার কত দিনে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন, তাহার কোন স্থিরতা নাই।

এমন সময়ে গৃহপশ্চাৎস্থিত নারিকেল-বৃক্ষ হইতে পেচকের কঠোর স্বর তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। উভয়ের হৃদয় সেই কঠোরশব্দে চমকিত হইল। সুলোচনার সমস্ত হৃদয় যেন আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। তিনি স্বামীর কণ্ঠলগ্না হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, কতবার তুমি বিদেশ গিয়াছ, কিন্তু কখন ত আমার প্রাণ এত কাতর হয়নি? আমার প্রাণের মধ্যে যে কি হচ্ছে, তা আর তোমায় কি বল্‌ব? আমি যেন চক্ষে চারিদিকে অন্ধকার দেখ্‌ছি।"

সুরেশচন্দ্রও তাঁহার এই কথায় নিতান্ত বিমর্ষ হইয়া উত্তর করিলেন, "তবে থাক্। আমারও প্রাণের মধ্যে কেমন করে। তোমায় ছেড়ে যেতে আমারও প্রাণ যেন ফেটে যাচ্ছে।"

সুলোচনা বাধা দিয়া উত্তর করিলেন,"না না, তাও কি কখনও হ'তে পারে? সমস্ত সংসারের প্রাণ তুমি, আমি একা কেন তোমার সমস্ত প্রাণ অধিকার ক'রে রাখব? আমি তোমার চরণাশ্রিতা দাসী মাত্র। আমাকে তোমার প্রশস্ত মনের এক প্রান্তে বিন্দুমাত্রও স্থান দিলেই আমি কৃতার্থ হইব। তুমি যখন যেখানে থাক, মনে রেখ, তোমার মঙ্গল-কামনায় আমি নিত্য জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর্‌ব, তুমি যেন সুখে থাক, তোমার পায় যেন কুশাঙ্কুরও না বিদ্ধ হয়।"

সুরেশচন্দ্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "তুমি কাছে না থাক্‌লে আমি কি সুখে থাক্‌ব মনে ভেবেছ সুলোচনা? আমার সংসারের সুখ তুমি, শান্তি তোমাতেই। তুমি কাছে থাক্‌লে আমি সব ভুলে যাই। কিন্তু কি কর্‌ব, অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। সংসার ভার আমার উপর নির্ভর। বিধবা বোন্ মায়া, দাদা বৈ আর জানে না। যোগেশের আমি ছাড়া এখন আর কে আছে? কি ক'রে আমি নিশ্চিন্ত থাকি সুলোচনা?"

সুলোচনাও উত্তর করিলেন, "ছি:ছি, আমিও কি তা বল্‌তে পারি? তাও কি কখন হ'তে পারে? স্ত্রীলোক ছার পদার্থ— তার জন্য তার মায়ায় তুমি সংসারের কর্ত্তব্য ভুলে যাবে? আর তাতে কি আমার মুখোজ্জ্বল হবে? তুমি আমার জন্য ভেবো না। নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন; তুমি যেন সহস্র লোককে প্রতিপালন করতে পার। আমায় মাঝে মাঝে সংবাদ

দিও, এই আমার প্রার্থনা। তোমার সুস্থ সংবাদই আমার অনেক সান্ত্বনা।”

সুরেশচন্দ্র পত্নীর কর্ত্তব্যপরায়ণতায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বক্ষে টানিলেন, তাঁহার মুখ-চুম্বন করিয়া বলিলেন, “তুমিই আমার উপযুক্ত স্ত্রী, এ কথা তোমার মুখেই সাজে।”

হায় সুরেশচন্দ্র! ভবিষ্যতে কি এ কথা মনে রাখিতে পারিবে? সমস্ত রাত্রি স্বামী-স্ত্রী কথায়বার্ত্তায় অনিদ্রায় অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সুরেশচন্দ্র বিদেশে যাত্রা করিলেন। প্রাণ-প্রতিমা সহধর্ম্মিণীর অশ্রুসিক্ত মুখখানি, স্নেহশীলা সহোদরার তপ্ত অশ্রুজল, কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিষণ্ণ মুখ কিছু দিনের জন্য তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিল।

তখন কৃষ্ণনগর হইতে রাণাঘাট পর্য্যন্ত রেল হয় নাই, সুরেশচন্দ্র পদব্রজে রাণাঘাট আসিয়া রেলে উঠিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—— ⁘ ——

হুগলী জেলার অন্তর্গত নারায়ণপুরে সীতানাথ বাবুর নিবাস। সীতানাথ বাবু সে দেশের বিখ্যাত জমিদার। তাঁহার বার্ষিক আয় লক্ষ মুদ্রার কম নহে। তাঁহার হাতীশালে হাতী ও ঘোড়াশালে ঘোড়া; তাঁহার চিড়িয়াখানা দেখিতে বহুদূর হইতে লোক আগমন করিত। অনুকূল বাবু সীতানাথ বাবুর ষ্টেটের ম্যানেজার। সুরেশচন্দ্র নারায়ণপুরে উপস্থিত হইয়া প্রথমে অনুকূল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার বন্ধুর প্রদত্ত অনুরোধপত্র দিয়া তাঁহার কর্ম্মের জন্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল, একশত টাকা মাসিক বেতনে সুরেশ বাবু সীতানাথ বাবুর দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ভার গ্রহণ করিলেন।

মনোরমা সীতানাথ বাবুর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভসম্ভূতা। সীতানাথ বাবু দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর কোন সন্তান-সন্ততি জন্মে নাই। মনোরমাই তাঁহার একমাত্র সন্তান, সুতরাং বড় আদরের। পঞ্চম বৎসরের বালিকাকে রাখিয়া মনোরমার মাতা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সেই অবধি সীতানাথ বাবুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী যোগমায়া দেবী মনোরমাকে কন্যানির্ব্বিশেষে লালন-পালন করিয়াছেন। যোগমায়া বাল-বিধবা; সুতরাং তাঁহার পিতা তাঁহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠান নাই। আরও তাঁহার শ্বশুরালয়েও তাঁহার

আর কোন অভিভাবক ছিল না। পিতার জীবদ্দশায় তিনি পিতৃগৃহে গৃহকর্ত্রী ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতাও তাঁহাকে তদনুরূপ ক্ষমতা দিয়া তাঁহার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করিতেন।

সপ্তম বৎসরের সময় মনোরমার বিবাহ হয়। পিতামহ রামজীবন রায় চৌধুরী দানের ফললাভের জন্য এই অল্পবয়সেই পৌত্রীকে পাত্রস্থ করেন। এই বিবাহে সীতানাথ বাবুর সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিতৃকার্য্যে বাধা দিতে সাহস করেন নাই, কারণ, তিনি তখন সম্পূর্ণ তাঁহার পিতার অধীন। বিক্রমপুরনিবাসী কুলীনশ্রেষ্ঠ মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র হরেন্দ্রকুমার মনোরমার পাণিগ্রহণ করেন। হরেন্দ্রের বয়স তখন চতুর্দ্দশ বৎসর। মধুসূদনের সাংসারিক অবস্থা মন্দ হইলেও রামজীবন রায় তাঁহার পুত্রের সহিত আপনার পৌত্রীর বিবাহ দিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন। কারণ, তখন কুলীনের কুলমর্য্যাদা ছিল এবং লোকেও বিহিত সম্মান করিত। নিষ্ঠাপরায়ণ হিন্দু রামজীবন কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া পাত্রের সাংসারিক অবস্থার দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করেন নাই। এরূপ পাত্রে পৌত্রীকে সম্প্রদান করিলে তাঁহার বংশের গৌরববৃদ্ধি হইবে, সমাজে তাঁহার মুখোজ্জ্বল হইবে, এই ভাবিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার পুত্রের মতামতের অপেক্ষাও করেন নাই।

বিবাহের পর হরেন্দ্রকুমার শ্বশুরালয়েই প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ রামজীবন জীবনের অপরাহ্নকালটা ভাল করিয়া সংসার-সুখ ভোগ করিবার জন্য নাতিনী ও নাতিনী-জামাইকে লইয়া খেলা করিতেন, আমোদ করিতেন; সন্ধ্যার পর খাগ-

কামধায় বসিয়া, তাকিয়া ঠেস দিয়া, আলবোলার মুখনলটি হাতে লইয়া, তাহাদের দু'জনকে দুই পার্শ্বে বসাইয়া কত খোস-গল্প করিতেন: সন্ধ্যাকালে কখন কখন অট্টালিকা-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়বস্তু মনোরমাকে লইয়া সন্ধ্যা-বিহার করিতেন। সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্প সুরভি মৃদু-সমীরণ-সঞ্চালিত হইয়া তাঁহার প্রাণকে স্নিগ্ধ করিত। নিকুঞ্জমধ্যস্থিত মর্ম্মর-বেদিকার উপর তাঁহার সাধের নাতিনী ও নাতিনী-জামাইকে দুই পার্শ্বে বসাইয়া মধুর তৃপ্তি অনুভব করিতেন। স্বহস্তে মল্লিকা-ফুল তুলিয়া মল্লিকা-ফুলের মত পরিস্ফুট মনোরমাকে মালা গাঁথিয়া দিতেন, আবার সেই মালা হরেন্দ্রকুমারের হস্তে দিয়া মনোরমার গলায় পরাইয়া দিতে বলিতেন। অপ্রতিভ হরেন্দ্রকুমার লজ্জায় মস্তক অবনত করিতেন। তিনি তাঁহার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিতেন, 'শালার আমার কি লজ্জা!' গোলাপ-ফুল তুলিয়া মনোরমার খোঁপায় গুঁজিয়া দিয়া বলিতেন, 'দেখ্ দেখি শালা, খোঁপার কি বাহার!'

কালচক্রের আবর্ত্তনে বৃদ্ধের অদৃষ্টে অধিক দিন এ সুখ-ভোগ হইল না। বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সাত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই, যাহা এই আখ্যায়িকায় সন্নিবিষ্ট হইতে পারে। কেবল হরেন্দ্রকুমার শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বৃদ্ধ দাদা শ্বশুরের আদর-মাখা স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে চিরদিন অঙ্কিত ছিল।

অবকাশমত হরেন্দ্রকুমার কখন কখন জনক-জননীকে

দেখিতে যাইতেন। তাঁহাদেরও আর সংসারে অন্য কোন অবলম্বন ছিল না; হরেন্দ্রকুমারই তাঁহাদের একমাত্র সন্তান। তাই তাঁহারা তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় সর্ব্বদাই পথপানে চাহিয়া থাকিতেন। হরেন্দ্রও উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিতেন, কত দিনে তাঁহার স্কুলের ছুটী হইবে, কত দিনে তিনি তাঁহার জনক-জননীর চরণ বন্দনা করিতে পারিবেন। পিতৃবৎসল পুত্রের প্রধান চিন্তা ছিল, কি করিয়া তাঁহার পিতা-মাতাকে সুখী করিবেন, কি করিয়া তাঁহাদের সাংসারিক উন্নতি হইবে।

অগাধ সম্পত্তিশালীর একমাত্র জামাতা হরেন্দ্রকুমার বিলাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণে সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকিলেও কখনও মনের মধ্যে শান্তি অনুভব করিতে পারেন নাই। সীতানাথ বাবুর সংসারে কিছুরই অপ্রতুল ছিল না, জামাতার পরিচর্য্যার্থে স্বতন্ত্র পরিচারক নিযুক্ত ছিল, তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার সকল অভাব-পূর [illegible] ত সুখের মধ্যেও তিনি চিন্তাহীন ছিলেন না। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেন, দরিদ্রের সন্তান হইয়া ধনবান্ শ্বশুরের অন্নে পরিপুষ্ট বলিয়া তিনি যেন সকলেরই চক্ষে ঘৃণার পাত্র। তিনি বিলাসের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইতেছেন, ধনবান্ শ্বশুরের প্রসাদে সুখভোগ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার পরমারাধ্য জনকজননী সংসারের সমস্ত ক্লেশ তাঁহার আশায় সহ্য করিতেছেন, এ চিন্তা তাঁহাকে সর্ব্বদাই সন্তপ্ত করিত। পিতামাতার কষ্ট অনুভব করিয়া কোন্ সুসন্তান নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে?

অপূর্ব্ব সুন্দরী হরেন্দ্রের অঙ্কশোভিনী। মনোমোহিনী মনোরমা রমণীকুলের গৌরব। শৈশব-যৌবনের সন্ধিস্থলে

দাঁড়াইয়া বালিকা অথচ স্ফুটনোন্মুখী, কিশোরী অথচ যৌবন-শ্রী-সমন্বিতা। তাহার তপ্ত কাঞ্চননিভ বর্ণের উজ্জ্বলতায় নয়ন মুগ্ধ হয়। তাহার নীলমণিময় আঁখি আয়ত—আকর্ণ বিস্তৃত, ইচ্ছা করে, আজীবন নির্নিমেষে সেই আঁখির সৌন্দর্য্য দেখি। তাহার দৃষ্টি চঞ্চল, ব্রীড়ালেশহীন। সে দৃষ্টিতে কোমলতা ছিল না, কিন্তু মাধুর্য্যহীনও নহে। সর্ব্বাভরণে মণ্ডিতা মনোরমা যখন হরেন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইত, তিনি মনে করিতেন, তাহার লাবণ্য সরোবরের প্রবল ঝটিকান্দোলিত লহরীলীলা তাঁহাকে কত দূর-দূরান্তরে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি কূল পাইতেন না। সেই সরসীসলিলে সরসিজের মত তাহার মুখখানি যেন মলয়ানিল-সম্পর্কে নাচিতে নাচিতে তাঁহার অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করিত। রূপময়ী মনোরমার সৌন্দর্য্য নয়ন-তৃপ্তিকর, কিন্তু প্রাণস্পর্শী নহে। তাহার অন্তঃকরণ কালিমামণ্ডিত, ইহা হরেন্দ্র স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মনোরমা যে তাঁহাকে তাচ্ছিল্য করিত, তাহা তাহার নিষ্ঠুর কার্য্যেই প্রকাশ পাইত। সে মনে ভাবিত, তিনি তাহার উপযুক্ত নহেন, যেন তাহার সামান্য ক্রীড়ার পুত্তলীমাত্র; ভাঙ্গিয়া গেলে কিংবা হারাইয়া গেলেও কোন ক্ষতি নাই। সে ঐশ্বর্য্যশালী পিতার একমাত্র দুহিতা, রাজভোগে প্রতিপালিতা, আর তাহার স্বামী দরিদ্রের সন্তান—তাহারই পিতার অন্নে প্রতিপালিত। মনোরমা অনেক সময় এই সম্বন্ধে তাহার স্বামীর প্রতি তীব্র শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিত। হরেন্দ্রকুমার নীরবে সমস্তই সহ্য করিতেন। মনোরমার আরও গর্ব্বের কারণ—সে সুন্দরী আর তাহার স্বামী তাহার উপযুক্ত পুরুষ নহেন। মণিমুক্তায় মণ্ডিত মনোরমা

মুকুরে আপনার রূপ-লাবণ্য দেখিত, আর মনের মধ্যে দুঃখ করিত, তাহার এমন রূপ, আর তাহার স্বামী তাহার পার্শ্বে বসিবারও যোগ্য নহে।

বিবাহের পর মনোরমা কেবল একবারমাত্র শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল, তখন তাহার পিতামহ রামজীবন রায় জীবিত ছিলেন। তিনি অনেক দ্রব্য-সামগ্রী সঙ্গে দিয়া পৌত্রীকে শ্বশুরালয়ে পাঠান। সঙ্গে পরিচারক, পরিচারিকা, দ্বারবান্, বরকন্দাজ অনেক লোককে পাঠান হইয়াছিল, পাছে তাঁহার আদরের নাতিনীর কোন প্রকার কষ্ট হয়। সাতদিন মাত্র শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া মনোরমা পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করে। তাহার পর হইতে আর কখনও তাহাকে শ্বশুরালয়ে যাইতে হয় নাই। হরেন্দ্রকুমারের পিতা অবশ্য বৈবাহিককে এ বিষয়ে অনেক অনুরোধ করেন, উত্তরে সীতানাথ বাবু তাঁহাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যাকে তিনি কখন শ্বশুরালয়ে পাঠাইবেন না। মনের দুঃখ মনে মিশাইয়া হরেন্দ্রের পিতা আর কখন বৈবাহিককে এ বিষয়ে অনুরোধ করেন নাই।

একদিন কলেজ হইতে বাটী ফিরিয়া হরেন্দ্রকুমার দেখিলেন, তাঁহার পিতার নিকট হইতে একখানি পত্র আসিয়াছে। তখন তিনি হুগলী কলেজে দ্বিতীয়বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। বাটী হইতে শ্বশুরের গাড়ীতে কলেজে যাতায়াত করিতেন। কম্পিতহস্তে হরেন্দ্রকুমার পত্র খুলিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। পত্র খুলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃৎপিণ্ড শুকাইয়া গেল। তাঁহার মাতাঠাকুরাণী সঙ্কটাপন্ন পীড়ায়

শয্যাগত, তাঁহার পিতার আদেশ, বধূমাতাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে সত্বর বাটী রওনা হইতে হইবে। যদি সত্বর উপস্থিত হইতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত তাঁহার জননীর সাক্ষাৎ না ঘটিতেও পারে। পত্র পড়িয়া হরেন্দ্র স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার অন্তরমধ্যে আকুল ক্রন্দন উঠিল। মাতৃবৎসল পুত্র মাতার এই কঠিন পীড়ার সংবাদে মর্ম্মে মর্ম্মে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। মনের মধ্যে কতই অমঙ্গল আশঙ্কা হইতে লাগিল। অভাগ্য সন্তান ইহজীবনে মাতার কোন কার্য্যই করিতে পারেন নাই; হয় ত একবার চক্ষের দেখাও দেখিতে পাইবেন না। দুঃখে অভিভূত হইয়া তিনি পিসীমাতা যোগমায়া দেবীর নিকট গমন করিলেন। পিসীমাতা সে সময় কক্ষসংলগ্ন দালানে বসিয়া, দেয়াল ঠেস দিয়া, চক্ষু বুজিয়া হরিনামের মালা ফিরাইতেছিলেন, হরেন্দ্রকুমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। মালা ফেরান শেষ হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিতেছ?"

অতি বিনীতস্বরে হরেন্দ্রকুমার উত্তর করিলেন, "আজ বাবার পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, মা'র বড় অসুখ।"

যোগ। হাঁ, কি অসুখ?

হরেন্দ্র। তা লেখেন নাই। লিখেছেন, অত্যন্ত কঠিন ব্যায়রাম, যদি দেখতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে সত্বর বাটী রওনা হইবে।

যোগমায়া তাচ্ছিল্যভাবে উত্তর দিলেন, "বাঙাল মানুষ, বুদ্ধিশুদ্ধি কম, তাইতে রোগের কথা লেখেনি। তা তুমি যদি যেতে ইচ্ছা কর, তা হ'লে যাও।"

হরেন্দ্রকুমার দীননেত্রে একবার পিসীমাতার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তার পর অবনত মস্তকে বলিলেন, "আমাকে যেতে লিখেছেন, আর সেই সঙ্গে একবার নিয়ে যেতেও বলেছেন।"

তাঁহার কথার প্রতিবাদে পিসীমাতা হাত নাড়িয়া বলিলেন, "তা হবে না বাছা! তুমি যেতে চাও যাও, মেয়েকে আমি পাঠাতে পারব না।"

হরেন্দ্রকুমার আরও বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "এ সময় কি না পাঠান ভাল দেখায়? মা'র আমার এই দুঃসময়।"

পিসীমাতা কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে বলিলেন, "না বাছা! তা হবে না। এ তোমার যে বড় অন্যায় কথা। না, এ কোনমতেই হবে না। এক-রত্তি মেয়ে আমার এর মধ্যে শ্বশুরবাড়ী যাবে কি?"

হরেন্দ্রকুমার বড় কাতর হইলেন। বড় কাতরভাবে তিনি বলিলেন, "বড় দুঃসময় পিসীমা তাই আপনাকে বল্‌ছি। লোকে যে আমারই নিন্দে কর্‌বে।"

যোগ। এ নিন্দে করার মানে কি? আমার এই কচি মেয়েকে না পাঠালে লোকে যদি নিন্দে করে, তা করুক; আমি সে নিন্দের ভয় করিনি।

হরেন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। এ কি অন্যায়, মানুষে আর কত সহ্য কর্‌তে পারে? তাই তিনিও কিঞ্চিৎ উদ্ধতভাবে উত্তর করিলেন, "আপনি নিন্দের ভয় না কর্‌তে পারেন, কিন্তু আমাকে নিন্দের ভয় ক'রে চল্‌তে হবে।"

যোগমায়া তাঁহার কথায় রাগিয়া উঠিলেন, গলার মাত্রা

বাড়াইয়া জামাতাকে বলিলেন, "তোমার যে ভারী চ্যাটাং চ্যাটাং কথা দেখতে পাই।"

হরেন্দ্র। আমি ত মন্দ কথা কিছুই বলিনি। তবে বিবাহের পর থেকে সেই যা একবার পাঠিয়েছিলেন। তার পর থেকে ত আর একবারও পাঠালেন না। আমি ত নিয়ে যাবার সম্বন্ধে কখন কিছু বলিনি। তবে এই বিপদ্, তাই আপনাকে অনুরোধ কচ্ছি; এ সময় না পাঠান কি ভাল?

যোগ। মন্দই বা কি? এক-রত্তি মেয়ে, এখনও আপনি খেতে পারে না, এখনও ঘুমিয়ে পড়লে কাদা, ডাক্‌লে কাঁদে। আমি এই মেয়েকে কি না সেই ধাপধাড়া গোবিন্দপুর দেশের কুল-রাজ্যির কুল বাঙ্গাল-দেশে পাঠাব? সে সব হাবরের দেশ, দারিদ্দিরের দেশ। না বাছা, তুমি যাই বল না কেন, আমি কখনই সে দেশে মেয়ে পাঠাতে পার্‌ব না।

হরেন্দ্রের বড় রাগ হইল। এত অপমানে কার না রাগ হয়? তাই তিনিও কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে পিসীমাতার কথার উত্তর বলিলেন, 'সেই দেশ দেখেই ত মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। এখন ভয় কর্‌লে চল্‌বে কেন? আর যথার্থ কথা বল্‌তে গেলে, আপনার মেয়ের মত বয়স থেকেই স্ত্রীলোকেরা সংসারের ভার গ্রহণ করে। আপনি যত ছেলেমানুষ মনে ভাব্‌ছেন, সত্যই ত আর তত ছেলেমানুষ নয়।"

যোগমায়া জামাতার এই কথায় ধৈর্য্য হারাইলেন। গলার মাত্রা আরও বাড়াইয়া বলিলেন, "এ কি যে সে লোকের মেয়ে যে, সাত বৎসর বয়সে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে হাঁড়ি ধর্‌বে? আমার মেয়ে কখনও খেয়ে আপনি আঁচায়নি।"

হরেন্দ্রও তেমনিভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমার যদি সে ক্ষমতা থাকতো, তা হ'লে আমিও হাত ধুইয়ে দেবার জন্য ঝি রাখিয়ে দিতাম।"

যোগমায়া অত্যন্ত রাগিলেন। রাগে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। চীৎকার করিয়া তিনি বলিলেন, "তাই নেই বলেই ত পাঠাতে চাইনি। আমার মেয়ে যে তোমার বাড়ী গিয়ে গোবরের হাঁড়ি নিয়ে সকালবেলা উঠেই ছড়া দেবে আর ঘাট থেকে ঝাঁকা ক'রে বাসন মেজে আন্‌বে, এ আমার প্রাণ থাকতে কখনই হবে না।"

হায়! এইরূপ তীব্র কটুবাক্যে কার না মর্ম্মস্থল বিদ্ধ হয়? হরেন্দ্রকুমার তাঁহাকে স্থির-গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এই কথাগুলো বিবাহের পূর্ব্বে ভেবে দেখা উচিত ছিল। আমি কিছু উপযাচক হয়ে আপনার বাটীতে বিয়ে করতে আসিনি।"

যোগ। তোমার যে ভারী রাগ দেখ্‌ছি। বলে—বিষ নেই কুলোপানা চক্র! অত টেঁস-পোড়ান কথা শোনাচ্ছ, তবুও যদি তোমার বাপ একরাশ টাকা না নিত।

হরেন্দ্র। আমি আপনাকে কিছুই শোনাইনি, আপনিই বরং আমায় যা-ইচ্ছে-তাই শোনাচ্ছেন। আমি যদি আমার স্ত্রীকে জোর ক'রে নিয়ে যাই, আপনার এমন সাধ্য হয় না, আপনি ধরে রাখ্‌তে পারেন।

যোগ। কখনই নয়। আমি কখনও পাঠাব না। দেখি তুমি কি কর্‌তে পার। আমি তখনই বাবাকে বলেছিলুম যে, এমন কাজ করো না—চাল নেই, চুলো নেই, অমন হাঘরের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিও না। বুড়োর ভীমরথি হয়েছিল, কেবল

বলা হতো—কুলীন কুলীন! কুলীন নিয়ে আমার মেয়ের কি সুখ হবে?

যোগমায়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন,—"আহা! মেয়েটাকে হাত-পা ধ'রে কেন জলে ফেলে দিলে গো! ওর মা যদি বেঁচে থাক্‌তো, তা হ'লে এ বিয়ে কি কেউ দিতে পার্‌তো?"

হরেন্দ্র অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, 'মানুষ এমন হয় কেন? মানুষের হৃদয় দয়া-মায়া-স্নেহ-মমতা-বর্জ্জিত কেন? আমার এমন বিপদ, তবুও ইহঁাদের অন্তর এত নিষ্ঠুর কেন?"

বহির্বাটীতে সংবাদ গেল, জামাইবাবু পিসীমাতার সহিত কলহ করিতেছেন। সীতানাথ বাবু শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিলেন; যোগমায়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে দিদি, তুমি কাঁদ্‌চ কেন?" জামাতার বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কি বাপু, তুমি অমন ক'রে দাঁড়িয়ে কেন?"

ভ্রাতাকে দেখিয়া, কান্নার মাত্রা বাড়াইয়া যোগমায়া উত্তর করিলেন, "এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার বাড়ী ব'সে আমারই অপমান?"—ভ্রাতার দিকে হাত নাড়িয়া বলিলেন, "এই তোমার দোষেই ত এমনটা হ'ল। আমি ত তখনই বলেছিলেম, হাঘরের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিলে চিরকাল কষ্ট পেতে হবে। তা আমার কথা থাকবে কেন?"

সীতা। বলি, ব্যাপারখানা কি, খুলেই বল না? অত হাঙ্গামা কচ্ছ কেন?

যোগ। আমি হাঙ্গামা কচ্ছি, না তোর জামাই হাঙ্গামা

কচ্ছে? আমায় যা-ইচ্ছে-তাই বলা? কেন, আমি কি এ বাড়ীর একটা চাকরাণীরও যুগ্যি নই?

ভগিনীর কথার মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া সীতানাথ বাবু তাঁহার জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে বাপু, ব্যাপার-খানা কি?"

হরেন্দ্রকুমার বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে, কিছুই নয়। উনিই বরং আমাকে অনেক কটূ কথা বল্লেন। আমি আপনাদের বাড়ীতে আছি বলেই আমাকে এমন ক'রে কটূ কথা বলেন।"

সীতানাথ বাবু কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে উত্তর করিলেন, "বাপু, এ রাগ কর্‌বার স্থান নয়, সময়ও নয়। কি হয়েছে, আমায় খুলে বল, তা না হ'লে আমি বুঝ্‌ব কেমন ক'রে?"

হরেন্দ্র। আজ্ঞে, আজ বাবার পত্র পেলুম, মা'র আমার বড় ব্যায়রাম, তাই পিসীমার কাছে একবার নিয়ে যাবার কথা বল্‌ছিলুম। এই দেখুন চিঠি। আর অনেক দিন থেকে তিনি আপনাদের ব'লে আস্‌ছেন, কখনও ত পাঠাননি। এ সময় এক বার পাঠিয়ে দিন, বাড়ীতে এমন বিপদ্।

সীতানাথ বাবু পত্র পড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তুমি যেতে পার; কিন্তু দেখ, বাপু, আমার একটিমাত্র মেয়ে, তায় আবার তার গর্ভধারিণী বেঁচে নেই। মনো আমার বড় আদরের। সে যে তোমাদের বাড়ী গিয়ে তোমার মা'র রোগের সেবা কর্‌বে, তাঁদের ফেজ্‌মৎ খাট্‌বে, এটা কিছু সঙ্গত নয়।

হরেন্দ্র। অসঙ্গত কিসে? পরিণীতা কন্যাত স্বামীর পর্ণ-কুটীরে গিয়ে বাস করে। আর শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করা,— সে ত স্ত্রীলোকের সৌভাগ্য।

সীতা। আমি আশ্চর্য্য বোধ কচ্ছি, আমার মুখের উপর তোমার এ সব কথা বল্‌তে সাহস হচ্ছে?

হরেন্দ্র। আজ্ঞে, আমি অযুক্তির কথা কিছুই বলিনি।

যোগমায়া সীতানাথ বাবুর মুখের কাছে হাত-মুখ নাড়িয়া বলিলেন, "ওরে, তোরা সর্ব্বনাশ করেছিস—সর্ব্বনাশ করেছিস্! তখন সব বুঝ্‌তে পারিস্‌নি, একটা গোঁয়ারের হাতে মেয়েটাকে ধরে দিইছিস্। তখন সবাই বলেছিল, হলোই বা বাঙ্গাল, লেখাপড়া শিখ্‌লে সভ্য হবে। তাও কি কখন হয়? কথায় বলে—আমগাছের ছাল কখন কি জামগাছে লাগে?"

কি মর্ম্মান্তিক কথা! প্রাণ ফেটে যায়! হরেন্দ্রকুমার মনে ভাবিলেন, হবেই বা না কেন? গরীবের ছেলে বড়-মানুষের বাড়ী ঘরজামাই থাকলে তার অদৃষ্টে যে লক্ষ্মী হয় না, এই আশ্চর্য্য।

উপায়ান্তর না দেখিয়া হরেন্দ্রকুমার বড় কাতরভাবে শ্বশুরকে পুনরায় বলিলেন, "দেখুন, আমি একটিবারমাত্র নিয়ে যেতে চাই, তার পর আপনারা চিরকাল রাখ্‌বেন। আমি একা বাড়ী গিয়ে যখন দাঁড়াব, বাবা যখন জিজ্ঞাসা করবেন, 'তুমি একা এলে, একবারটি নিয়ে এলে না, তোমার গর্ভধারিণীকে একটিবার দেখালে না,' তখন আমি তাঁর কথার কি উত্তর দিব?"

সীতানাথ বাবু জামাতার এই সকাতর অনুরোধও অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন, "তা হবে না বাপু, আমার মেয়ে যে তোমার

বাড়ী যাবে, তা কখনই হ'তে পারে না। তুমি বল কি? যে মেয়ে আমার এক-তলায় পা দেয় না, সে কি না তোমাদের সেই খড়ো মেটে ঘরে গিয়ে থাকবে? মনোরমা আমার শীতকালে কখনও গরম জল ছাড়া নাতে করে না, সে তোমাদের বাড়ী গিয়ে এই শীতে ঠাণ্ডা কনকনে জল ঘাঁটবে, এও কি কখন হয়? এ কোন মতেই হ'তে পারে না। মেয়ে আমার তা হ'লে দুদিনও বাঁচবে না।"

ভ্রাতার কথায় সায় দিয়া যোগমায়া বলিলেন, "জল ঘাঁটবে, বাসন মাজবে, চাল ধোবে, ছড়া দেবে, কুট্‌নো কুট্‌বে, আর সে পাড়াগাঁয়ে কি না করতে হবে? মেয়ে তা হ'লে দুদিনও বাঁচবে না।"

বিপন্ন হরেন্দ্রকুমার আরও কাতরভাবে বলিলেন, "দেখুন, বাপ-মা ছেলের বিয়ে দিয়ে বড় সাধ করে, বৌ এসে অসময়ে সেবা করবে, তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, তাঁদের সংসারে আনন্দবর্দ্ধন করবে। আমার বিয়ে দিয়ে আমার মা বাপের কোন সাধই পূর্ণ হয়নি। আর ছেলেরও কর্ত্তব্য, যাতে স্ত্রী তার পিতা-মাতার সেবা-শুশ্রূষা করে, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। আমি সেই জন্য বলছি, আমায় কর্ত্তব্য কাজ করতে দিন।"

সীতানাথ বাবু জামাতার এই কথা শুনিয়া নিতান্ত বিরক্তভাবে বলিলেন, "বাপু, এ লেকচার দেবার জায়গা নয়। আমি তোমাকে সাফ বলছি, মেয়ে পাঠাব না।"

হরেন্দ্র। তা হ'লে মনে রাখবেন, আমিও আর আপনার বাড়ীতে থাকছি না।

সীতা। বেশ তা হ'লে এক কাজ কর, আমি কাছাকাছি তোমায় একখানা বাড়ী তৈয়ের ক'রে দিচ্ছি। তোমার বাপ-মাকে এনে সে-খানে রাখ। তাঁরা ত খড়ো ঘরে আছেন, এখানে এসে কোটা ঘরে থাক্‌বেন।

চমৎকৃত হইয়া হরেন্দ্রকুমার উত্তর করিলেন, "তাঁদের সাত-পুরুষের বাস ত্যাগ ক'রে, আপনার প্রদত্ত কোটা ঘরে এসে থাক্‌বেন, এত নীচ প্রবৃত্তি তাঁদের নয়।"

যোগ। কি অহঙ্কারের কথা! ছোঁড়ার দেমাক দেখেছ! তবু যদি ওর মা-বাপের কিছু থাক্‌তো।

সীতা। তবে তুমি কি করতে চাও?

হরেন্দ্র। আর আমি আপনার বাড়ীতে থাক্‌ব না।

সীতা। কোথায় থাক্‌বে?

হরেন্দ্রকুমার নির্ভয় অন্তরে উত্তর করিলেন, "সে কথায় আপনার আবশ্যক কি? আমার যেখানে ইচ্ছে, আমি সেইখানে থাক্‌বো। আমারও বাড়ী-ঘর আছে, আমার বাপ-মা আছেন।"

সীতা। লেখাপড়া করবে কি ক'রে?

হরেন্দ্র। লেখাপড়া আজ হ'তে শেষ। মা বাপের সেবা করা আগে, তার পরে ত লেখাপড়া।

সীতা। বিয়ের সময় ত এমন কোন কথা হয়নি।

যোগ। স্পষ্ট বল-কওয়া, চিরদিন ঘর-জামায়ে থাক্‌বে।

এত দিন পর্য্যন্ত হরেন্দ্রকুমার শ্বশুরের মুখের উপর কোন কথা বলেন নাই; এত দিন পর্য্যন্ত শ্বশুরালয়ের সমস্ত অত্যাচার তিনি নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু আজ আর তাঁহার সহ্য হইল না। মনে মনে তিনি স্থির করিলেন,

এইবার শ্বশুরালয়ের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন। তাই তিনিও গর্ব্বভরে শ্বশুরের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "বিয়ের সময় না হয়ে থাকে, এখন হ'ল।"

সীতা। জানো, আমি এক রাশ টাকা তোমার বাপকে দিয়েছি?

হরেন্দ্র। জানি, সেই জন্যই আপনারা আমাকে এত তাচ্ছিল্য করেন!

সীতা। এই টাকার পরিবর্ত্তে আমি কি লয়েছি?

হরেন্দ্র। কি লয়েছেন?

সীতা। তোমায় লয়েছি। তুমি কি অমনি আমার বাড়ীতে আছ, আমি তোমায় টাকা দিয়ে কিনে রেখেছি। এ কি এক আধটা টাকা;—পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা;—কড়্কড়ে রোক্ নগদ গুণে নিয়েছে। এখন যেতে চাও, বেইমান, নিমক-হারাম!

যোগ। দেখ্ সাতে, তুই যদি মেয়ে পাঠাস্ কি ওকে ছেড়ে দিস, তোর বড় দিব্যি। দেখি ও কি করে!

সীতা। এখন তুমি কোন্ আইনে যেতে চাও বাপু?

হরেন্দ্র। আইন আবার কি? আমার ইচ্ছাই যথেষ্ট আইন।

সীতা। তোমার এমন সাধ্য নাই যে, তুমি আমার বাড়ী ছেড়ে যাও।

হরেন্দ্র। আমার ইচ্ছা হ'লে কেউ আমাকে আট্কে রাখ্তে পার্বে না। মানুষে কখন মানুষের স্বাধীনতা কিন্তে পারে না।

সীতা। সাধ্য কি যে তুমি আমার বাড়ী ছেড়ে যাও। আমি

এখনই দরোয়ানদের ব'লে দিচ্ছি, দেখি তুমি আমার দেউড়ী পার হও কি ক'রে।

হরেন্দ্র অধীরভাবে বলিলেন, "আপনি সাবধান হয়ে কাজ করুন। আমাকে আটক ক'রে রাখ্‌লেন, কিন্তু তাতে আপনার কন্যা কখন সুখী হবে না। আমার বড় বিপদ্‌, মা আমার মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। ইহ-জীবনে কখনও আপনার দুর্ব্বিহারের কথা ভুলিতে পারিব না। আমি একবার বেরুতে পার্‌লে মনে করবেন না, আর কখনও আপনার বাড়ীতে ফিরে আসব।"

সীতানাথ বাবু ক্রোধভরে বলিলেন, "দদি! এখনই দরোয়ানদের ব'লে আস্‌ছি ওকে ন-গিন্নীর মহালে বন্ধ ক'রে রাখুক। যত দিন না পাজীর সম্‌ঝানো যায়, তত দিন ওকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে।"

সীতানাথ বাবু এই বলিয়া বহির্বাটীতে গমন করিলেন। সীমান্তিনী ব্যঙ্গ করিয়া হরেন্দ্রকে বলিলেন, "কেমন, এইবার ঠিক হয়েছে!"

দুঃখে—অপমানে অভিভূত হরেন্দ্র মনে করিলেন, "পৃথিবি, তুমি দ্বিধা হও, আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করি। এর চেয়ে মৃত্যুও ভাল,—সহস্রগুণে ভাল। এই অপমান সহ্য ক'রে লেখাপড়া শেখার চেয়ে ভিক্ষা ক'রে খাওয়াও অনেক ভাল। ভগবান্! অনেক পাপ করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে শ্বশুরবাড়ী থেকে! এখনও কি শেষ হয়নি কিংবা এই শিক্ষার সূত্রপাত? এই সব কঠিন বাক্যে কাণ বধির হয়, মস্তিষ্কগ্রন্থি শিথিল হয়ে যায়। নরকের কথা শুনেছি,—শুনেছি, মৃত্যুর পর নরকভোগ

অন্নদাস হয়ে বাস করা জীবন্তে নরকভোগ। মশে অতি তীব্র যাতনাভোগ নরকে হয়, কিন্তু আমি প্রতিক্ষণে যে যাতনা ভোগ কচ্ছি, নরকের যাতনা এর কাছে অতি তুচ্ছ।"

সীতানাথ বাবু মর্ম্মাহত হতভাগ্য হরেন্দ্রকুমারকে বন্দী করিয়া দরোয়ানদের পাহারা রাখিলেন। কড়া হুকুম জারী করিলেন,—'যেন কোন মতে ও পলায়ন করিতে না পারে।'

হায়! এ সংসারের লোক এত নিষ্ঠুর কেন? হরেন্দ্রের কাতর বাক্যে পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হয়। সীতানাথ বাবুর হৃদয় কি পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন? ঐশ্বর্য্যমদে লোকে কি এত অন্ধ হয়? মাতৃপরায়ণ সন্তান মাতার এই কঠিন পীড়ায় একবার চক্ষের দেখাও দেখিতে পাইবেন না! এ সংসারে এত অবিচার কেন? অর্থের গর্ব্বে লোকে এত অপদার্থ হয় কেন? ইহার উত্তর কি কখনও কাহাকেও দিতে হইবে না?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সদানন্দের স্ত্রী সুখদার সহিত মনোরমার বড় ভাব। সমবয়স্কা দুই জনে শৈশব হইতে সখিত্ব-সূত্রে আবদ্ধ, দুই জনে একসঙ্গে লালিত-পালিত। সন্ধ্যায় পুষ্পনিকুঞ্জে, প্রাতঃকালে দীর্ঘিকা-তীরে দুই জনে একত্রে ভ্রমণ করিত, গল্প করিত, অবিরাম চিন্তালেশশূন্য হইয়া আমোদ করিত।

মনোরমা জমিদারকন্যা আর সুখদা সে জমিদার-সভার সভাপতির কন্যা, এ কথা উভয়েরই মনে হইত না। এক সূত্রে অনুপ্রাণিত দুইটি প্রাণ যেন এক বৃন্তে দুইটি ফুল। সুখদা শৈশব হইতে প্রায় সর্ব্বদাই জমিদারবাটীতে অবস্থান করিত। মনোরমার মাতা মনোরমাকে যেরূপ আদর করিতেন, সুখদাকেও সেইরূপ আদর করিতেন।

মনোরমা যে স্বামীকে অনাদর করিত, সুখদা সেই জন্য মনোরমাকে যথেষ্ট অনুযোগ করিত। তাহার স্বামীর প্রতি এই তাচ্ছল্যভাব যাহাতে বিদূরিত হয়, সুখদা সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিত। এই জন্য মনোরমা কখনও কখনও সঙ্গিনীর প্রতি বিরক্তিভাব প্রকাশ করিত, তবুও সুখদা তাহার সখীকে সদুপদেশ দিতে বিরত হইত না। স্বামিপরায়ণা সুখদা সখীর এই অন্যায় আচরণে মনে মনে যথার্থই কষ্ট অনুভব করিত। আলো ও আঁধারে যেরূপ বিভিন্নতা, মনোরমাতে ও

নরেন্দ্রকুমার যখন শ্বশুর কর্তৃক অপমানিত হইয়া স্থাণুরূপে আবদ্ধ হন তাহার পর একদিন সুখদা মনোরমাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি ক'রে বল দেখি সই, তোমার প্রাণে কি একটুকুও কষ্ট হয়নি?"

মনোরমা বিস্মিতভাবে উত্তর করিল, "আমার প্রাণে কি জন্য কষ্ট হবে?"

সুখদা বলিল, "কেন, স্বামীর জন্য? স্বামীর অপমানে স্ত্রীর বুকে শেল বাজে।"

অম্লান-বদনে মনোরমা বলিল, "পোড়াকপাল সোয়ামীর, অমন সোয়ামী থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।"

বিস্মিতনেত্রে সুখদা একবার মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখের কোন পরিবর্ত্তন নাই। আশ্চর্য্য হইয়া সুখদা তাহাকে বলিল, "এ কথা বল্লে কি ক'রে সই?"

মনোরমা সরলভাবে উত্তর দিল, "কেন বলবো না? পাঁচশোবার বলবো। সোয়ামী ত নয়, যেন একটা উল্লুক; না জানে বস্‌তে, না জানে দাঁড়াতে, না জানে কথা কইতে! কত দিন ওলো হাঁড়ির মত মুখ ভার ক'রে আছে। পোড়ার মুখে একদিনের জন্যও হাসি দেখ্‌তে পেলুম না।"

সুখদা। ছি ছি, সই! তুমি বল্লে কি? স্বামীর তুল্য গুরু স্ত্রীলোকের আর নেই। স্বামিনিন্দায় মহাপাতক হয়।

ঘৃণার হাসি হাসিয়া মনোরমা সখীর কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "গুরু ত নয়, ঠিক যেন গরু। ও একটা আস্ত গরু বল্লেও চলে। কথায় কথায় বলা হয়, ধর্ম্মে মন রেখো, ধর্ম্মপথে চলো,,

পড়েছি, উনি টোল থেকে নেমে আমায় উপদেশ দিতে এসেছেন!"

সুখদা। তোমার সৌভাগ্য যে, তুমি অমন স্বামী পেয়েছ

মনোরমা বিরক্ত হইয়া বলিল, "তুমি থামো, আর তোমায় বক্তৃতা করতে হবে না।"

সুখদা। সই, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না।

মনো। বেশ বুঝতে পাচ্ছি, এখন তুমি চুপ কর।

সুখদা। তোমারই ভালর জন্য বল্‌ছি। এমন একদিন আসবে, যে দিন এই সব কথা মনে ক'রে তোমাকে কাঁদতে হবে।

মনো। আমার বয়ে গেছে!

সুখদা। স্বামী বলেন, তোমায় ধর্ম্মপথে চলতে, দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি করতে। কথাগুলো সই কত মধুর, কত দূর জ্ঞানের, তা যদি বুঝতে পারতে, তা হ'লে কি কখন নারীর শ্রেষ্ঠ দেবতা স্বামী—সেই স্বামীর নিন্দা করতে পারতে? তোমার অনেক তপস্যাফলে তুমি অমন দেবোপম স্বামী পেয়েছ; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর মর্য্যাদারক্ষা হ'ল না।

মনো। আমি অমন সোয়ামী নিয়ে কখন ঘর করতে পারব না।

সুখদা হাসিয়া বলিল, "তবে কি করবে? মেমেরা যেমন করে, এক স্বামীকে পছন্দ হ'ল না, তাকে পরিত্যাগ ক'রে আর একজনকে বিয়ে করে, তুমিও তাই কর না কেন?"

মনো। সে প্রথা মন্দ নয়। যাকে নিয়ে সুখ হ'ল না, তাকে পরিত্যাগ করায় দোষ কি?

সুখদা। তাই কর না কেন? আপশোষ রাখ কেন? তুমি ত বড়মানুষের মেয়ে, তোমার বাপকে বল, তোমার আর একটা বিয়ে দিন।

মনো। সে নিয়ম যদি থাকৃত, তা হ'লে কি ভাব্‌তুম? এ পোড়া দেশে কি সে নিয়ম আছে?

সুখদা। তুমিই না হয় নিয়ম বা'র কর। তুমি যা কর্‌বে, তাই শোভা পাবে।

মনো। যাও তুমি, আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না।

সুখদা। সই, রাগ করো না। তুমি তোমার মনের দোষেই কষ্ট পাচ্ছ এবং চিরদিন কষ্ট পাবারই যোগাড় কচ্চ তোমার স্বামীর এমন কোন দোষ নেই যে, তুমি তাঁকে এত হেনস্থা কর। অপরাধের ভিতর তিনি দেখ্‌তে তত ভাল নন। কিন্তু পুরুষ মানুষের রূপের চেয়ে গুণেরই বেশী আদর।

মনো। রক্ষা কর সই, তার চেয়েও দেখ্‌তে খারাপ আছে?

সুখদা। এমন কি দেখ্‌তে খারাপ যে, তাকে নিয়ে ঘর করা যায় না? তা ছাড়া তাঁর গুণ—লেখাপড়ায় বল, মিষ্টকথায় বল, যে একবার তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছে, সে কখনই তাকে ভুল্‌তে পার্‌বে না। আর তার দোষের ভিতর তিনি অর্থহীন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এক সময়ে তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন কর্‌তে পার্‌বেন। আর তাঁর দোষ কি? তিনি গরীবের সন্তান হয়ে ধনবানের মেয়েকে বিবাহ করেছেন, নইলে তোমাদের সাধ্য কি, তাঁর মতন কুলীনকে বাড়ীতে এনে অপমান কর? তুমি তাঁর ব্যথার ব্যথী নও, তা হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌তে, তাঁর প্রাণে কত ব্যথা বেজেছে। এমন গুণবান্ স্বামী তোমার, কিন্তু

তোমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই তুমি তাঁকে বুঝ্তে পার্‌লে না। তাই তার অগাধ প্রেমের এমনি ক'রে অবমাননা কচ্ছ। বুঝ্তে পার্‌লে না, তাঁর ভালবাসা কত মধুর।

মনোরমার নিষ্ঠুর মনও তখন সুখদার মিষ্টকথায় নরম হইল। মনোরমা তাহার হৃদয়ের মধ্যে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার স্বামীর ছায়ামাত্রও তাহাতে নাই। অনেক ভাবিল, স্বামীর সহিত তাহার মনের মিল হইবার কোন উপায় নাই। মনোরমা সঙ্গিনীকে স্পষ্ট বলিল, "না, তার সঙ্গে আমার ভালবাসা হবার কোন উপায় নাই।"

সুখদা। কোন উপায় নাই? মনে কর্‌তে হয়, যাহার ভাগ্য যেরূপ, তার সেইরূপ লাভ হয়। স্বামী বাছিয়া লওয়া হিন্দুর প্রথা নয়। বাপ-মা যাহাকে দিবেন, সেই স্বামী নারী-জীবনের একমাত্র অধীশ্বর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্য দেবতা—তা তিনি কুরূপই হউন আর সুরূপই হউন, গুণবানই হউন আর নির্গুণই হউন। দেবার্চ্চনায় নারীর অধিকার নাই,—স্বামী যদি অনুমতি না দেন।

মনোরমা হাসিয়া উত্তর করিল, "ধ'রে বেঁধে ভাব ক'রে দেবে না কি? ব্যগ্রতা করি সই, ও কথা ছাড়ান দাও।"

সুখদা। দেখ সই, ছেলেবেলা থেকে আমাদের ভাব। শুনেছি, আমার মার সঙ্গে তোমার মারও এই রকম ভাব ছিল। কপালদোষে আজ আমরা দুজনেই মাতৃহীন। আমার বাল্য-কালের খেলার সাথী তুমি—আমার মার পেটের বোনের চেয়েও আদরের জিনিস। আমার অনুরোধ, তুমি তোমার স্বামীকে কখন অযত্ন করো না।

মনো। আমার হাত নেই। তোমার কথায় আমি সব করতে পারি কিন্তু তোমার এ অনুরোধ আমি কোন মতেই রাখতে পারব না। সত্য কথা বলতে কি, ওকে দেখলেই আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে ওঠে। ও আমার কাছে না থাকলেই আমি ভাল থাকি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুখদা উত্তর করিল, "তবে আর গরীবের কোন উপায় নেই, তারও অনেক অদৃষ্টের ফল যে, স্ত্রীর ভালবাসায় সে বঞ্চিত। স্বামী অপমান, অনাদর, তাচ্ছিল্য, দুঃখ, কষ্ট, শোক সব সহ্য করতে পারে, যদি পাশে প্রেমময়ী ভার্য্যা থাকে। মাথার উপর পর্ব্বতপ্রমাণ অশান্তির বোঝা বইতে পারে, যদি স্ত্রী তার ব্যথার ব্যথী হয়। ভালবাসার চক্ষে ভালবাসার আধার অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী সহধর্ম্মিণীর নিষ্কলঙ্ক মুখ-চন্দ্রমা তার দুঃখে সুখ, শোকে সান্ত্বনা। সই, তোমারও দুর্ভাগ্য আর তোমার স্বামীরও দুর্ভাগ্য যে, তিনি তোমার ভালবাসায় বঞ্চিত।"

মনোরমা মনে মনে বড় বিরক্তি বোধ করিল, যাহাকে দেখিলে তাহার মনে ঘৃণার উদয় হয়, সুখদা বার বার তাহারই কথা বলিতেছে। বড় বিরক্তির সহিত মনোরমা বলিল, "আর কি কোন কথা জানো না সই?"

চমকিত হইয়া সুখদা বলিল "আমার কথাগুলো কি তোমার আদতে ভাল লাগ্‌ছে না?"

মনো। আদতে না।

সুখদা মনে ভাবিল, সত্যই ত, আমি কাকে এ সব কথা বল্‌ছি? এ আমার উলুবনে মুক্তো ছড়ান হচ্ছে। ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিতার কর্ণে আমার এ সদুপদেশ স্থান পাবে কেন? যে

চিরদিন বিলাসের ক্রোড়ে লালিতা ও পালিতা হইয়াছে; সে স্বামীর মর্ম্ম কি বুঝ্‌বে?

মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, "সই ভাব্‌ছ কি?"

সুখদা। ভাব্‌ছি, কমলা লোককে ঐশ্বর্য্য দিতে পারেন, কিন্তু তার সঙ্গে মনুষ্যত্ব দেন না। মনুষ্যত্ব স্বতন্ত্র জিনিস।

মনো। তোমার শাস্ত্র রেখে দাও। আমি ও সব কথা বুঝিনি।

সুখদা। তুমি বুঝ্‌বে কি ক'রে? যদি তোমার সে ক্ষমতা থাকৃত, তা হ'লে কি অমন দেবতার তুল্য স্বামীর অমর্য্যাদা করৃতে?

মনো। আবার সেই কথা? আর কি কোন কথা জানো না সই?

সুখদা। দূর হোক্ গে ছাই, আমিই বা অত ব'কে মাথা ধরাই কেন? কিন্তু সই, তোমার এ রকম প্রবৃত্তি হ'ল কেন? সই-মা ছিলেন সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমা—তাঁর কোন কার্য্যে কখন কেউ দোষ ধরৃতে পারেনি। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রে তোমার এত নীচপ্রবৃত্তি হ'ল কেন? অথবা লোকে যেমন বলে—"এ কি শুভদৃষ্টির দোষ? তাই কি স্বামী-স্ত্রীর এই মনোমালিন্য?"

সুখদা তার পর নিজের মনে মনে ভাবিলেন, আমি কি কোন প্রতীকার করৃতে পারিনে? সাধ্য কি আমার, যে যার অদৃষ্ট কর্ত্তৃক চালিত। আমি কি অদৃষ্টের ফল রোধ করৃতে পারি?

ধর্ম্মভীতা সুখদা তাঁহার বাল্য-সঙ্গিনীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নিতান্ত কাতর হইলেন। স্বচ্ছ দর্পণের মত শুভ্র হৃদয়ে তিনি

মনোরমার ভবিষ্যৎ চিত্র প্রতিফলিত করিয়া দেখিতে পাইলেন, তাহা ঘনান্ধকারে পরিব্যাপ্ত। তাঁহার পরদুঃখকাতর কোমল হৃদয়ে বড় ব্যথা বাজিল। তাই আর একবার মনোরমাকে বলিলেন, "ভাল ক'রে ভেব দেখ সই। ধন বল, ঐশ্বর্য্য বল, কিছুতেই সুখ নেই—যদি স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত হও। নারীর আরাধ্য দেবতা—কামনার শ্রেষ্ঠবস্তু স্বামী—স্বামিপ্রেমে বঞ্চিতা নারী নিত্য মরণ কামনা করে। হিন্দু বিধবা পৃথিবীর সকল সুখে বঞ্চিতা এক স্বামীর অভাবে। তোমার পিতা অগাধ সম্পত্তিশালী—তুমি তাঁর আদরের কন্যা—তিনি তোমায় সোনার অট্টালিকায় বসিয়ে হীরে-জহরতে মুড়ে রাখ্‌তে পারেন, কিন্তু কখনও স্বামিসুখে সুখী কর্‌তে পার্‌বেন না। স্বামীর মতন প্রিয় বস্তু সংসারে আর নেই। লোকে কথায় বলে—স্বামী নিয়ে গাছতলাতে থাক্‌লেও সুখ।"

মনোরমা অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিল, "ক্ষমা কর সই, আর ভাল লাগে না।"

সুখদা। আর কোন কথা আমি তোমায় বল্‌ছি না; কিন্তু আমার এই অনুরোধটি তোমায় রাখ্‌তে হবে। বেচারীকে কয়েদ ক'রে না রেখে ছেড়ে দাও। তাঁর মার ব্যায়রাম, তোমরা মহাপাতকের ভাগী হবে, যদি তাঁর মার সঙ্গে দেখা না হয়।

মনো। আমি ত ভাই ও সব কথার ভিতর থাকিনি, আর আমি কয়েদ কর্‌তে বলিওনি। শুন্‌লুম, বাবাকে আর পিসীমাকে অনেক অপমানের কথা বলেছে, তাঁরাই ওকে বন্ধ ক'রে রেখেছেন। আমায় অনুরোধ করা মিথ্যা।

সুখদা। ধর্ম্ম যদি থাকে, তবে নিশ্চয়ই তিনি উদ্ধার হবেন। কিন্তু তোমাদের এটা মনে রাখা উচিত, ও রকম ক'রে এক জনকে কয়েদ ক'রে রাখা আইন-বিরুদ্ধ, আদালতে নালিশ চলে।

মনো। নালিশ করুক আর নাই করুক, আমার তাতে কোন ক্ষতি বা আপত্তি নাই।

তখন আকাশের গায় সন্ধ্যাতারা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আলো ও আঁধারের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া মনোরমা ও সুখদা;—একজন অমানিশার ঘোর অন্ধকার, আর একজন শ্যাম শশধরের সুস্নিগ্ধ হাসি। করুণাময়ীর পুণ্যজ্যোতিতেও মনোরমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মাথার উপর অনন্ত-নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশ। সম্মুখে পুণ্য-তোয়া মৃদু-কলনাদিনী জাহ্নবী সৌন্দর্য্যের সার বস্তু হৃদয়ে ধারণ করিয়া মনের সুখে হাসিতেছে—ভাব-তরঙ্গে ভাসিতেছে। জগতের ব্যগ্র আঁখি তাহার দিকে চাহিয়া আছে। নদীগর্ভ চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত। ভাবস্রোতে সদানন্দ বহুদূর অগ্রসর হইলেন। আশৈশব জীবনের সমস্ত কথা তাঁহার মনে পড়িল। মাতৃহীন বালক পিতার ক্রোড়ে বসিয়া একদিন এইরূপ সময়ে চাঁদের আলো দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। পিতৃবৎসল সন্তান পিতার আদরে কখন মায়ের অভাব জানিতে পারেন নাই। সে দিন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই স্মৃতিটুকু এখনও আছে।

সদানন্দ মনে ভাবিলেন, শৈশবের ক্রীড়াস্থল কোথায় সেই জন্মভূমি, আর আজ তিনি কোথায়? কে জানিত, জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে শ্বশুরালয়ে থাকিতে হইবে, আর অত্যাচারী জমিদার সীতানাথ রায়ের সভায় জড়পুত্তলিকার মত বসিয়া থাকিতে হইবে। অল্প বয়সে তিনি পিতৃমাতৃহীন।

মনোমোহিনী প্রকৃতির কি সুন্দর শোভা! রজনী জ্যোৎস্না-স্নাতা। ফুল্লাধরে হাসিরাশি উছলিয়া উঠিতেছে। ধরণীর নানা-ঞ্চলে চন্দ্রকরলেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বসন্তানিল-সঞ্চারিত পুষ্প-সুরভি প্রাণে মধু বর্ষণ করিতেছে। লীলাপর পিককুলের কুহু-স্বরে কানন মুখরিত।

সদানন্দের আনন্দভরা হৃদয়ে আনন্দের ধারা বহিল। বিভোর হইয়া সেই জাহ্নবীতীর মুখরিত করিয়া গান ধরিলেন—

আমার কিছু নাই মা তারা
শুধু আমিই আছি আমায় লয়ে।
যা কিছু মা ছিল আমার
এখন সকলি গেছে ফুরায়ে॥
সারা জীবন ধ'রে আমার
করেছি মা আমার আমার
এখন দেখি যে যার সে তার
শুধু তুমিই আছ আমার হয়ে॥
তাই সার করেছি রাঙা চরণ
রতনের সার অমূল্য ধন
রাখ্‌বো হৃদে ক'রে যতন
নয়ন-সলিলে ধুয়ে॥

অলক্ষ্যে মৃদুপদবিক্ষেপে সুখদা সদানন্দের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মোহিত-চিত্তে মধুময়ী রঙ্গিণীর সপ্তম তান প্রাণ ভরিয়া শুনিতে লাগিলেন। চিত্তহারিণী সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার হৃদয়ে গিয়া স্পর্শ করিল। তিনি মুগ্ধচিত্তে দেখিতে পাইলেন, কলঙ্কলেশশূন্য তাঁহার স্বামীর মুখমণ্ডলে পুণ্যের আভা স্পষ্ট প্রতিফলিত।

গান থামিল, স্তব্ধ পৃথিবী যেন দুঃখে ম্রিয়মাণ হইল। সুখদা ধীরে ধীরে তাঁহার স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন; তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "প্রভু, প্রণাম হই।"

সদানন্দ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কে ও সুখদা?"

হাসিটুকু মুখের মধ্যে মিলাইয়া সুখদা উত্তর করিলেন, "প্রভু কি চিন্‌তে পাচ্ছেন না?"

সদা। কখন্ এলে?

সুখদা। অনেকক্ষণ. প্রভুর গান শুন্‌ছিলাম। আপনি একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক।

সদা। ঠাট্টা কর্‌ছ সুখদা?

সুখদা। সে কি কথা প্রভু, আপনার সঙ্গে কি ঠাট্টা কর্‌তে পারি?

সদা। যাক্, আজ তোমায় একটা কথা বল্‌ব?

সুখদা। কি কথা বল না।

সদা। বল্‌ব?

সুখদা। অত ভাব্‌বার দরকার কি? বল না?

সদা। তুমি কিছু মনে কর্‌বে না ত?

সুখদা। যদিই বা করি, তাতে তোমার ক্ষতি কি? আমি ত আর তোমার মনিব নয় যে, তোমার বেতন কমে যাবে?

সদা। ঠাট্টা নয় সুখদা, আজ অনেকক্ষণ ধ'রে ভাব্‌-ছিলেম, তোমায় বল্‌ব কি না?

সুখদা। অত ভাব্‌বার দরকার কি? যা বল্‌তে হয়, বলেই ফেল না।

সদা। যদি তুমি রাগ কর? তা যাক্, বল্‌ছি, আমার আর কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না।

সুখদা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হুঁ।"

সদা। আমার আর এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই।

সুখদা। ভাল,।

সদা। আমার ইচ্ছে করে, কোথাও যেন চ'লে যাই।

সুখদা। উত্তম।

সদা। তুমি ঠাট্টা কর্‌ছ?

সুখদা। সে কি কথা প্রভু! আমি কি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা কর্‌তে পারি? তা হঠাৎ প্রভুর এ বৈরাগ্যসঞ্চার হ'ল কেন?

সদা। স্পষ্ট বল্‌ছি সুখদা, আমার মন বড় খারাপ হয়েছে।

সুখদা মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তা ত হবারই কথা। গৃহে যার নিত্য শান্তি বিরাজ কচ্ছে, তার ত মন খারাপ হবারই কথা।"

সদানন্দ কাতর হইয়া বলিলেন, "সত্য ক'রে বল্‌ছি সুখদা, আমার মনে বড় বিতৃষ্ণা হয়েছে। আমার কথায় বিশ্বাস কর। অমন নির্দ্দয়-হৃদয় জমিদারের অন্নদাস হয়ে থাকার চেয়ে ভিক্ষে ক'রে খাওয়াও ভাল।"

সুখদার চমক ভাঙ্গিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। গম্ভীরস্বরে তিনি বলিলেন, "এ কথা কি সত্য?"

সদা। সম্পূর্ণ সত্য। আর আমার এখানে থাকৃতে বিন্দু-মাত্রও ইচ্ছা নাই।

সুখদা। আমার মনের কথা তোমার নিজমুখে ব্যক্ত হ'ল। আমিও কত দিন থেকে ভাব্‌ছি, তোমায় এই কথা বল্‌ব। কিন্তু পৈতৃক ভিটে।

সদা। তা সত্য; কিন্তু আমি তোমার স্বামী।

সুখদা হাসিয়া বলিলেন, "আর বল্‌তে হবে না। আমি তোমার ভাঙা ঘর জ্যোৎস্নার আলো যেখানে যাবে, সঙ্গে থাক্‌বোই।

সদা। তা জানি। ও জ্যোৎস্নায় এ হৃদয়ের অন্ধকার নিত্য প্রতিহত। দিবারাত্রি যেমন সত্য, এ কথাও তেমনি সত্য। সুখদা, যদি সংসারে আমার কিছু সুখ থাকে ত সে তুমি। তুমি এ সদানন্দের সদানন্দরূপিণী।

সুহাসিনী সুখদা হাসিয়া বলিলেন, "এ কথা ত অনেক দিন শুনেছি, এখন যা বল্‌ছিলে, তাই বল।"

সদা। বল্‌ছিলাম, আমার এ সুখে বিতৃষ্ণা জন্মেছে। অমন নির্দ্দয়-হৃদয় জমিদারের সভায় অন্নদাস হয়ে থাকার চেয়ে আমার যজমানবৃত্তি সহস্রগুণে ভাল ছিল। তার উপর অনুকূল সরকারের অত্যাচার।

সুখদা। তার উপর কুলীনশ্রেষ্ঠ জামাতা, গুণে নারায়ণ সদৃশ, বিদ্যায় বৃহস্পতিতুল্য; এমন সুন্দর লোককে কি অপমানই না কল্লে! চল না, তোমার যেখানে ইচ্ছা হয়; আমি তোমার পদাশ্রিত ছায়া, আমার আর কোথায় স্থান বল।

সদা। তাই চল, তোমায় নিয়ে আমার পৈতৃক বাসস্থানেই যাই। যিনি জীব দিয়াছেন, তিনিই আহার দিবেন। এ সংসর্গ যত শীঘ্র ত্যাগ করা যায়, ততই ভাল। আর এক কথা শুনেছ, যে নূতন ডাক্তারটি এসেছেন, তাঁর কাছে অনুকূল সরকার পাঁচ শত টাকা ঘুষ চেয়েছে। এ যদি তিনি দিতে পারেন, তবেই তাঁর চাকরী হবে। আজকাল তার যে রকম অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে, তাতে আমার শুদ্ধ ভয় হয়, কি জানি, কোন্ দিন আমাকে বা অপমান করে। বাবুর কাছে বল্লে যে কোন প্রতীকার হবে, তার সম্ভাবনা নেই। কেন না, বাবু ত কিছুই দেখেন না, যা করে অনুকূল। এই বেলা মানে মানে স'রে পড়া যাক।

মানুষের সবই সহ্য হয়। সেখানে দিনকতক থাক্‌লে আপনিই মন ব'সে যাবে।

সুখদা। যদি আমার শ্বশুর-শাশুড়ী বেঁচে থাক্‌তেন, যদি তুমি শ্বশুড়বাড়ী থাক্‌তে ইচ্ছে না কর্‌তে, তা হ'লে আমি কোথায় থাক্‌তেম?

সদানন্দের বড় আহ্লাদ হইল। এই ত তোমা'র যোগ্য কথা। তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না, সমদুঃখভাগিনী সহধর্ম্মিণীর ভালবাসা কত মধুর, তাহা কত গভীর, প্রাণস্পর্শী। মমতাময়ী মানসী প্রতিমা। আনন্দে বিভোর হইয়া তিনি সুখদার হাত ধরিলেন। মাথার উপর অনন্ত নীলাকাশ তার মাঝে অনন্ত সুষমাধার স্নিগ্ধ শশধর। সদানন্দ সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, চন্দ্রকরোদ্ভাসিত নদীনীর অস্থির·গতিতে অবিরাম ছুটিতেছে। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইল, তাই প্রাণময়ী সহধর্ম্মিণীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "সুখদা, এ অস্থির চিত্তকে সংযত করিতে একমাত্র তুমি আছ আমার আর অন্য আকর্ষণ নাই।" তার পর সুখদার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, চন্দ্রকর-প্রতিফলিত সে মুখের শোভা যেন সহস্র গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভাবাবেশে বিভোর হইয়া তিনি বলিলেন, "সুখদা, এই যে জলরাশি অস্থির-গতিতে ছুটিতেছে, আমার ইচ্ছা হয়, আমিও ঐরূপ অস্থির হইয়া ছুটিয়া বেড়াই; কিন্তু তোমার মুখ দেখিলে আমি সব্‌ ভুলে যাই। যখন তুমি আমার কাছে থাকো, স্বর্গের সুখ আমি তুচ্ছ বোধ করি। তোমাকে আর চক্ষের অন্তরাল কর্‌তে ইচ্ছে করে না।"

সুখদা এক গাল হাসিয়া বলিল, "তা আমি জানি। তোমার মত স্ত্রৈণ আর দুটি নাই।"

সদা। লোকে বলে বটে। তা বলুক, তারা কি জান্‌বে, কি আনন্দ-স্রোতে আমি রাত্রি-দিন নিমগ্ন থাকি ?

সুখদা। তুমি এক জন কবি, তা আমি অনেক দিন জানি।

সদা। সুখদা, অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে প'ড়ে কোথায় ভেসে যাচ্ছিলেম—কত দূরে কোন্ সীমান্তপ্রদেশে, অজ্ঞাত অপরিচিত পথ বয়ে কোথায় চ'লে যেতেম, কে তার নিদর্শন পেতো ? জ্ঞান-- হীন, শক্তিহীন, ক্রিয়াহীন, একটা জড় পদার্থ প্রকৃতি-চালিত হয়ে ভূগর্ভে কোথায় অবস্থান কর্‌ত, কে তার অন্বেষণ কর্‌ত ?

এইরূপ জ্যোৎস্নাস্নাত সুন্দরী নিশার মনোমোহিনী প্রকৃতির মধুময় ক্রোড়ে বসিয়া অতীত কথার আলোচনায় কত সুখ। জীবনের দুঃখের দিনগুলি হৃদয়ের প্রতি স্তরে গাঁথা থাকে – সম-দুঃখভাগিনী সঙ্গিনীর নিকট সেই গ্রন্থিগুলি খুলিয়া দিলে কত সুখ, সমদর্শী লোকে তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

সদানন্দ আবার বলিলেন, "সুখদা, যে দিন প্রথমে আমার সেই দারুণ দুর্দ্দিনে তোমার পিতা শোকক্লিষ্ট আমার মুখ দেখে দয়ার ভাণ্ডার খুলে দিলেন, প্রথম যে দিন তাঁর শ্রীমুখে মধুর সান্ত্বনার কথা শুন্‌লেম, সেই দিন সেই সময় সুখদা, ভাষায় এমন কোন কথা নাই, আমার এমন কোন ক্ষমতা নাই, আমি প্রকাশ ক'রে বলি—আমার এ দগ্ধ হৃদয় স্নিগ্ধ হ'ল।"

সদানন্দের নেত্র বাহিয়া অশ্রু পড়িল। সমবেদনায় কাতর-হৃদয়া সুখদা তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন; মধুরকণ্ঠে বলিলেন, "কেন ও সব পুরাণো কথা ব'লে মনে কষ্ট পাও ?"

সদানন্দ বলিলেন, "কষ্ট কি সুখদা ! এ সব কথা মনে ভাব্-

লেও প্রাণে তৃপ্তি পাওয়া যায়। পিতৃ-মাতৃহীন এ অভাগাকে সে দুর্দ্দিনে তোমার বাপ না থাক্‌লে কে আশ্রয় দিত?”

সুখদা। তাঁর দেবচরিত্র।

সদা। হাজারবার বল। যদি জীবনের পর স্বর্গ থাকে, যদি পরোপকারে স্বর্গে অধিকার জন্মায়, তবে স্বর্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান তাঁর অধিকার।

সুখদা। তিনি আদর্শ-প্রকৃতির লোক ছিলেন।

সদা। তিনি মানুষ ছিলেন। শুধু হস্ত-পদ-বিশিষ্ট মানুষকে মানুষ বলা যায় না। তিনি ছিলেন ব'লে আমি আজ মানুষ ব'লে পরিচিত। শৈশব জীবনে পিতা-মাতার বিয়োগে আমি কি কষ্টই না পেয়েছি! সাত বৎসর বয়সের সময় আমার মাতৃ-বিয়োগ হয়। এগার বৎসর বয়সের সময় সংসারের একমাত্র রক্ষক, অভিভাবক, পরম স্নেহশীল পিতার স্বর্গলাভ হয়। মাতৃ-বিয়োগের শোক আমি ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পারিনি, পিতা রাত্র-দিন বুকে ক'রে রাখ্‌তেন, একদণ্ড আমাকে চক্ষের অন্তরাল কর্‌তেন না।

চিত্রার্পিতার ন্যায় সুখদা তাঁহার এই মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী শুনিতেছিলেন। স্বামীর অতীত-জীবনের দুঃখে অভিভূত তাঁহার হৃদয়ের করুণার ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বলিলেন, “ঈশ্বর সবই করিতে পারেন।”

সদা। পিতার মৃতদেহ প'ড়ে রইল, সৎকার কর্‌বার কেউ নাই। আমি বালক, তার উপর সংসারের একমাত্র প্রিয়বন্ধু পিতৃশোকে অভিভূত। সেই দুর্দ্দিনে—আমার সেই চরম বিপদে

সংসারে এত আত্মীয়বন্ধু কেউ আমার দুঃখে দুঃখিত হ'ল না। হাতে এমন অর্থ নাই যে, তাঁর সৎকার করি। অকূল পাথারে পড়ে ভাস্‌ছি, এমন সময়ে যেন কোন দৈবশক্তিবলে তোমার বাপ উপযাচক হয়ে উপস্থিত হলেন। ঈশ্বর-প্রেরিত তিনি শিষ্যের বাড়ীতে এসেছিলেন। সুখদা, যদি তিনি সে সময় উপস্থিত না হতেন, তা হ'লে কি হ'ত?

সুখদা। নিরুপায়ের উপায় ভগবান্।

সদা। এমন নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণ লোকও থাকে! আমাদের প্রতিবাসী সেই সময় আমার সেই চরম বিপদে আমাকে ব'লে পাঠালেন, "রামকৃষ্ণের মৃতদেহ শৃগাল-কুকুরের আহার হইবে, তবুও তাঁহারা আসিবেন না।" আমার পিতার সহিত ব্রহ্মোত্তর জমি লইয়া তাঁহাদের মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। তাঁহারা প্রবঞ্চক ছিলেন, আমার পিতা আদর্শ চরিত্র।

সুখদা। হিংস্রজন্তু অপেক্ষাও খল মানুষ সবই কর্‌তে পারে।

সদা। তার পর শোনো, পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া শেষ ক'রে বাড়ী ফিরে এলুম, তখন আমার বোধ হ'ল, সংসার আমার পক্ষে শূন্য, পৃথিবী যেন ঘন তমসাচ্ছন্ন কারাগার। জ্ঞান নেই—আমি বেঁচে আছি, ধারণা নেই—আমি কোথায়। আমার সমস্ত দেহ যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলিকণায় মিশে গেল।

সুখদা নিতান্ত কাতরভাবে বলিলেন, "থাক্ না কেন, দুঃখের কথা যতই আলোচনা কর্‌বে, ততই কষ্ট পাবে।"

সদা। তা নয়, তোমার কাছে এ সব কথা ব'লে মনের

সুখদাও মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন। স্বামীর প্রত্যেক কথা তাঁহার কর্ণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে গিয়া স্পর্শ করিল। স্বামি-স্ত্রীতে একত্র বসিয়া অতীত জীবনের দুঃখের কথা আলোচনা করায় কত সুখ—কত তৃপ্তি!

সদানন্দ বলিতে লাগিলেন, ' তার পর শোনো সুখদা! যখন আমার জ্ঞান ফিরে এল, যখন চিন্তা কর্‌বার ক্ষমতা ফিরে পেলেম, তখন আমার মনে হ'ল, আমি একা;—এই বিশাল পৃথিবীতে আমি সম্পূর্ণ একা। আপনা বল্‌বার কেউ নাই; রোগে শুশ্রূষা করে, পিপাসায় জল দেয়, এমন কেউ নাই; এই বিশ্ব-সংসারের ভিতর আপনার বল্‌তে কেউ নাই; আশ্রয়-হীন এ অভাগার কোন আশ্রয় নাই। এতক্ষণ পর্য্যন্ত চক্ষে অশ্রু ছিল না, বাহ্য-প্রকৃতি স্থির—পাষাণের মত নিশ্চল। তার পর যখন তোমার পিতা আমায় মিষ্টবাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, তখন নিরুদ্ধ শোক শতগুণে প্রবাহিত হ'ল। আমি আকুল-নয়নে কাঁদিতে লাগিলাম। সুখদা, আমার কাতর ক্রন্দনে তাঁর মহাপ্রাণ করুণারসে বিগলিত হ'ল। তাঁর নেত্র বহিয়া অশ্রু ঝরিল। তাঁর পবিত্র করসঞ্চালনে আমার সন্তাপিত দেহ স্নিগ্ধ হ'ল, তাঁর মধুর সান্ত্বনাবাক্যে দগ্ধ হৃদয়ে অনেকটা শান্তি বোধ করিলাম।"

ম্লান-নেত্রে সুখদা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। পুণ্যজ্যোতিপ্রতিফলিত তাঁহার মুখশ্রী দেখিয়া তিনি বিমুগ্ধ হইলেন;—বলিলেন, "এইবার চুপ কর, আর কেন ও সব কথা তোলাপাড়া কর?"

সদানন্দ বলিলেন, "সবই যেকালে শুন্‌লে, তা হ'লে শেষ

টুকুও শুন্‌তে হবে। সুখদা, এ সংসারে আমার আর কে আছে? তুমিই আমার সুখে আনন্দময়ী, দুঃখে বিষাদপ্রতিমা, এ অনুর্ব্বর জীবন-মরুতে অমৃত-উৎস, এ আঁধার হৃদয়ে পূর্ণ-চন্দ্রমা।"

আনন্দে আত্মহারা হইয়া সদানন্দ তাঁহার হৃদয়সর্ব্বস্বকে হৃদয়ে টানিলেন। চন্দ্রোদয়ারম্ভে স্ফীতবক্ষ জলধির ন্যায় তাঁহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইল। জড়িত-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "তোমায় লাভ ক'রে সুখদা, আমার সুখের শেষ নাই, তৃষ্ণার অবসান নাই, আনন্দের সীমা নাই। তুমি আমার চির-আকাঙ্ক্ষার ধন। যত দেখি, দেখ্‌বার সাধ আর মিটে না। ইচ্ছা করে, যেন লোকচক্ষুর অগোচরে চিরকাল তোমার মুখ-পানে চেয়ে থাকি। আমি যেন চিরদিন তোমাতেই বিলীন হয়ে থাকি।"

ইন্দীবর তুল্য নেত্র বাহিয়া সুখদার আনন্দাশ্রু ঝরিল। তিনি মনে ভাবিলেন, এমন কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বামী যার, সংসারে সেই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। তাঁহার হৃদয়ের ভিতর আনন্দের তুফান বহিল। অবশ নয়ন নিমীলিত করিয়া তিনি স্বামার কণ্ঠলগ্না হইয়া বলিলেন, "তুমি কত সুন্দর, আমি আজো ত বুঝ্‌তে পারিনি। তোমার ভালবাসা কত মধুর, এখনও আমি তা ধারণা কর্‌তে পারিনি। না জানি, কোন্ পুণ্যফলে, কোন্ সুকৃতিতে, কার আশীর্ব্বাদে আমি তোমার চরণ পূজা কর্‌তে পাই।"

নীল আকাশে চাঁদ হাসিতেছে, জাহ্নবী তাহার প্রতিবিম্ব বক্ষে ধরিয়া আছে, ধরণী মুগ্ধপ্রাণে তাহার পানে চাহিয়া আছে। সেই বিশ্ববিমোহন সৌন্দর্য্যে সুন্দরের মনোমোহিনী

সুন্দরী তাঁহার কণ্ঠলগ্না। প্রাণারাম মধুর সৌন্দর্য্যে তিনি বিমুগ্ধ হইলেন। মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিলেন, 'নারায়ণ, আমি পুণ্য চাহি না, স্বর্গ চাহি না যেন চিরদিন এই সুখেই বিভোর থাকি।'

বাঞ্ছিতকে চক্ষে চক্ষে রাখিতে কার অসাধ? এ সংসার স্বপ্নের মত, সংসারের সুখরাশি যেন স্বপ্নদৃষ্ট ছবির মত। স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেলে, নিশীথ-রাত্রের গৃহাবরুদ্ধ অন্ধকার আরও গাঢ় হয়। কে বলিতে পারে, তাঁহাদের জীবনের এই মধুর স্বপ্ন কতক্ষণ স্থায়ী হইবে?

ভালবাসার কি সীমা আছে? এ সংসারে যে যার প্রিয় বস্তু, সে তার কি সামগ্রী, কেহ কি তাহা বলিতে পারে?

সদানন্দ সুখদাকে বলিলেন, "সুখদা, এত যে কষ্ট সহ্য করেছি, এত যে দুঃখ পেয়েছি, আমার আর তা মনে হয় না। সে কেবল তোমার যত্নে, তোমার অকৃত্রিম আন্তরিক ভক্তিতে, তোমার অপার ভালবাসার গুণে। যে দিন প্রথম তোমার ঐ অম্লান পঙ্কজতুল্য মুখখানি দেখ্‌লেম, তোমার অস্ফুট মধুর বাক্য প্রথম যে দিন বীণাধ্বনির ন্যায় আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কল্লে, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে অতীত জীবনের সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া গেলেম। সুখদা, মনে পড়ে কি, প্রথম যে দিন তোমাদের বাটীতে পদার্পণ কল্লুম, আমি বিমর্ষ হয়ে এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি, সদ্য-প্রস্ফুটিত মল্লিকা-ফুলের মত গাল-ভরা হাসি নিয়ে তুমি ছুটে এলে, আমার মলিন মুখ দেখে তুমি জিজ্ঞাসা কল্লে, 'তোমার মুখ ভার কেন? তুমি হাস না!' মুহূর্ত্তমধ্যে আমার চমক ভাঙ্গল ঘোর অন্ধকারভরা জীবনে প্রথমে আলোর

মুখ দেখ্‌তে গেলেম। তোমার নির্দ্দোষ সুন্দর মুখের পানে আমি অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেম। তুমি আবার বল্লে, 'আমার সঙ্গে খেলা কর্‌বে ত এসো। তুমি মুখ ভার ক'রে থেকো না।' সেই প্রথম আমার মুখে হাসি ফুট্‌ল। জনক-জননী-বিয়োগ কাতর আমার সন্তাপিত প্রাণে সেই প্রথম শান্তি অনুভব কল্লুম।"

সুখদা হাসিয়া বলিলেন, "এতও তুমি মনে ক'রে রেখেছ।"

সদা। এ সব কথা কি জীবনে কখন ভুল্‌তে পার্‌ব?

নব-বসন্তের আগমনে যখন ফুলপত্রে শোভিতা ধরণীর অপূর্ব্ব শোভায় প্রাণ বিমুগ্ধ হয় নব-জীবনসঞ্চারে যখন জীব-দেহ আনন্দে ভাসিতে থাকে, মন্দানিল-সঞ্চারিত পুষ্প-পরিমলে যখন দিক্ সকল আমোদিত, সেই সময়ে তাঁহাদের শুভ-সম্মিলন। হিম-অবসানে ধরণী মুক্ত, দুঃখ-অবসানে তাঁহারও মুক্তি লাভ হইল। মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইয়া যখন তিনি মরণকে আলিঙ্গন পরম সুখের ভেবেছিলেন, তখন কি বিন্দুমাত্রও বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে, তাঁহার ভবিষ্যৎ-গর্ভে এত সুখ নিহিত আছে?

সদানন্দ বলিলেন, "সুখদা, ঈশ্বর সবই কর্‌তে পারেন। তিনি কাহাকেও হাসান, কাহাকেও কাঁদান। তা না হ'লে কে বল্‌তে পার্‌ত, তোমার আমার ভাগ্যসূত্র এক সঙ্গে গ্রথিত হবে? কে জান্‌ত, এমন আনন্দপ্রতিমা আমার হৃদয়ে বিরাজ কর্‌বে? আমার মত সুখী কে? এমন আনন্দময়ী কার ঘরে বিরাজ কচ্ছে?"

সুখদাও তাঁহার কথার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আর আমার মত সৌভাগ্যবতী কে আছে? আমি মনে ভাবি, লোকে শিব-পূজা করে, শিবের মত বর লাভ হবে ব'লে; কিন্তু আমি

যেন স্বয়ং শিবকেই পেয়েছি। তোমার মত পুরুষের দাসী হবারও আমি যোগ্য নই।"

সদানন্দ হাসিয়া কহিলেন, "তা বটে। তা যাক্, তোমায় বল্‌ছিলেম, আগে আগে কত ফুল তুলে আন্‌তে, যত্ন ক'রে মালা গেঁথে আমার অপেক্ষায় ব'সে থাক্‌তে, কই, এখন ত আর একদিনও ফুল আন না?"

সুখদা। এখন আর সইয়ের কাছে যেতে ইচ্ছে করে না। তার আচার-ব্যবহার দেখে আমারই যেন ঘৃণা জন্মে গেছে। আজ আমি তাকে অনেক বলেছি, অনেক ক'রে বুঝিয়েছি; কিন্তু তার স্বামীর প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণাভাব, আমি কিছুতেই তা দূর কর্‌তে পার্‌লেম না। আমার বাল্যকালের খেলার সাথী, তার অদৃষ্ট ভেবে আমি বড় ব্যাকুল হয়েছি।

সদা। বাবুর বাড়ীর আর ভাল দেখ্‌তে পাই নে। বাবু ত রাত্রিদিন বেঁহুস হয়ে আছেন; আজকাল এক রকম অচৈতন্য-ভাবেই কাল কাটাচ্ছেন; কেউ কোন কথা বল্‌তে সাহস করে না; ভাল কথা বল্‌লেও চটে যান, আর মন্দ কথা যে বল্‌বে,—কার ঘাড়ে দশ মাথা যে ওঁকে কোন কথা বল্‌বে? যা করে অনুকূল সরকার। সেই এখন এ রাজ্যের রাজা। সেই জন্যই বল্‌ছি সুখদা, এ সংসর্গ যত শীঘ্র পরিত্যাগ করা যায়, ততই ভাল।

সুখদা। তাই কর, আমার আর এখানে থাকৃতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নাই।

অনেক রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিলেন। সুখদার পিতা বৃদ্ধ সনাতন ভাগীরথী-তীরে মনের মত

করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জাহ্নবী-সলিল-সম্পৃক্ত স্নিগ্ধ সমীরণ বাতায়ন ভেদ করিয়া নিদাঘের প্রচণ্ড আতপ প্রশমিত করিত। তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া ভাগীরথীর অপূর্ব্ব তরঙ্গমালা দর্শন করিতেন। পুণ্যতোয়া জাহ্নবী জননীর ন্যায় তরঙ্গ-হস্তে যেন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেন।

শয্যায় শুইয়া সুখদা ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার পিতার এত সাধের আবাসভূমি এইবার তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। শৈশবের মধুর স্মৃতি মনের মধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। পিতা কত পরিশ্রম করিয়া, কত অর্থ ব্যয় করিয়া এই সুরম্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বদাই বলিতেন. তাঁহার সুখদা তাঁহার অবর্ত্তমানে এই গৃহেই চিরদিন বাস করিবে। তিনি তাঁহার জামাতাকে গৃহে রাখিবেন, যেন তাহাকে আর কোথাও না যাইতে হয়। তাঁহার একমাত্র সন্তান সুখদার কোন বিষয়ে অভাব না হয়। সুখদা ভাবিয়া দেখিলেন, তিনি চলিয়া গেলে তাঁহার পিতার এত যত্নে নির্ম্মিত গৃহে সন্ধ্যা পড়িবে না। হায়! যদি সুখদার সহোদর থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার কোন চিন্তার কারণ থাকিত না। তিনি কি করিবেন, স্বামীর ইচ্ছাই তাঁহার আজ্ঞা তাঁহাকে অবশ্য তাহা পালন করিতে হইবে। পতিগতপ্রাণা সাধ্বীর প্রধান কর্ত্তব্য স্বামীর মনোরঞ্জন করা। স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হওয়াই নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা নাই, ছায়ার ন্যায় স্বামীর পদানুসরণ করিতেই হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হরেন্দ্রকুমার শ্বশুর কর্তৃক বন্দী হইয়া খালি মহলে নীত হইলেন। জমিদার সীতানাথ রায়ের সেই বৃহৎ অট্টালিকার পশ্চাতে এই মহল ছিল। কেহ কেহ এই মহলকে ন'গিন্নীর মহল বলিত। ন'গিন্নী সীতানাথ বাবুর পিতামহের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ। অতি অল্প-বয়সেই তিনি বিধবা হন। প্রবাদ আছে, তাঁহার স্বভাব-চরিত্র আদৌ ভাল ছিল না; সেই জন্য তিনি সীতানাথ বাবুর পিতামহের সহিত একত্রে বাস করিতেন না। তিনিও ভ্রাতৃবধূর চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার সহিত কোন সম্পর্কই রাখিতেন না।

তাঁহার মৃত্যুর পর তিন দিবস ধরিয়া তাঁহার মৃতদেহ পড়িয়া ছিল। যখন তাহা পচিয়া নিতান্ত দুর্গন্ধ বাহির হইল, সেই সময় গৃহকর্ত্তা জানিতে পারিয়া বৈষ্ণব ডাকিয়া তাঁহার সৎকার করেন। তাঁহার অর্থলোভে তাঁহারই প্রেমাস্পদ কোন দুর্ব্বৃত্ত নিশীথকালে তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার সমস্ত অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করে। সেই অবধি এই মহল পরিত্যক্ত। পরিচারিকাগণ ও প্রৌঢ়া বিধবাগণ এই মহল সম্বন্ধে অনেক কথা বলিত। এই স্থান যে উপদেবতার আগমনস্থল—এই বিষয় প্রমাণ করিতে তাঁহারা অনেক গল্পের অবতারণা করিতেন। কেহ কেহ শপথ করিয়া বলিত, কালা-পেড়ে ধুতি পরিয়া ন'গিন্নী জানালার ধারে দাঁড়াইয়া থাকেন,

ইহা তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। মোট কথা, ন'গিন্নীর মহল আর আবাসের উপযুক্ত নয়।

হরেন্দ্রকুমার পিশাচ-প্রকৃতি শ্বশুরের অমানুষিক নিষ্ঠুর অত্যাচারে এই জনহীন শূন্য পুরীতে নীত হইলেন। উপদেবতার ভয়ে তিনি তত ভীত ছিলেন না। তাঁহার প্রাণের ভিতর আকুল ক্রন্দন উঠিল, তাঁহার জননী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা, বুঝি তাঁহার সঙ্গে আর দেখা হইল না। কি উপায় করিবেন? আজ সাত দিন ধরিয়া তিনি এই প্রকার বন্দী অবস্থায় এই শূন্য পুরীতে বাস করিতেছেন। মনুষ্যের সম্পর্ক রহিত—কেহ নাই যে তাঁহার সহিত একটা কথা কহে, একটা মিষ্ট কথা বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করে। মধ্যাহ্নে একজন পাচিকা দ্বারবান্ সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে অন্ন দিয়া যাইত এবং রাত্রেও তাঁহার জন্য খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দিত। এই পাচিকাই তাঁহাকে যা দু'একটা মিষ্ট কথা বলিত।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে হরেন্দ্রকুমার গৃহ-প্রাঙ্গণে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। উপরে চাহিয়া দেখিলেন, নয়নাঞ্জন-সন্নিভ নবঘনে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন। ধরণী গাঢ় অন্ধকারের কোলে অঙ্গ ঢাকিয়াছে। তড়িৎপ্রভা ক্ষীণ দীপশিখার মত মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার আঁধার হৃদয়ে আলোক-সঞ্চার করিয়া পরক্ষণেই আবার তাহা ঘনান্ধকারে পরিব্যাপ্ত করিতেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। গৃহে মৃৎপ্রদীপ ক্ষীণ আলোকরেখা গৃহের অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর করিতে পারে নাই। তিনি সেই নির্জ্জন গৃহে নিঃশঙ্কচিত্তে ডাকিতে লাগিলেন, "মা চৈতন্যরূপিণি, আমায় চৈতন্য দাও।" প্রাণের তানে আঘাত

করিয়া, সেই নিস্তব্ধ পুরী কম্পিত করিয়া গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন, "মা চৈতন্যরূপিণি! আমায় চৈতন্য দাও। কত দিনে মা, এ বন্ধন ছিন্ন হবে, কত দিনে তারা, আমার কর্ম্মের শেষ হবে?" তাঁহার নেত্র বাহিয়া অশ্রু পড়িল। হায়, এমন কে আছে, তাঁহার নয়নের জল স্নেহ-হস্তে মুছাইয়া দিবে?

হরেন্দ্রকুমার কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতে লাগিলেন, এত কি পাপ তিনি করিয়াছেন যে, তাঁহার এই শাস্তি? মায়ের উপর রাগ করিয়া সন্তান যেমন আক্ষেপ করে, হরেন্দ্রকুমার তেমনি করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এত কি দোষ যে জননী তাঁহার প্রতি এত বিরূপ? সম্বলহীন দরিদ্রের একমাত্র ভরসা যে তিনি। আর ত এ যন্ত্রণা তাঁহার সহ্য হয় না। সম্মুখে তামসী নিশি আপনার বিশাল উদরে সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ প্রসুপ্ত, আঁধারের কোলে আশ্রিত। কে জানে, এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে এই বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারের আবরণে মা, তোমার কোটি কোটি সন্তানের ভিতর কে কোন্ অবস্থায় নিপতিত? হায় মা, তুমি পাষাণের মত নিশ্চল। তোমার কর্ণ কি এত বধির যে, সন্তানের আকুল ক্রন্দনে তোমার মর্ম্ম বিগলিত হয় না? অসহায় পথিক মধ্যাহ্ন-কিরণে ক্লান্ত হয়ে যখন বৃক্ষতলে নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করে, বিষধর ভুজঙ্গম তখন অতর্কিত নিদ্রিত পান্থের সুখনিদ্রা চিরনিদ্রায় পরিণত করে। কিন্তু বলবান্ নরের সতর্ক দৃষ্টির নিকট তার হিংস্রতার পরিচয় মৃত্যু। কেন মা, তোমার এই বিশ্বরাজ্যে এই ভয়ানক তারতম্য? যে দুর্ব্বল তার গতি নাই, সে পদে পদে লাঞ্ছিত, অপমানিত, লোকচক্ষে হেয়, সমাজে

উৎপীড়িত। সেও ত মা তোমার সন্তান, সেও ত তোমার কোটি কোটি সন্তানের মত তোমায় মা ব'লে ডাকে। ক্ষুধার্ত্তের ক্লিষ্ট বদন দেখে কেউ একবার আহা বলে না। দারুণ তৃষ্ণায় কাতর দরিদ্রের মাথার ভার কেহ কি কখন বহন কর্‌তে চায়? মা গো! তোমার এই বিশাল সৃষ্টির ভিতর কত অভাগা অনাহারে অর্দ্ধাশনে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে, তার মর্ম্মান্তিক বিলাপে পাষাণও আর্দ্র হয়, কিন্তু কই, কজন সহৃদয় লোক আছে যে, তার কাতরক্রন্দনে তাহাদের মর্ম্ম বিগলিত হবে? ব্যাধিক্লিষ্ট দরিদ্রের পাংশু মুখ দেখে কয়জনের প্রাণে আঘাত লাগে, কয়জন তার যাতনার প্রতীকার করিতে চেষ্টা পায়? এই কি মা, শান্তির নিকেতন সংসার? এ জীবনে এক নিমিষের জন্যও শান্তি পাইনি, এক মুহূর্ত্ত স্থায়ী শান্তির জন্য আমি লালায়িত। প্রতিক্ষণে জীবনে নরক-যন্ত্রণা-ভোগ, প্রতি পদক্ষেপে আশঙ্কায় হৃদয় উদ্বেলিত, কখন্ অদৃষ্টের গতি কোন্ পথে যায়! এত কি পাপ, বুঝ্‌তে পারিনি, অথবা এ কি আমার অবিমৃশ্যকারিতার ফল? দরিদ্রের সন্তান হয়ে সুখকামনায় ধনবানের দুহিতার পাণিগ্রহণ করেছি, ধনবান্ শ্বশুরের অন্নে এ দেহ পুষ্ট; ঐশ্বর্য্যশালীর সুন্দরী কন্যা আমার অঙ্কশোভিনী হবে—কল্পনায় অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলাম, ঘোর অন্ধকারে যেন সহসা একবার নয়ন-সমক্ষে বিদ্যুদ্দীপ্ত, পর-মুহূর্ত্তেই আরও গভীর অন্ধকার। জীবনের সমস্ত আশা ফুরিয়ে গেছে। ভেবেছিলাম, অর্থহীন স্বামীর অপার ভালবাসা তার সমস্ত অভাব মোচন করবে, কিন্তু যে চিরদিন বিলাসের ক্রোড়ে প্রতিপালিতা, তার প্রাণে কি ভালবাসা আছে? পিতা বড়-

লোকের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, এত দিনে ছেলের গতি হ'ল, কিন্তু তার বর্ত্তমান অবস্থা দেখ্লে কিছুতেই চক্ষের জল সংবরণ কর্‌তে পার্‌বেন না।

অনেকক্ষণ ধরিয়া হরেন্দ্রকুমার নিজের জীবনের দুঃখের বিষয় আলোচনা করিলেন। অনেকক্ষণ পরে পাচিকা ধনুর মা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার হস্তের আলোকরেখা তাঁহার চক্ষের উপর পতিত হইলে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি কাতর-নয়নে একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। এই নিৰ্জ্জন পুরীতে দুর্দ্দশার চরম-সীমায় উপনীত হইয়া তিনি ধনুর মাকেই আপনার করিতে পারিয়াছিলেন। বৃদ্ধা পাচিকার অন্তঃকরণে দয়া ছিল, তাই এই ব্রাহ্মণ-সন্তানের অপরিসীম দুঃখে তাহার অন্তর গলিয়াছিল. তাঁহার জন্ম তার নেত্র বহিয়া অশ্রু ঝরিত। এ সংসারে উচ্চ-নীচ নাই, আপনার পর নাই—সহানুভূতি হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তি, তাহা অজ্ঞাতেই স্ফূর্ত্তি পায়।

ধনুর মা প্রতি রাত্রে একজন দ্বারবান্ সঙ্গে লইয়া তাঁহার জন্ম খাবার আনিত। দ্বারবানের হস্তে চাবী থাকিত। আজ যখন তাহারা উপস্থিত হইল,তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। দ্বারবান্ দূরে বসিল। ধনুর মা স্নেহজড়িত-কণ্ঠে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, অন্ধকারে বসে আপন মনে কি বল্‌ছিলে?"

হরেন্দ্রকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন, "ভাব্‌ছিলাম মা, এত কি পাপ করেছি যে, তার এই শাস্তি? ভাব্‌ছিলাম, ঈশ্বর কি নাই, তিনি কি দেখ্‌তে পান না, আমি কি দোষে এত কষ্ট পাচ্ছি?"

ধন্নুর মা। অবশ্য দেখ্‌তে পান। ঈশ্বর নাই, এ কথ বলো না। ঈশ্বর আছেন, তার প্রমাণ এখনি পাবে।

হরেন্দ্রকুমার বিস্মিতভাবে তাহাকে বলিলেন, "বুঝ্‌তে পার্‌লেম না মা, তোমার কথার অর্থ কি?"

ধন্নুর মা। বাবা, তুমি আগে খেয়ে নাও, তার পর বল্‌ছি।

হরেন্দ্রকুমার তাহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। ধন্নুর মা তাঁহার আহার শেষ হইলে তাঁহাকে বলিল, "আর দেরী করো না বাবা, এইবার আমার সঙ্গে এসো।"

হরেন্দ্র। কোথায় যাবো?

ধন্নুর মা। সত্যি সত্যি চিরদিনই কি তুমি এইখানে থাক্‌বে, তাও কি কখন হয়? আমি অনেক ক'রে দোবেকে বুঝিয়েছি, আমি তাকে বাপ বলেছি, তাকে অনেক ভাল ভাল জিনিস খেতে দিই, তাইতে সে রাজি হয়েছে। বাবা, সত্য সত্যই কি ধর্ম্ম নেই?

হরেন্দ্রকুমার কৃতজ্ঞচিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধন্নুর মা, আমার জন্য তুমি এত কষ্ট কচ্ছ কেন?"

ধন্নুর মা। কিছু না বাবা, কিছু না, তুমি কিছু মনে করো না। তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, তায় আবার এই বাড়ীর জামাই, তোমার উপর এ অত্যাচার আর আমি চক্ষে দেখ্‌তে পারিনি এ রকম কি কেউ কখন শুনেছে? চল বাবা, আর দেরী ক'রে কাজ নেই।

কৃতজ্ঞতায় হরেন্দ্রকুমারের অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইল। তিনি মনে ভাবিলেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই স্ত্রীলোক আমার যে উপকার করিতেছে, কখনও কি তার ধার শুধ্‌তে পার্‌ব? তিনি স্পষ্ট

বুঝিতে পারিলেন, যদি কিছু ধর্ম্ম থাকে ত গরীব-দুঃখীর ভিতরেই আছে। অর্থের গর্ব্বে অজ্ঞান নর দয়া-মায়া বিসর্জ্জন দেয়, কিন্তু দুঃখীর অন্তর করুণায় পরিপূর্ণ। তিনি বাষ্পরুদ্ধ-স্বরে তাহাকে বলিলেন, "ধনুর মা, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, আমি চ'লে গেলে যদি জান্‌তে পারে যে, তোমরা আমায় ছেড়ে দিয়েছ, তখন তোমাদের উপায় কি হবে?"

ধনুর মা। সে জন্য তুমি কিছু ভেবো না বাবা, আমি দোবেকে শিখিয়ে রেখেছি, সে যেন উত্তর দেয়, আমি সন্ধান ক'রে তার চাবী চুরি ক'রে তোমায় ছেড়ে দিয়েছি। তার কোন দোষ হবে না। আর আমার কথা ছেড়ে দাও বাবা! রাঁধুনীবৃত্তি ক'রে খাই, আমার ভাবনা কিসের? বড় জোর আমায় জবাব দেবে। আমাকে ত আর তোমার মত কয়েদ ক'রে রাখ্‌তে পারবে না।

হরেন্দ্র। ধনুর মা, আমি এ জীবনে কখন তোমার ধার শুধ্‌তে পার্‌ব না। আমি জানিনে, আমার গর্ভধারিণী বেঁচে আছেন কি না; কিন্তু তোমার অনুগ্রহে আশা হয়, হয় ত তাঁকে দেখ্‌তে পাব। ধনুর মা, যদি তাঁকে দেখ্‌তে না পাই, আমার এ আপ্‌শোষ মলেও যাবে না।

ধনুর মা। কেন দেখ্‌তে পাবে না বাবা, তোমার মাতৃভক্তি আছে, নিশ্চয়ই তোমার মার সঙ্গে দেখা হবে।

হরেন্দ্র। যদি দেখা হয়, সে কেবল তোমার দয়ায়।

ধনুর মা। আমার কথা কিছু মনে করো না বাবা! তোমার কষ্ট দেখে আমি থাকৃতে পারিনে। তোমার মুখ দেখে আমার মনে হয়, আজ যদি আমার ধনু বেঁচে থাক্‌ত, সেও তোমার মত

হ'ত। আর তা হ'লে কি আমায় পেটের দায়ে চাকরী করতে হ'ত? বাবা, সময় সময় মনে ভাবি, আমি কোন নিবিড় বনে চ'লে যাই। আর আমি সংসারেও বেশী দিন থাকবো না। কিছু টাকা করেছি, আর কিছু করতে পাল্লেই আমি কাশী চ'লে যাব।

হরেন্দ্র। ধনুর মা, আমিও তোমার ছেলে। আমাকে তোমার সেই ছেলে মনে কর, আমার সঙ্গে যেতে পার। আমি যত দিন বেঁচে থাকব, তোমায় মার মত যত্ন করব।

ধনুর মা। বাবা আমার ইচ্ছে করে, তোমার সঙ্গে যাই, কিন্তু তোমাদের গরীবের সংসার।

হরেন্দ্র। তা হোক্। তার জন্যে কোন ভাবনা নেই। আমি এক মুটো খেতে পেলে তুমিও পাবে।

ধনুর মা। সে কথা এখন থাক্। যদি বেঁচে থাকি, আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে। আর তুমি এটা মনে স্থির জেনো, এমন একদিন আসবে, যে দিন তোমার জন্য সীতানাথ রায়কে চখের জল ফেলতে হবে। চল বাবা, আমি তোমায় বাগানের গেট পার ক'রে দিয়ে আসি।

হরেন্দ্র। চল মা, কিন্তু মনে রেখো, আমি তোমার সন্তান। আর যদি কখন কোন বিপদে পড়, আমাকে সংবাদ দিও, আমি যেখানে থাকি, ছুটে আসব।

বাগানের গেট পর্য্যন্ত ধনুর মা হরেন্দ্রকে রাখিয়া আসিল।

হরেন্দ্রকুমার রাস্তায় দাঁড়াইয়া মনে ভাবিলেন, কোথায় যাইব? এই অন্ধকার রাত্রে এই ঝড়-বৃষ্টির ভিতরে কোথায় আশ্রয় পাইব? কার বাড়ীতে যাব আর কেই বা আমায় আশ্রয়

দিবে? বিশ্বাস ত কাহাকেও নাই। এক সদানন্দ ঠাকুরকে বিশ্বাস কর্‌তে পারি। ব্রাহ্মণ পরোপকারী, ধার্ম্মিক, অন্তঃকরণ দয়ায় পরিপূর্ণ।

এই যুক্তি স্থির করিয়া হরেন্দ্রকুমার সদানন্দ ঠাকুরের বাটীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। অন্ধকারে পথ চিনিয়া যাইতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইল। সদানন্দ ঠাকুর তাঁহাকে আদর করাইয়া বসাইলেন। মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে বলিলেন, "জামাই বাবু, আপনি যে মুক্ত হইয়াছেন, ইহাতে আমি বড় আহ্লাদিত হইলাম। যদিও তিনি আমার অন্নদাতা, তবুও আমি বেশ বল্‌তে পারি, বাবুর প্রবৃত্তি অতি নীচ। আপনাকে এ প্রকারে কষ্ট দিতে তাঁর কোন অধিকার নাই।"

হরেন্দ্রকুমার দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, যদি ঈশ্বর থাকেন, তিনিই ইহার বিচার করিবেন। আমি গরীব, তিনি শক্তিমান, তাই আমার উপর এই অত্যাচার কল্লেন। বিশেষতঃ আমার মার এই ব্যায়রাম। হয় ত মার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।" মাতার কথা মনে করিয়া হরেন্দ্রকুমার কাঁদিতে লাগিলেন।

ব্যথার ব্যথী যে, তাহার নিকট চক্ষের জল ফেলিলে মনের কষ্ট অনেক লাঘব হয়। মিষ্টবাক্যে সদানন্দ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। নিদাঘের তপ্ত বালুকার মত হরেন্দ্রের হৃদয় সদানন্দের মিষ্ট-কথায় শীতল হইল। সুলোচনা আসিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন; তাঁহার জন্য সুকোমল শয্যা রচনা করিয়া দিলেন। তাঁহাকে আহার করিবার জন্য সুলোচনা অনেক বলিলেন; কিন্তু হরেন্দ্র আহার করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার এই অনুরোধ

রক্ষা করিতে পারিলেন না। কথা স্থির হইল, পৃথিবীর লোক জাগিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই তিনি এই গ্রাম ত্যাগ করিবেন।

হরেন্দ্রকুমার বিদায় হইবার পূর্ব্বে কৃতজ্ঞ-চিত্তে সদানন্দের করস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "দাদা, আজ অবধি আমাকে আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মনে করিবেন। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাই, আপনিই আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আপনার এই আদর-যত্ন, বৌ-ঠাকুরাণীর স্নেহ-মমতা আমি ইহ-জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

দ্বিতীয় খণ্ড।
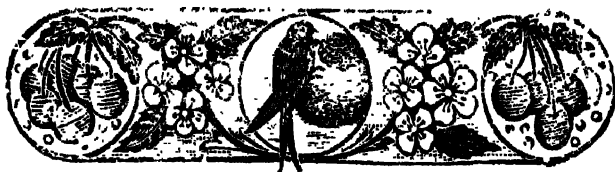
প্রথম পরিচ্ছেদ

সুরেশ বাবুর বাটী হইতে রওনা হইবার পর সুলোচনা বড়ই কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি ছয় মাস কাল স্বামীর সহিত একত্রে অবস্থান করিয়াছেন, স্বামীর সুখ-দুঃখে সমান অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে স্বামীর সহিত কদাচিৎ তাঁহার সাক্ষাৎ হইত। বৎসরের ভিতর মাত্র দুইবার কি তিনবার তিনি বাটী আসিতেন, বহু আয়াসলভ্য দরিদ্রের রত্নের মত তাঁহার কত সাধনার বস্তু। তাই সমদুঃখভাগিনী সুলোচনা তাঁহার অদর্শনে বড়ই কাতর হইলেন। তাঁহার তপ্ত হৃদয়ে দুই ফোঁটা শীতল জল পড়িয়া ক্ষণেকের মধ্যে মিলাইয়া গেল, তাহার শৈত্যগুণ বুঝিতে, না বুঝিতে আবার তাঁহাকে যেন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল।

আকাঙ্ক্ষার ধনকে চখে চখে রাখিতে কার না ইচ্ছা হয়? প্রিয়-সমাগম-সুখে বিভোর থাকিতে কে না কামনা করে? সুলোচনা চিত্ত স্থির করিতে পারিলেন না। শিশিরানিল-সম্পর্কে শুষ্কপর্ণ বৃক্ষের মত তাঁহার স্নেহলতা দিন দিন শুকাইতে লাগিল।

কত দিনে বসন্ত-সমাগম-সুখে আবার তাঁহার মলিনশ্রী প্রফুল্ল হইবে?

সুলোচনা স্বামীর দুঃখের কথা আলোচনা করিয়া আরও কষ্ট বোধ করিলেন। তাঁহাকে একদিনের জন্যও সুখী দেখেন নাই। স্বামীর বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখ, কর্ম্মভারে তাঁহার অবসন্ন দেহ তাঁহার মানসপটে চিত্রিত রহিল। কর্ম্মশেষে যখন সমস্ত দিবসের শ্রান্ত দেহ লইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, সুলোচনা তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেন। তাঁহার মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস সুলোচনার হৃদয়ে যেন কণ্টক বিদ্ধ করিত।

তখন গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড সূর্য্য সমস্ত দিবস ধরিয়া সহস্র-কিরণে যেন অগ্নিকণা বর্ষণ করিয়াছে। ধর্ম্মোদ্গমে দেহ অবসন্ন। তাই অন্তঃপুরসংলগ্ন পুষ্করিণীতে সুলোচনা গাত্র প্রক্ষালন করিতে গমন করিলেন। প্রদোষের স্নিগ্ধ সমীরে তাঁহার অবসন্ন দেহ কথঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইল। সরোবর-সোপানোপরি অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল. শঙ্খধ্বনি গৃহস্থের মঙ্গল সূচনা করিল। সুলোচনা কত কথাই ভাবিতে লাগিলেন। স্বামি-সোহাগিনী স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া এই পৃথিবীতে স্বর্গের অস্তিত্ব অনুভব করিতেন। তাঁহার অধর-প্রান্তে হাসির রেখা. সুলোচনার আঁধার হৃদয়ে ফুল্ল জ্যোৎস্না। হায়, আবার কত দিনে সে জ্যোৎস্না ফুটিয়া তাঁহার নির্জ্জীব প্রাণে জীবনসঞ্চার করিবে? সুলোচনা চিন্তাস্রোতে অনেক দূর অগ্রসর হইলেন।

তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া ননদিনী মায়া তাঁহার অন্বেষণে সেই

স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, ভ্রাতৃবধূ জলের উপর পা রাখিয়া ঘাটে বসিয়া প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্না। দেখিয়া তাঁহার রাগ হইল; রুক্ষস্বরে ডাকিলেন, "বৌ!"

চমকিত হইয়া সুলোচনা ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার ননদিনী তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি একাকিনী বসিয়া আছেন, কাজটা ভাল হয় নাই। তাই অপরাধিনীর মত উত্তর করিলেন, "কেন ঠাকুরঝি? কিছু দোষ করেছি কি?"

মায়া বলিলেন, "না, এমন কিছু নয়। তবে গৃহস্থ ঘরের সোমত্ত বৌ সন্ধ্যা বেলায় একা পুকুর-ঘাটে বসে থাকা,— তোমরা বেশী লেখাপড়া জানো কি না, তোমাদেরই ভাল লাগে, আমাদের ভাল লাগে না। কি জানো, উপদেবতার নজর এই স্থানেই প'ড়ে থাকে। যাক্, সে সব কথা পরে হবে এখন গা ধুয়ে ঘরে চল।"

গাত্রপ্রক্ষালন করিয়া সুলোচনা গৃহে উপস্থিত হইয়া ননদিনীর কথায় উত্তর দিলেন, "ঠাকুরঝি, উপদেবতার নজর কোথায় না পড়ে? ঘরের মধ্যেও কি ভূত-প্রেতের উপদ্রবের কথা শোননি?"

মায়া। শুন্‌বো না কেন? তবে ঘরের মধ্যে আধিপত্য করা বড় কঠিন। আর প্রায়ই শোনা যায়, বাইরে থেকে ভূত ঘাড়ে চেপে শেষে ঘরে পর্য্যন্ত উপদ্রব করে।

সুলোচনা হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমি বলি, পুকুর-ঘাটে আর রক্ষিত গৃহে উপদেবতার সমান অধিকার ঘটে, যদি মনের জোর না থাকে।"

মায়া। যথার্থ, কিন্তু স্থান, কাল আর পাত্র বিবেচনা ক'রে কার্য্য করবে, এ কথাও তো লোকের মুখে শুনতে পাই। তুমি আজ একলা ও রকম ক'রে সন্ধ্যেবেলায় ব'সে ছিলে, কোন্ দিন কে দেখ্‌বে আর একটা মন্দকথা রটনা করবে। দাদা বাড়ী নেই, দেশের লোক ও ভাল নয়, কেবল পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়ায়; যদি এক কথা কেউ বলে, তা হ'লে এ অপমান আর রাখ্‌বার জায়গা নেই। সব বিষয়ই ভেবে চিন্তে করতে হয়।

সুলোচনা লজ্জিতা হইলেন; কুণ্ঠিত হইয়া উত্তর করিলেন "অপরাধ হয়েছে ঠাকুর ঝি, আমি অতটা বঝ্‌তে পারিনি। আচ্ছা ঠাকুরঝি, তুমি যখন তখন বল, তোমরা লেখাপড়া জানো, তুমি কি নিজে জানো না, না বই পড় না?"

মায়া। পড়্‌ব না কেন? তবে তোমার মত অত নাটক-নভেল পড়িনি, আর চক্ষু কপালে তুলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিরহ-যন্ত্রণা জানাইনে। আজ সবে দেড়মাস হ'ল দাদা বাড়ী থেকে গিয়েছেন, এর মধ্যেই তুমি একেবারে এলিয়ে পড়েছ।

সুলো।. ঠাকুরঝি, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, আমার বড়ই মন খারাপ হয়েছে।

মায়া। না, আমি বুঝ্‌তে পারব কেন? মুহূর্ত্তস্থায়ী বিরহে তোমার প্রাণে অপার যাতনা, আর সারাজীবনব্যাপী বিরহে আমার প্রাণে অমৃতসিঞ্চন করে!

সুলোচনা লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "মাপ কর ঠাকুরঝি! আমার ঘাট হয়েছে।"

মায়া। তা ত হয়েছেই, ও কি ও, পুরুষ মানুষ বাইরে পয়সা উপায় করতে গেছে, কোথায় ঠাকুর-দেবতার কাছে মানসিক

কর্‌বে, তাঁর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক্, তা না ক'রে তাঁর দর্শন-লালসায় আত্মবিস্মৃত হয়ে গৃহধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে বসেছ।

সুলো। সত্যি ঠাকুরঝি, আমার কোন দোষ নেই, আমি যেন কি এক রকম হয়ে গেছি। ঠাকুরঝি, আমার কোন দোষ নেই, তুমি বল্লে না প্রত্যয় যাবে, আমার যেন আর কিছুই ভাল লাগে না। সর্ব্বদাই মনের মধ্যে ভয় হয়, পাছে তাঁর কোন অমঙ্গল ঘটে।

মায়া বিরক্তির সহিত বলিল, "ছি ছি! অমঙ্গল কামনা কি কর্‌তে আছে? ও সব চিন্তা মনের কোণেও স্থান দিও না।"

সুলোচনা বড় কাতর হইয়া বলিলেন, "আমার কি ইচ্ছে, আমি তাঁর অমঙ্গল কামনা করি? ঠাকুরঝি, সত্য বল্‌ছি, আমার মনে হয় যেন, ইহজন্মের মত আমার সুখ চ'লে গেছে; মনে হয়, আর বুঝি আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে না; আমার ইহজন্মের সমস্ত সুখ যেন তিনি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছেন; আর বুঝি, আমি তা ফিরে পাব না। ঠাকুরঝি, আমি নিজের জন্য কাতর নই, ভয় হয়, মন্দভাগিনীর অদৃষ্টদোষে তিনি পাছে কোন কষ্ট পান।"

মায়া। তা স্ত্রীলোকে আবার কোন্ কালে নিজের জন্য কাতর হয়? স্বামীর বিপদেই স্ত্রীর বিপদ্। দেখ বৌ, তুমি রাতদিন একলাটি চুপ ক'রে ব'সে থেক্কো না, তাতে মন আরও খারাপ হয়। ক্রিয়াহীন জীবনে সর্ব্বদাই অশান্তি, সর্ব্বদাই চিন্তা; কিন্তু সর্ব্বদা কাজকর্ম্মে লিপ্ত থাক্‌লে চিন্তা কর্‌বার অবসর হয় না। আজ পাঁচ বৎসর বিধবা হয়েছি, এর ভিতর মন ঠিক রাখ্‌তে সব রকম চেষ্টা ক'রে দেখেছি, কিন্তু শ্রেষ্ঠ উপায় সর্ব্বদা কাজকর্ম্মে লিপ্ত থাকা। তের বৎসর বয়সে আমি বিধবা হয়েছি,

আর এই আমার আঠার বৎসর বয়স। প্রথম আমার স্বামীর প্রেম কত মধুর, কত সুন্দর বোধ হয়েছিল।

অতীতের কথা মনে উদয় হইয়া মায়াকে বড় কাতর করিল। হৃদয়ের আবেগ মনে সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। বসন্তানিল সম্পর্কে মুকুলিত কুসুমকলিকার মত তাঁহার জীবনের সুখের আশাগুলি ফুটিয়া উঠিতেছিল। নিত্য-সহচরী কল্পনা তাঁহাকে একদণ্ড ছাড়িয়া থাকিত না। বিশ্ব-সৌন্দর্য্যে সর্ব্বদা তিনি বিভোর থাকিতেন। তাঁহার দেবতাতুল্য স্বামী, দেবগুণে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। শৈশব-যৌবনের সন্ধিস্থলে তিনি সমস্তই মধুময় দেখিয়াছিলেন, বৃক্ষে মধু, পুষ্পে মধু, সমীরে মধু, সলিলে মধু, তাঁহার হৃদয়ও মধুময় হইয়াছিল। সে সময় নারীর আর কোন চিন্তা থাকে না।

মায়া বলিতে লাগিলেন, "আজ পাঁচ বৎসর তাঁকে হারিয়েছি, তবু ত আমি প্রাণ ধ'রে আছি। প্রথম প্রথম যখন শোকের আগুন চিতার ন্যায় জ্বল্‌ত, আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌তুম না। মনে কর্‌তুম, আত্মহত্যা করি, কিন্তু মা আমায় একদণ্ড কাছছাড়া কর্‌তেন না। মার মুখের দিকে চেয়ে আমার কষ্টের অনেক লাঘব হ'ত। ভাগ্যদোষে অল্পদিনের মধ্যে মাকেও হারালুম।"

সুলোচনা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "বাস্তবিক ঠাকুরঝি, তোমার মত দুঃখী আর কেউ নেই।"

মায়া। যখন মা গেলেন, তখন আমার মনে হ'ল, এই পৃথিবী আমার পক্ষে শূন্যময়। বৌ, মাতৃহারা দুর্ভাগিনীর বৈধব্যযন্ত্রণা শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। তিন চারদিন আমি আর উঠ্‌তে পারিনি। কেবল তোমার যত্নে, তোমার শুশ্রূষায় আমি কথঞ্চিৎ সুস্থ

হলুন। তার পর বাবার কষ্ট দেখে, তাঁর কাতরতায় আবার আমি মনকে দৃঢ় কল্লুম। কি কর্‌লে তিনি একটু সুস্থ হন, কি কর্‌লে তাঁর কষ্টের লাঘব হয়, তখন আমার সেই চিন্তাই প্রবল হ'ল। তার উপায় চিন্তায় আমার নিজের চিন্তা দূর হ'ল। হায়, শেষকালে আমাদের ভাগ্যদোষে বাবাও আমাদের ছেড়ে গেলেন।

মায়ার নেত্র বহিয়া অশ্রু ঝরিল, সমবেদনায় কাতর হইয়া সুলোচনাও চক্ষু মুছিলেন; ননদিনীর সহিষ্ণুতা-গুণের অনেক প্রশংসা করিলেন।

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে মায়া পুনরায় বলিলেন, "বৌ, মানুষ সব সইতে পারে, মানুষের হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। মনের মত কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বামী, স্নেহময় জনক, স্নেহশীলা জননী একে একে সব হারালেম, তবুও ত প্রাণ ধ'রে আছি। মধ্যাহ্নে জঠরানল জ্বলে উঠ্‌লে যেমন ক'রে হোক, সে আগুন নিবুতে হয়। যদি সর্ব্বদা নিজের ভাবনা ভাবি, তা হ'লে আমি পাগল হয়ে যাই। যখনি মনে করি, এ সংসারে আমি কে, আমার সংসার কোথায়, সংসারে আমি কোন্ সুখে সুখী, তখনি মনে হয়, আমি কোথাও ছুটে চ'লে যাই। কিন্তু তার পর দেখি, পিতৃমাতৃহীন ছোট ভাই-বোন আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে, আমি না থাকলে কে তাদের যত্ন কর্‌বে, কে তাদের লালন-পালন কর্‌বে? বৌ, তখন আমার সব কল্পনাই ভেসে যায়। এখন এদের কাজেই আমি সর্ব্বদাই লিপ্ত থাকি। কিসে এরা মানুষ হবে, কি কর্‌লে এরা সুখে থাকবে, সেই চিন্তা ক'রে যদি সময় পাই, তবে ত নিজের ভাবনা ভাব্‌বো। তার পর এতগুলি লোকের প্রতিপালনের ভার এক

দাদার উপর, সংসারে অসচ্ছলতা,বাবা এমন কিছু রেখে যাননি, যাতে সংসার চলে। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করতে করতে আর নিজের কথা মনে হয় না। তুমি ত দেখ্‌তে পাও, আমি একদণ্ড ব'সে থাকিনি। যখনি একটু অবসর পাই, তখনি হয় কাঁথা সেলাই করি, না হয় একটু রামায়ণ কি মহাভারত পড়ি।"

সুলো। তোমার সহিষ্ণুতা-গুণের তুলনা নাই।

মায়া। অমন কথা মুখেও এনো না। ভগবান্ কি আমাকে আলাদা ছাঁচে গড়েছেন? বৌ, যত ভাব্‌বে, ভাবনা ততই বেড়ে যাবে। ভাবনার কি কেউ কূল-কিনারা পেয়েছে? এমন কত লোক সংসারে আছে, যারা আমার তোমার চেয়ে অনেক রকমে দুঃখী, যারা আমাদের অদৃষ্টকেও হিংসা করে। সকলেই যদি সংসারে সুখভোগ করবে, তবে সুখ-দুঃখ সৃষ্ট হয়েছে কেন? সকল রমণীই কি স্বামি-পুত্রে শোভিতা? ফুল সর্ব্বত্রই ফোটে, কিন্তু অরণ্য-কুসুমের কে আদর করে? নির্জ্জনকাননে ফুলের শোভা দেখ্‌তে কয়জন ছুটে যায়? অনাঘ্রাত কুসুম আপনিই শুকিয়ে যায়, এ পৃথিবীতে তার চিহ্নমাত্রও থাকে না।

এমন সময়ে কনিষ্ঠভ্রাতা সতীশচন্দ্র হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিল। তাহার হস্তে দুইখানি পত্র। দুইখানিই সুরেশ বাবুর প্রেরিত, একখানি ভগিনী মায়ার নামে, অপরখানি সুলোচনার নামে।

সুরেশ বাবুর রওনা হইবার পর এই তাঁহার দ্বিতীয় পত্র। বাটীর সকলেই উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার পত্রের অপেক্ষায় ছিলেন। মায়া তাড়াতাড়ি পত্র খুলিয়া পড়িলেন, যাহা পড়িলেন, তাহাতে তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল।

অমঙ্গল আশঙ্কায় সুলোচনার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল। কণ্ঠাগতপ্রাণা হইয়া তিনি ননদিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরঝি, কি লিখেছেন? তিনি ত ভাল আছেন?"

সুলোচনার নামীয় পত্রখানি মায়া তাঁহার হাতে দিলেন; তাঁহাকে বলিলেন, "এখানি তোমার নামে—পড়িয়া দেখ। তিনি ভাল আছেন, তবে সংবাদ তত সুখের নয়। শোনো কি লিখেছেন"—

'মায়া, যদি ৫।৭ দিনের মধ্যে আমাকে যেমন করিয়া হউক ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা পাঠাইতে পার, তবে যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছি, তাহা সফল হয়। আমি শারীরিক ভাল আছি। তোমরা কেমন আছ সংবাদ দিও।"

সুলো। তাই ত ঠাকুরঝি, টাকা চেয়েছেন কেন? কোন রকম বিপদে পড়েননি ত? পত্রে ত কিছুই খুলে লেখেননি।

মায়া। তাই ত, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। তোমার পত্রেও ত এ সম্বন্ধে কিছু লেখেন নি?

সুলোচনার পত্রে টাকার সম্বন্ধে কোন কথাই লেখা ছিল না। কেবল তাঁহার অদর্শনজনিত দুঃখের কথায় পত্রের দুই পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ।

সুলো। না ঠাকুরঝি, এ চিঠিতে টাকার কথার কোন উল্লেখ নাই। আমি ভাব্‌ছি, পাঁচ শত টাকা যোগাড় হবে কোথা থেকে?

মায়া। টাকার যোগাড় এখনই হবে। তবে টাকা কি জন্য চেয়েছেন, তা ত বোঝা যাচ্চে না।

সুলো। তোমার কাছে কি টাকা আছে ঠাকুরঝি?

মায়া। টাকা কেষ্টা কামারের কাছে পাইতে পারিব।

স্থলো। তবে তুমি আগে টাকা পাঠাও। হয় ত কোন বিপদে পড়েছেন. নইলে চাকরী কর্‌তে গিয়ে টাকার দরকার কেন হবে ?

মায়া। আমার বোধ হয়. কাউকে ঘুষ দিতে হবে।

স্থলো। তা হলেই ভাল।

মায়া। ভাল নয় বৌ। যার অধীনে চাকরী কর্‌বেন, সে যদি এরূপ নীচ-প্রকৃতির লোক হয়, তবে দাদার চাকরী ক'রে সুখ হবে না।

স্থলো। সে পরের কথা পরে হবে। এখন ত তিনি দুর্ভাবনা থেকে রক্ষা পাবেন।

মায়া। কালই টাকা পাঠাইব। সকালে তোমার গহনাগুলো বা'র করে দিও ; তোমার আমার গহনা এক সঙ্গে রাখ্‌লে পাঁচ শত টাকা বেশ পাওয়া যাবে।

আহারান্তে সুলোচনা গৃহে গিয়া স্বামীর পত্রখানি ভাল করিয়া পড়িলেন। যত পড়েন. কিছুতেই তাঁহার তৃপ্তি হয় না।

কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপনতঃ সঙ্গমাৎ কিঞ্চিদূনঃ।

এখনকার দিনে অনেক কুলনারী স্বামীর দুই ছত্র লিপি বক্ষে রাখিয়া বিরহ-যন্ত্রণা লাঘব করে। ডাক-পিয়নের মস্তকে অনেক কুলনারীর আশীর্ব্বাদ নিত্য বর্ষিত হয়

অনেক রাত্রি জাগিয়া সুলোচনা স্বামীকে পত্র লিখিলেন। স্বামীর শুভসংবাদে নারীর অনেক সান্ত্বনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শুভদিন দেখিয়া সদানন্দ সুখদাকে সঙ্গে লইয়া নৌকারোহণে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শান্তিপুরের অনতিদূরে একখানি গণ্ডগ্রামে তাঁহার পিতা বাস করিতেন। সেখানে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র-প্রদত্ত তাঁহাদের কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল। জ্ঞাতির সহিত বিভক্ত সম্পত্তির আয় অতি সামান্য ছিল। কায়ক্লেশে যজমান-বৃত্তি অবলম্বনে সদানন্দের পিতা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বৎসরান্তে সদানন্দ একবারমাত্র দেশে যাইয়া জমীর খাজনা আদায় করিতেন; পিতৃ-পিতামহের ক্ষুদ্র কুটীরের সংস্কার করিয়া শ্বশুরালয়ে ফিরিতেন। গত বৎসর যখন দেশে গিয়াছিলেন, সেই সময় পল্লীস্থ দুই চারিজন বর্দ্ধিষ্ঠ আত্মীয়-বান্ধব তাঁহাকে দেশে আসিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। তাঁহারা তাঁহাকে অসময়ে সময়ে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। সেই সময় সদানন্দের মনে কেমন ধারণা জন্মিল, তাঁহার পিতৃপুরুষগণের বাসস্থান রহিয়াছে, সেখানে সন্ধ্যায় প্রদীপ পড়ে না, দেবার্চ্চনা কিছুমাত্র হয় না, আর তিনি পরম নিশ্চিন্ত-মনে শ্বশুরালয়ে দাম্পত্য-সুখভোগ করিতেছেন। কেবল অনুগত ভার্য্যা সুখদার অসন্তোষের ভয়ে এত দিনে সুযোগ পান নাই, তাই আসিতেও পারেন নাই।

পুণ্য বৈশাখের রমণীয় দিনান্তে তাঁহারা ভাগীরথী-গর্ভে নৌকারহণ করিলেন। আসিবার সময় সুখদার নেত্র বাহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিল; স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহা

মুছিয়া ফেলিলেন। তাঁহার দক্ষিণ-চক্ষু স্পন্দিত হইল, স্বামীর চরণপ্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মনে হইল, যদি তাঁহার সহোদর থাকিত, তাহা হইলে পৈতৃক বাসস্থান নিষ্প্রদীপ হইত না।

কিছু দূর পর্য্যন্ত তাঁহারা বড় সুখে যাইলেন। সদানন্দের আনন্দস্রোত যেন দ্বিগুণ প্রবাহিত হইল,যেন বহুদিনপরে পিঞ্জরা-বদ্ধ বিহঙ্গম স্বাধীনতা পাইয়াছে। বিমোহিত-চিত্তে তিনি চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন, শ্বেত, পীত, নীল বিবিধ বর্ণে চিত্রিত অনন্ত আকাশ। নিদাঘের দিনান্ত-শোভা বড় মনোরম। প্রাণা-রাম মধুর সৌন্দর্য্যে তিনি মুগ্ধ হইলেন। গঙ্গা-সলিল মৃদু-বায়ু-সঞ্চালনে কাঁপিতেছে, নাচিতেছে। তীরে বৃক্ষশিরে রবিকরচ্ছটা প্রতিফলিত।

সেই মধুমাসে মধুময়ী প্রকৃতির ক্রোড়ে বসিয়া ভাগীরথী-গর্ভ প্রতিধ্বনিত করিয়া সদানন্দ গান ধরিলেন।

"কি হবে মা দাও না ব'লে। (আমার)
কেমন ক'রে চল্‌তে হয় মা, জানে না তোর পাগ্‌লা ছেলে।
ভবের হাটে দোকান পেতে,
ব'সে আছি মা দিনে রেতে,
আমার ভুষি মালের হয় না আদর, যেচে দিলেও নেয় না তুলে॥
আমি খেটে খেটে হই মা সারা,
মজুরী তার পাই না তারা,
আমার এমন ক'রে দিন চলে কি ক্ষুধায় অন্ন নাই মা মিলে॥"

বিভোর হইয়া সুখদা স্বামীর মধুর-কণ্ঠের মধুর আলাপ শুনিতে লাগিলেন। গান থামিলে তিনি আদরমাখা স্বরে

তাঁহাকে বলিলেন, "যার উপর রাগ ক'রে যাকে অন্যায় কথা বল্‌ছ।"

সদানন্দ আপন মনে আবার গান ধরিলেন—

"কত দিন আর ভাস্‌বো তারা এ দুঃখ-জলধি-জলে।
নয়নে বারি ঝরিবে মনাগুনে মর্‌বো জ্ব'লে॥
দয়াময়ী নামে তোমার, কলঙ্ক পড়িবে এবার,
চরণে ধরি মা তোমার, আমার মনের কালি মুছ্‌বে ব'লে॥"

সেই সুস্বরলহরী চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইল। সেই উন্মাদকারী সঙ্গীতে সুখদা আত্মবিস্মৃতা হইলেন। স্বামীর অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর সুখদার শ্রবণ ভেদ করিয়া যেন মর্ম্মে গিয়া স্পর্শ করিল। পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া অবধি তিনি একটু বিমর্ষ ছিলেন; এতক্ষণে যেন তাঁহার সমস্ত প্রাণ জাগিয়া উঠিল; স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার কি মধুর কণ্ঠস্বর! আমার ইচ্ছে হয়, আমি রাত-দিন ব'সে তোমার গান শুনি।"

সদা। রাত-দিনই ত শুন্‌ছ; তবুও কি তোমার তৃপ্তি হয় না?

সুখদা। না, যত শুনি, ততই শুন্‌তে ইচ্ছে হয়।

সদা। তবে শোনো।

"শুন রজক-নন্দিনী রাণী!
ও চরণ ধ্যান করিব বলিয়া পাগল হইনু আমি॥"

আত্মবিস্মৃত হইয়া সদানন্দ সুখদার চরণ ধরিতে গেলেন। সুখদা ভারী রাগ করিলেন; গ্রীবা বাঁকাইয়া স্বামীকে তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ফের যদি ও রকম কর, তবে আমি এই গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিব।"

হঠাৎ সদানন্দের প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার নির্ভয় অন্তরেও ভয়সঞ্চার হইল; স্ত্রীকে বলিলেন, "এমন কথা আর বলো না।"

সুখদা। কেন, ধর, আমি যদি মরি, তা হ'লে তোমার আর ক্ষতি কি? আমার মত কত শত দাসী তোমার পদতলে গড়াগড়ি যাবে।

সদা। ফের ঐ কথা? তা হ'লে আমি বুঝ্‌ব, তুমি আমায় ভালবাস না। আমার ধারণা, স্ত্রীলোক স্বামী ত্যাগ ক'রে স্বর্গে গিয়েও সুখী হয় না।

সুখদা। তোমাকে ত্যাগ ক'রে থাক্‌তে হ'লে আমাকে নরকযাতনা ভোগ কর্‌তে হবে, তা সে স্বর্গেই যাই আর যেখানেই যাই। কিন্তু কে জানে, অদৃষ্টে কি আছে?

সদানন্দ স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "অদৃষ্টে আবার কি হবে? কার কি করেছি যে, আমার মন্দ হবে? আমার স্থির-বিশ্বাস, আমি জীবনে কখন কষ্ট পাব না।"

সুখদা। আমিও ভগবানের নিকট কামনা করি যেন, সারাজীবন তোমার চরণপূজা কর্‌তে পাই। আমি স্বর্গ চাহি না, আমার স্বর্গ তুমি। আমার ধর্ম্ম, পুণ্য, সুখ, শান্তি সব তুমি।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। সুবর্ণে রঞ্জিত লাল অনন্ত আকাশ, তার মাঝে সুবর্ণ-গোলক। অস্তগামী ভাস্করের সোনার কিরণ মেখে সোনামুখী সন্ধ্যা প্রকৃতির শ্যামক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। আলো ও আঁধারের মাঝে বসুধার চারুচিত্র কত সুন্দর! সেই মনোমোহন সৌন্দর্য্যে স্বামি-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের কণ্ঠলগ্ন; সুখ-মদিরায় বিভোর—উন্মাদ। সুখদার স্বপ্নোজ্জ্বল

মাধুরীতে সদানন্দের সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ, আনন্দ-কিরণ যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে প্রতিফলিত। আনন্দের ধারা যেন তাঁহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত।

সুখমদিরায় বিভোর হইয়া সুখদার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। কণ্টকিত-কলেবরে তিনি স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন; মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "জীবনে মরণে আমি তোমার দাসী; তোমার পদপ্রান্তে ছায়ামাত্র; তোমায় নিয়ে বনে গিয়েও সুখী গাছতলাতেও সুখী, আর অট্টালিকাতেও সুখী।"

যখন তাঁহারা এইরূপ সুখে নিমগ্ন হইয়া ধরায় স্বর্গের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছিলেন, সেই সময় নৌকার বাহিরে নাবিকগণ উচ্চকণ্ঠে পাঁচপীরের গান ধরিল; সেই শব্দে তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিল। সদানন্দ বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, নয়নাঞ্জন-সন্নিভ নবঘনে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন। নিদাঘের দিনান্তে ঝটিকা ও বৃষ্টিপাতের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তখন নৌকা কিনারায় লাগাইতে মাঝাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন।

কিছু দুর যাইয়া মাঝীরা আর নৌকার মুখ ফিরাইতে পারিল না। তখন প্রবলবেগে ঝটিকা আরম্ভ হইয়াছে। নদীর মধ্যস্থল অপেক্ষা তীরের নিকট স্রোতের গতি অত্যন্ত অধিক। জলরাশি উত্তরোত্তর স্ফীত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র তরণী জল-তরঙ্গে নাচিতে লাগিল। সদানন্দ বাহিরে বসিয়া আকুলনেত্রে চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন, যেন অকূলসমুদ্রে ক্ষুদ্র তরণী ভেলার মত ভাসিতেছে। নিবিড় তমসাচ্ছন্ন পৃথিবী যেন রসাতলে যাইতেছে। উর্দ্ধনেত্রে আকাশের পানে চাহিলেন, মরণের

কালো ছায়া চারিদিকে ঘেরিয়া আছে। সেই বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারে তাঁহার মনের আলো নির্ব্বাপিত হইল। তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারাইলেন। সুখদাও তখন নৌকার বাহিরে আসিয়া স্বামীর পদতলে বাণবিদ্ধা কুরঙ্গীর মত বসিয়া পড়িলেন; মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন—"হে ভগবান্, আমার স্বামীকে বাঁচাও!"

আর ত রক্ষা হয় না। নৌকার উপর জল উঠিতে লাগিল। নাবিকেরা নৌকা রক্ষা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। সদানন্দ সুখদার হাত ধরিলেন, কাতরকণ্ঠে তাহাকে কহিলেন, "সুখদা, আর ত রক্ষার উপায় দেখিতেছি না। আজ এই জাহ্নবী-গর্ভেই আমাদের জীবনের খেলাধেলা সাঙ্গ হয় দেখিতেছি। এইটুকু সুখ, তোমায় আমায় একসঙ্গে মরিতে পারিব।"

নৌকার উপর অনবরত জল উঠিতে লাগিল। মাঝীরাও শীঘ্র-হস্তে জল ছেঁচিতে লাগিল। কিন্তু একটা প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে নৌকার তলদেশে ছিদ্র হইয়া গেল। আর বিন্দুমাত্রও আশা নাই। সদানন্দ সুখদার হাত ধরিয়া গঙ্গা-তরঙ্গে ঝাঁপ দিলেন। সন্তরণে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, বহুকষ্টে সেই তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া, প্রিয়তমার হাত ধরিয়া তিনি কূলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তীরের নিকটে উপস্থিতপ্রায় হইয়াছেন, কিন্তু বিধি-লিপি কার সাধ্য খণ্ডন করে, সে স্থানে জলস্রোত অত্যন্ত প্রবল, তাঁহার হস্তভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়বস্তু নদী-তরঙ্গে ভাসিয়া গেল। সহস্র চেষ্টা করিয়াও সদানন্দ আর তাঁহাকে ধরিতে পারিলেন না। স্রোতের মুখে দেখিতে দেখিতে তাঁহার জীবনের সাররত্ন বিসর্জ্জিত হইল।

হায় সদানন্দ! নিয়তির লীলা কে বুঝিতে পারে? এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে প্রকৃতির মনোমোহন সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি পৃথিবীকে স্বর্গের সহিত তুলনা করিতেছিলেন. ইহার মধ্যেই তাঁহার ভাগ্যের কত পরিবর্ত্তন হইল! কে বলিতে পারে, মনুষ্যের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিতে কতক্ষণ সময় লাগে!

সেই গভীর দুর্ভেদ্য অন্ধকারের আবরণে অঙ্গ ঢাকিয়া আর্দ্র-বস্ত্রে সদানন্দ কাঁপিতে লাগিলেন। গঙ্গাসলিল-সম্পৃক্ত সমীরণ প্রবলবেগে বহিতেছিল। তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, মহাপ্লাবনের পর যেন ধরণী প্রগাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। সমস্ত জগৎ স্থির, শব্দলেশশূন্য; কেবল ঝিল্লীমন্দ্রে আর নববারিপাতে ভেক-কুলরবে নদীতীর ধ্বনিত হইতেছিল।

সদানন্দ মনে ভাবিলেন, তাঁহার কি সর্ব্বনাশই হইল! কে জানিত, একসূত্রে গ্রথিত দুটি জীবনের একটি অকালে কালগর্ভে ঝরিয়া পড়িবে, আর একটি সংসারে থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে? কে জানিত, তাঁহার জীর্ণ-হৃদয়ের আনন্দ-প্রতিমা জাহ্নবীগর্ভে বিসর্জ্জিত হইবে? সেই গভীর তামসী নিশিতে সেই অতলস্পর্শী নদীগর্ভে প্রকৃতির সেই ভয়াবহ স্থানে তাঁহার নয়নের আলোক চিরদিনের মত নির্ব্বাপিত হইবে? সহস্র দিক্ হইতে যেন সহস্র বিষধর ভুজঙ্গ তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইলে আর ত কেহ তাঁহাকে আপনার বলিয়া ভাবিবে না! তাঁহার ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া কেহ ত প্রাণে ব্যথা পাইবে না! মর্ম্মে তাঁহার আগুন জ্বলিতে লাগিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি ভগবানের নামে সহস্র অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। এ তাঁহার কোন্ পাপের শাস্তি? জ্ঞানকৃত

কখনও কোন অন্যায় কার্য্য করেন নাই যে, ঈশ্বর তাঁহাকে এই শাস্তি দিলেন। চিরদিনইত ভগবানের আরাধনায় নিযুক্তছিলেন, তবে কেন তাঁহার প্রতি এই বিষম অত্যাচার? সদানন্দ মনে করিলেন, পরহিতে উৎসর্গীকৃত তাঁহার জীবনের কি এই বিষময় পরীক্ষা কিংবা ধর্ম্ম মিথ্যা,ভগবান্ মিথ্যা, এ সংসারে পাপপুণ্যের বিচার নাই?

বজ্রগম্ভীরস্বরে সেই নিস্তব্ধ নদীতীর কম্পিত করিয়া যেন দৈববাণী হইল, 'ধর্ম্ম মিথ্যা, ভগবান্ মিথ্যা, এ কথা বলে কে?'

বহুদুর-শ্রুত প্রতিধ্বনি তাঁহার কর্ণে গিয়া তাঁহাকে চমকিত করিল। সেই মুহূর্ত্তে একবার বিদ্যুৎ চমকিত হইল; সেই আলোকে তিনি দেখিতে পাইলেন,জ্ঞানজ্যোতি পরিপূরিত দেব-সদৃশ এক মহাপুরুষ। তাঁহার দক্ষিণ-হস্তে দণ্ড ও বাম-হস্তে কমণ্ডলু। জ্ঞানালোকচ্ছটা যেন তাঁহার সমস্ত শরীর হইতে নির্গত হইতেছে।

হর্ষে ও বিস্ময়ে সদানন্দের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল। জানু পাতিয়া গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি তাঁহাকে কহিলেন, "প্রভু! রক্ষা করুন,আত্মহারা হইয়া আমি বিবেক-শূন্য—শোকে চৈতন্য-রহিত হয়েছি।"

রোষ-কম্পিত-কণ্ঠে সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "ধর্ম্ম মিথ্যা, ভগবান্ মিথ্যা, এ কথা বলে কে? নিত্য শাশ্বত পুরুষ তিনি। যিনি সর্ব্বজীবে সমভাবে সকল সময়ে অবস্থান কচ্ছেন, একেবারে তাঁর অস্তিত্ব-লোপ? কর্ত্তব্য কার্য্য ক'রে এত আত্মপ্রশংসা কেন? পরহিতে উৎসর্গীকৃত জীবনের উদ্দেশ্য কি আপনার সুখের জন্য লালায়িত হওয়া?"

কম্পিতকণ্ঠে সদানন্দ উত্তর করিলেন, "দয়াময়, ক্ষমা করুন, নিদারুণ শোকে জ্ঞানশূন্য হয়েছি। কিন্তু প্রভু—"

সন্ন্যাসী। কিন্তু কি? তোমার নিজকর্ম্মফলে তুমি যাতনা পাচ্ছ।

সদানন্দের সাহস বাড়িল। দৃঢ়স্বরে তিনি বলিলেন, "মনে পড়ে না ত প্রভু, ইহজীবনে কখন কোন পাপকর্ম্ম করেছি কি না?"

সন্ন্যাসী। ইহ-জন্মে না হয় পূর্ব্বজন্মে করেছ। সকল স্থলেই কি ইহ-জন্মের পাপের শাস্তি ইহ জন্মে ফলে?"—তাহার পর সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহাকে অতি মিষ্ট-কথায় বলিলেন, "বৎস! এই-টুকু মনে রেখো, ধর্ম্মপথে অনেক বিঘ্ন, কিন্তু ধর্ম্মকে রাখিলে ধর্ম্ম তাহাকে রাখেন।"

সন্ন্যাসীর এই কথায় সদানন্দের নির্জ্জীব প্রাণে বলসঞ্চার হইল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ঈশ্বর সাক্ষী, ঈশ্বরের প্রতিনিধির মুখ থেকে এই কথা বেরিয়েছে। প্রভু, দয়াময়, সর্ব্বস্ব উৎসর্গ কর্‌ব, চিরদিন দাসত্ব কর্‌ব, আমায় কর্ম্মক্ষেত্রে নিযুক্ত করুন। বলুন্ প্রভু, আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে?"

সন্ন্যাসী। ঈশ্বরের আদেশই সংসারের কর্ত্তব্য পালন করা। আজ আত্মহারা হয়ে যে জীবন নষ্ট কর্‌তে ইচ্ছা করেছিলে, কিছু দিন পরে দেখ্‌তে পাবে, সেই জীবনে সংসারের কত কাজই কর্‌তে পার্‌বে।

বড় কাতর হইয়া সদানন্দ সন্ন্যাসীর এই কথায় উত্তর দিলেন, "কাকে নিয়ে সংসার কর্‌ব প্রভু? সংসারে আর আমার কে আছে?"

প্রীতিমাখা কণ্ঠে সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহাকে কহিলেন, "বৎস! কাতর হয়ো না। সংসার ত তোমার আছে। সংসারকে নিয়েই সংসার কর। কেবল আপনার স্ত্রী-পুত্র নিয়েই সংসার হয় না। সংসারের সমস্ত প্রাণীই আপনার। সংসার অতি বিস্তীর্ণ কর্ম্ম-ক্ষেত্র। তোমার চক্ষের সম্মুখে এমন অনেক প্রাণী দেখ্‌তে পাবে, যাকে অবলম্বন ক'রে তুমি আবার সংসার কর্‌তে পার্‌বে। জীবের অভাব-মোচনই সংসারের প্রধান কর্ত্তব্য। আর পরই বা কে, যাকে তুমি আপনার কর্‌বে, সেই তোমার আপনার হবে। ভালবাসা অতি কোমল, অতি কঠিন হৃদয়ও ভালবাসায় গ'লে যায়।

সদা। কিন্তু প্রভু, আমার ত কিছুই নাই।

সন্ন্যাসী। বেশ, তোমার ত দেহ আছে। সংসারের কার্য্যে তোমার দেহকে নিযুক্ত কর। সকলেরই কি অর্থ থাকে? বৎস, মনে ভেবে দেখ দেখি, পথভ্রষ্ট একজন অন্ধকে পথ-প্রদর্শন করা কি ধর্ম্মাচরণ নয়? একজন অসহায় ব্যাধিক্লিষ্টের শুশ্রূষা করা কি পুণ্য-কার্য্য নয়? যদি তোমার মন তোমার আয়ত্তাধীন হয়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যদি পরোপকারে নিযুক্ত হও, তোমার অর্থের অনাটন কোন কালেই হবে না।

সদানন্দ করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু, স্বার্থপরায়ণ এ অধম পুরস্কার-প্রত্যাশী, আমার পুণ্য-আশা নাই।

সন্ন্যাসী। স্বার্থপরায়ণ নয় কে বৎস? আবার ভেবে দেখ, স্বার্থ কিছুই নাই। লোকে মনে করে, স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণার্থে ধন উপার্জ্জন করাই স্বার্থ-পালন। কিন্তু ভাল ক'রে ভেবে দেখ বৎস, স্ত্রীপুত্রই বা কে? এই ক্ষণভঙ্গুর দেহধ্বংস হ'লে কেউ

কারও নয়। অসহায় এবং অকর্ম্মণ্যকেই সাহায্য করা ধর্ম্মাচরণ। সদ্যপ্রসূত শিশু সম্পূর্ণ অসহায়, তাকে লালন-পালন করা কি ধর্ম্মাচরণ নয়? আবার দুর্ব্বল অক্ষম বৃদ্ধের অভাবমোচন করা কি তার উপায়ক্ষম পুত্রের কর্ত্তব্য কার্য্য নয়? বৎস! স্বার্থেই ধর্ম্ম আর এই পৃথিবীর সকলেই স্বার্থে নিযুক্ত। তবে স্বার্থসাধন হেতু অসদুপায় অবলম্বন করাই অধর্ম্ম। আপনার সুখ খুঁজ্‌তে পরের মনে কষ্ট দিলেই পাপ হয়। তোমার গৃহে আবদ্ধ প্রেম সর্ব্বভূতে সঞ্চার কর, দেখ্‌তে পাবে জগৎ-সংসার সমস্ত তোমারই। তখন বুঝ্‌তে পার্‌বে সমস্ত সংসারের লোক তোমার জন্য কাতর হবে। আরও, আপনার জীবন যেমন প্রিয়, পরের জীবনও সেইরূপ প্রিয়, অতএব আপনার প্রাণ যেরূপ দেখ, পরের প্রাণও সেইরূপ দেখিবে। তুমি তোমার প্রিয়বস্তুর অদর্শনে কাতর হয়েছ, কিন্তু সে কাতরতা তোমার মনের ভ্রম। দেখ, পর্ব্বতে ময়ূর আর গগনে পয়োধর, লক্ষযোজন অন্তরে সূর্য্য আর সরোবরে পদ্ম, দুই লক্ষ যোজন অন্তরে শশধর আর কুমুদিনী সলিলে অবস্থিতি করে,তাহাতেও তাহাদের প্রীতি প্রকাশ পায়।

সদানন্দের নিমীলিত আঁখি যেন জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় উন্মীলিত হইল। ঐশ্বরিক শক্তিসঞ্চারে তাঁহার সমস্ত প্রাণ জাগিয়া উঠিল। প্রেমে—ভক্তিতে তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ হইল। সেই দেবতুল্য সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তিনি বলিলেন, "প্রভু, এ অধম আপনার সঙ্গ অভিলাষ করে।"

সন্ন্যাসী। উপযুক্ত সময়ে আমি নিজেই উপস্থিত হব।

সদা। যদি কখনও আপনার উপস্থিতির একান্ত প্রয়োজন হয়?

সন্ন্যাসী। সেরূপ সময়ে আমার সাক্ষাৎ পাবে।

চক্ষের নিমিষে সন্ন্যাসী ঠাকুর অন্তর্হিত হইলেন। স্তম্ভিত হইয়া সদানন্দ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন মেঘ-নির্ম্মুক্ত চন্দ্রমা অনন্ত শূন্যে বিরাজ করিতেছেন। স্তব্ধ যামিনীর স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ম্লানমুখী প্রকৃতি দুঃখাতে যেন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়াছে, লাবণ্য-হিল্লোলে যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে!

অনেকক্ষণ পরে সদানন্দের ধারণাশক্তি ফিরিয়া আসিল। এত দিন পরে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল! তাঁহার মনের মধ্যে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রিয়তমার মোহিনীমূর্ত্তি তাঁহার অন্তরে স্পষ্ট প্রতিফলিত, দূরাগত বীণার ন্যায় তাঁহার স্বর-লহরী তখনও তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল। তাঁহার স্মৃতির সে দীপ্তজ্বালা নাই, তাহার স্নিগ্ধতায় তাঁহার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ।

সদানন্দ চিন্তা করিলেন, কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন? উপস্থিত এখন কোথায় যাইবেন? সন্ন্যাসী ত কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের উল্লেখ করেন নাই। তিনি আপন মনে স্থির করিলেন, পরিব্রাজকবেশে তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিবেন, আর চক্ষের সম্মুখে যাহার অভাব দেখিবেন, সাধ্যমত তাহাকেই সাহায্য করিবেন। স্থির করিলেন, ইহা ধর্ম্ম, ইহা সংসারের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জমিদার বাড়ীতে ভারী হুলস্থুল। চাকর-চাকরাণী দরোয়ান-বেহারা, আমলা-গোমস্তা সকলেই ব্যস্ত। জমিদার সীতানাথ বাবু বিষণ্ণ-মুখে বাহিরে বসিয়া আছেন। নিধু বেহারা তামাক দিয়া গিয়াছে, সে তামাক পুড়িয়া গেল, অথচ খেয়াল নাই। কাহারও মনে সুখ নাই। মনোরমার বড় অসুখ।

ডাক্তার সুরেশবাবু হামেহাল হাজির আছেন,—কখন অন্দর-মহলে তলব পড়ে। যোগমায়া কয়দিন নিস্তব্ধ আছেন, তাঁহার আদরের মনোরমার বড় অসুখ। চাকর-চাকরাণীরাও এ কয়দিন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতেছে, পিসীমার বকুনি নাই। তিনি প্রায় সর্ব্বক্ষণ মনোরমার নিকট বসিয়া আছেন।

আজ জ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত অধিক। মনোরমা শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। ভয়ে পিসীমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি মনোরমার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন, তাহাকে বাতাস করিতেছেন, তবুও মনোরমা স্থির হইতে পারিতেছে না।

পিসীমা নিতান্ত কাতরস্বরে মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনি! বড় কি মাথা কামড়াচ্ছে?"

মনোরমা ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর করিল, "বড় মাথা কামড়াচ্ছে! মাথা যেন ছিঁড়ে পড়ছে। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে পিসীমা!"

যোগমায়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। কি করিলে তাঁহার আদরের মনোরমার অসুখ সারে? এমন কি কোন ডাক্তার

নাই যে, তৎক্ষণাৎ তাহার অসুখ আরোগ্য করিয়া দেয়? তাঁহার ডাক্তারের উপর ভারী রাগ হইল। এখনও কেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ভাল করিতে পারে নাই? রাগ করিয়া তখন তিনি চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "ও সুখি, সুখি! পোড়ারমুখী সুখী কখন্ গেছে, এখনও পোড়ারমুখীর দেখা নাই।"

যাতনায় বিকৃত-মুখে মনোরমা বলিল, "পিসীমা, মাথা যে তুল্‌তে পার্‌চ্ছিনে, মাথা যে গেল।"

পিসীমার চক্ষু ছল ছল করিল। কাঁদ-কাঁদ হইয়া তিনি বলিলেন, "আহা, বাছা! আবার কেন তোমার অসুখ হ'ল?"

মনো। পিসীমা, বড় তেষ্টা পাচ্ছে, একটু জল দাও না।

যোগ। একশবার জল খাচ্ছো মা?

মনো। তা হোক্, তুমি আর একটু জল দাও। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

যোগমায়া একটুখানি জল দিলেন। মনোরমা জল পান করিয়া তৃপ্তির সহিত বলিল, "আঃ! প্রাণটা আমার ঠাণ্ডা হ'ল। কিন্তু আমার মাথার বড় যন্ত্রণা।"

পিসীমাতা তাহার মাথা টিপিয়া দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু কি শোয়াস্তি বোধ হচ্ছে?"

মনো। একটু শোয়াস্তি হচ্ছে। পিসীমা—

যোগ। কেন মা?

মনোরমা পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়া আদরমাখা স্বরে বলিল, "আমি আর বাঁচ্‌ব না।"

পিসীমা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন,—"বালাই, ষাট, বালাই, ষাট, অমন কথা কি বল্‌তে আছে? তোমার যা সব অন্যায়।"

মনো। আমার বড় যাতনা হচ্ছে, বড় যাতনা।

যোগ। এই ডাক্তার বাবু এলেই সেরে যাবে।

মনো। সার্‌বে ত?

যোগমায়া বড়ই কাতরভাবে বলিলেন, "কেন মা, ও সব অমঙ্গলের কথা বল্‌ছো? তুমি আমার শিবরাত্রের সল্‌তে।"

মনো। ডাক্তার বাবু কখন্ আস্‌বেন?

যোগ। এই এলেন বলে। অনেকক্ষণ ত ডাক্‌তে লোক গেছে।

মনো। সুখীকে ডাক্‌ছিলে, কৈ, সুখী ত এলো না?

যোগ। সুখীকে কি তোমার দরকার মা?

মনো। আমার এই হাতপাগুলো একটু টিপে দিত।

যোগ। আমি টিপে দেব?

মনো। তুমি ত মাথা টিপ্‌ছ, আবার হাতপা টিপ্‌বে কেমন ক'রে?

যোগ। সুখী এই এল ব'লে, তুমি একটু স্থির হয়ে শোও।

মনো। স্থির হ'তে যে পাচ্ছিনে পিসীমা?

যোগ। কি কর্‌ব মা, অসুখ সেরে গেলে সব ভাল হবে।

মনো। কবে সার্‌বে?

যোগ। শীগ্‌গিরই সেরে যাবে।

এমন সময়ে সুখী ঝি গৃহে ফিরিল। তাহাকে একাকিনী আসিতে দেখিয়া পিসীমাতা রাগিয়া বলিলেন, "তুই যে একা এলি? ডাক্তার বাবু কোথায়?"

সুখী। বেশ ত, ডাক্তার বাবুর খবর আমি জান্‌ব কি ক'রে? আমাকে বল্লে, রান্না-ঘরে বামুন-ঠাকুরুণকে দুধ গরম ক'রে আন্‌তে বল্‌।

যোগ। তাই ত। আমার ছাই মনের ঠিক নেই। তা দুধ গরম ক'রে আন্‌লি?

সুখী। আন্‌ছে।

এমন সময়ে বামা ঝি গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া পিসীমাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ রে, ডাক্তার এলো না? তুই ত ডাক্‌তে গেছিলি?"

বামা। তিনি একবার ডাক্তারখানায় গেলেন।

যোগমায়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন, "অ্যাঁ! ডাক্তার-খানায় গেল? সে কি, আমার মেয়ের এই অসুখ, তাকে আগে না দেখে, ডাক্তারখানায় গেল?

বামা। বল্লে, "একটা নূতন ঔষধ আন্‌তে হবে।" আমি বল্লুম, 'দিদিমণির ভারী মাথা কাম্‌ড়াচ্ছে তৃষ্ণা পাচ্ছে,' তাই শুনে ডাক্তারখানায় গেল।

যোগ। আর বাবু কোথায়?

সুখী। বাবুও ডাক্তার বাবুকে নিয়ে আস্‌ছেন। তিনি এখন বৈঠকখানায় ব'সে আছেন।

যোগ। সাঁতের এ বড় অন্যায়। মেয়েটার এমন অসুখ, কোথায় এইখানে ব'সে থাক্‌বে, তা না ক'রে বৈঠকখানায় রাতদিন আড় হয়ে প'ড়ে থাক্‌বে?

মনো। সত্যি পিসীমা, বাবা আর আমার এখানে আস্‌তে ভালবাসেন না।

যোগ। ভালবাসবার কি যো আছে? যে আবাগীর ডাইনীকে ঘরে এনেছে, সে কি ভালবাস্‌তে দেয়? আবাগীর রূপ ত কাল-পেঁচার মত, ঐ রূপের ঠ্যাকারেই মরেন। অমন সোনার লক্ষ্মীর জায়গায় কি না একটা কালপেঁচা এসে আধিপত্য কচ্ছে!

পিসীমাতার কথা শুনিয়া সুখী মনে মনে বলিল, "বড়মানুষের বাড়ীর খুরে খুরে দণ্ডবৎ। বউমা স্বর্গে গেছেন, কিন্তু পিসী-ঠাকুরুণ কখনও তাঁকে পাত পেতে খেতে দেননি, আর শেষ পেতে শুতে দেননি, এমন লোক নেই, যার কাছে তাঁর নিন্দে না করেছেন। এখন তিনি বেঁচে নেই, তাই লক্ষ্মী হয়েছেন।"

মনোরমা পিসামার কথা শুনিয়া বলিল, "সত্যি পিসীমা, কনে-বৌমা যেন আমার হিংসেয় মরে।"

যোগ। খোলাকাটা ভটচাযির মেয়ে কি না, কোন দিন জুট্‌তো, কোন দিন জুট্‌তো না, একেবারে অট্টালিকায় পা পড়েছে, গ্যাদায় আর বাঁচেন না। বলে—'আঁস্তাকুড়ের পাত কখন স্বর্গে যায়?

সুখী ভাবিল আঁস্তাকুড়ের পাত যদিও যায়, তবুও পিসী-ঠাকুরুণ কখন যাবেন না।

মনো। কৈ পিসীমা, এখনও ত ডাক্তার এলেন না?

যোগমায়া অস্থির হইয়া সুখীকে বলিলেন, ও সুখী! তুই আর একবার যা. এখনও কেন আস্‌ছে না, একবার দে'খে আয়।"

এমন সময়ে ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে লইয়া সীতানাথ বাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তার বাবু থারমোমিটার দিয়া শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করিলেন, হাত দেখিলেন, জিব দেখিলেন,

বুক-পিঠে যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলেন, চক্ষের পাতা টানিয়া চক্ষু দেখিলেন, কপালে হাত দিয়া গায়ের তাপ বুঝিলেন; পরে গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার বাবুকে নিস্তব্ধ-ভাবে চিন্তা করিতে দেখিয়া সীতানাথ বাবু উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখিলেন?" ডাক্তার বাবু ভাবিয়া চিন্তায় উত্তর দিলেন, "জ্বরটা কিছু বেশী দেখ্‌লেম।"

যোগমায়ার প্রাণ উড়িয়া গেল। সীতানাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন ভয়ের কারণ নাই ত?"

ডাক্তার। উপস্থিত সে রকম কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনে. তবে এখন থেকে যদি খুব সাবধানে না রাখেন তবে ভয়ের কারণ হ'তে কতক্ষণ?

সীতা। আপনি যেমন উপদেশ দিবেন, সেই ভাবেই কাজ হবে, তার আর কোন ত্রুটি হবে না। তবে আপনি যদি বলেন, আমি কলেজ থেকে সাহেব ডাক্তার আন্‌তে পারি। সেটা আপনি বুঝে বলুন।

সুরেশ। আজ্ঞে, আমি যখন বুঝ্‌তে না পার্‌ব, তখন আমিই আপনাকে বল্‌ব। এখনও সে রকম কোন কারণ দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।

যোগমায়া ব্যাকুলভাবে ডাক্তারের হাত ধরিলেন; কাতরভাবে তাঁহাকে বলিলেন. "আপনাকে ভাল ক'রে খুসী কর্‌ব, আমার মনিকে ভাল ক'রে দেন। আমাদের আর নেই, বাড়ী শুদ্ধ লোকের প্রাণ এই একটি মেয়ে। যাতে শীগ্‌গির ভাল হয়, তাই করুন।"

সুরেশ বাবু কুণ্ঠিত হইয়া উত্তর দিলেন, "আমি আপনাদের নেমকের চাকর। আমাকে বেশী কথা বল্‌তে হবে না। আমার সাধ্যমত কোন অংশে ত্রুটি হবে না। তবে এত বড় জ্বরটা একদিনেই ত আর ভাল কর্‌তে পারিনে, আর এ ত ঠেলে দেবার নয়।"

সীতা। তা ত সত্যই।

সুরেশ। এই ঔষধটা এখন একবার খাইয়ে দিন, আর দুঘণ্টা পরে আর একবার খাওয়াবেন। তার পর আমি আবার আস্‌ব।

ডাক্তার বাবু ও সীতানাথ বাবু বাহিরে চলিয়া গেলেন। মনোরমা পিসীমাকে বলিল, "হাঁ পিসীমা, ডাক্তার বাবু বেশ লোক, কেমন না?"

যোগ। হাঁ মা, বেশ ভাল ডাক্তার, এখনও ছ মাস পেরোয়নি, এখানে এসেছেন, এর মধ্যেই ওঁর বেশ সুখ্যাতি হয়েছে। আমার বোধ হয়, বড় ঘরের ছেলে, ডাক্তারী শিখে এখন চাকরী কত্তে এসেছে।

মনো। দেখ্‌তে বেশ, আর কথাবার্ত্তাও ভাল। না পিসীমা?

যোগ। বেশ দেখ্‌তে, যেন রাজপুত্তুর, দেখ্‌লেই যত্ন কর্‌তে ইচ্ছে করে। আর কি—জামাই আমার রাজা ক'রে গেছেন, যেন লাঙ্গল ছেড়ে এসেছে।

মনো। থাক্ পিসীমা, আর তার নাম ক'রে কাজ নেই।

যোগ। থাক্ না, তা মা, আমি এখন একবার উঠি, সন্ধ্যে অনেকক্ষণ উত্‌রে গেছে।

মনো। তুমি যাবে, আর আমি একা থাকব ?

যোগ। একা কেন থাকবে মা ? সুখী ত ব'সে আছে। ও সুখী, তুই একটু কাছে বস, আমি শীগ্‌গির ক'রে একবার মালাটা ফিরিয়ে আসি।

যোগমায়া চলিয়া গেলেন। সুখী মনোরমার নিকট বসিয়া রহিল। তাহাদের দুই জনে অনেক কথা হইল, পাঠক পরে তাহা জানিতে পারিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মনোরমার অসুখ সারিয়াছে। তিনি অন্ন পথ্য করিয়াছেন, কিন্তু এখনও বড় দুর্ব্বল, এখনও তাঁহার চলিতে মাথা ঘোরে, এখনও ভাল করিয়া আহার করিতে পারেন না। শরীর জীর্ণ, বদন শুষ্ক, হস্ত-পদে সামর্থ্য নাই, এখনও পূর্ব্ব-লাবণ্য ফিরিয়া আসে নাই। তাই ডাক্তার সুরেশ বাবু প্রত্যহ বৈকালে তাঁহাকে দেখিতে আসেন এবং পুষ্টিকর ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

সুরেশ বাবুকে দেখিয়া মনোরমা প্রথম প্রথম লজ্জা করিত. লজ্জায় তাঁহার সহিত কথা কহিত না, সুখী ঝি মধ্যস্থ হইয়া ডাক্তার বাবুকে তাহার শরীরের অবস্থা বুঝাইয়া দিত। মনো-রমা প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়া অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিত, বস্ত্রাগ্রভাগ নাসিকাগ্রে স্পর্শ করিত। অল্পে অল্পে, আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে সে আবরণ ঘুচিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে মনোরমা তাঁহার সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিল, প্রথমে অস্পষ্ট কথাগুলি প্রায় জিহ্বার অগ্রভাগে জড়াইয়া থাকিত, ক্রমে সে জড়তা দূর হইল। শেষে তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার দেশের কথা, সংসারের কথা. আত্মীয়স্বজন-পরিবারবর্গের কথা সমস্ত কথাই জিজ্ঞাসা করিল।

প্রথম প্রথম সুরেশ বাবু অল্পক্ষণ থাকিয়াই চলিয়া যাইতেন, এখন মনোরমার অনুরোধে, তাহার আগ্রহাতিশয়ে তাঁহাকে বেশীক্ষণ থাকিতে হয়। মনোরমা তাঁহার সহিত গল্প করিতে ভালবাসে, তিনি যাইবার নাম করিলে আর একটু বসিতে

অনুরোধ করে। মনোরমা সুরেশ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, মনে মনে ভাবে, বড় সুন্দর মুখ। তাঁহার লম্বিত শ্মশ্রু বক্ষের উপর প্রসারিত, নয়ন জ্যোতির্ম্ময়—দীপ্তশালী। ডাক্তার বাবুকে দেখিলে মনোরমার বড় আনন্দ হয়; আনন্দে তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়; তিনি চলিয়া গেলে মনোরমার কিছুই ভাল লাগে না; শূন্য গৃহে সকলই শূন্যময় দেখে।

অল্পদিনের মধ্যেই পুষ্টিকর আহারে ও ঔষধে মনোরমার পূর্ব্ব-লাবণ্য ফিরিয়া আসিল, চারু অঙ্গে আবার রূপরাশি ফুটিয়া উঠিল। পক্ক-বিম্বাধরোষ্ঠী মনোরমার মধুর হাস্যে সুরেশচন্দ্রের অন্তঃকরণে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। তাহার গোলাপী গণ্ডের রক্তাক্ত আভা, আয়ত নেত্রের তীক্ষ্ণ অথচ মধুর দৃষ্টি সুরেশচন্দ্রকে অভিভূত করিল। তাহার লালসাদীপ্ত লাবণ্য-হিল্লোলে তাঁহার সদ্বৃত্তি ভাসিয়া গেল। তাহার বিকসিত কমল তুল্য বদন-কমল, তাহার মৃণালনিন্দিত সুগঠিত সুকোমল বাহুবল্লরী, তাহার নীল ইন্দীবরতুল্য নীল-মণিময় আঁখি, আরক্তোপান্ত আকর্ণবিশ্রান্ত, পুষ্পস্তবক-ভারা-বনত অশোকতরুর মত পীনস্তনশালিনী মনোমোহিনী অপূর্ব্ব রূপমাধুরী দেখিতে কে না ভালবাসে? রূপ দেখিতে কে না ভালবাসে? সুরেশচন্দ্র আত্মহারা হইয়া তাহার রূপ দেখিলেন। তাঁহার মনে হইল, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এমন রূপ ত কখন দেখেন নাই। লাবণ্যময়ী পূর্ণযুবতী তাঁহার মুখের উপর দৃষ্টিস্থাপন করিয়া বসিয়া আছে, তিনি চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। মনোরমার সৌন্দর্য্য-সাগরে তিনি ক্রমে ক্রমে ডুবিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার অনতিবিলম্বে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সুরেশ-বাবু সে সময় মনোরমার গৃহে বসিয়া আছেন। গৃহে আর কেহ নাই।

নির্জ্জন গৃহে সম্মিলিত যুবক-যুবতী। সুচারু পালঙ্কে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় বসিয়া মদিরায়তলোচনা মনোরমা, আর তাহার সম্মুখে ইজি-চেয়ারে বসিয়া অপূর্ব্ব-সুন্দর যুবক সুরেশ-চন্দ্র। মনোরমার হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। সুরেশ-চন্দ্র তাহার নয়ন-সুষমায় বিভোর হইয়া সতৃষ্ণ-নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। কন্দর্পের আধিপত্য করিবার উপযুক্ত সময়।

অল্পক্ষণ পরেই সুখী ঝি সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া গেল। সুরেশচন্দ্র সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "তা হ'লে আজ উঠি, অনেকক্ষণ এসেছি।"

মনোরমা অভিমানভরে উত্তর করিল, "তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, আপনি আমার এখানে বস্‌তে ভালবাসেন না।"

সুরেশবাবু যেন একটু লজ্জিত হইলেন; একবার চক্ষু নত করিয়া ভূমিতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; তাহার পর বামহস্তে দাড়ি ধরিয়া জড়িত-স্বরে বলিলেন, "অনেকক্ষণ হ'ল এসেছি, কেউ কিছু মনে করবে।"

মনোরমা স্পর্দ্ধাভরে বলিল, "কে কি মনে করবে? আপনি স্বচ্ছন্দে বসুন।"—তার পর লোলাপাঙ্গে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, স্ফুরিতাধরের হাসিটুকু অধরপ্রান্তে মিলাইয়া মধুর-কণ্ঠে বলিল, "আপনি আমায় দেখ্‌তে পারেন না।"

সুরেশচন্দ্র দাঁড়াইয়া ছিলেন, আবার চেয়ারে বসিলেন।

বিনম্রস্বরে মনোরমাকে বলিলেন, "আপনার এখানে যতক্ষণ থাকি, আমি বেশ থাকি, কিন্তু",—আবার তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, চমকিতভাবে অপরাধীর মত একবার গৃহের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন।

মনোরমা শীঘ্র-গতিতে পালঙ্ক হইতে ভূমিতে নামিল; চঞ্চল-হস্তে সুরেশবাবুর হাত ধরিয়া বলিল, "আপনি আসুন আমার কাছে। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। এত দিন বলি বলি করিয়া বলা হয় নাই, আজ তার প্রশস্ত সময়। আজ আপনাকে আমার মনের কথা খুলিয়া বলিব।"

সুরেশচন্দ্র মনোরমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। দুই জনে পালঙ্কোপরি বসিলেন। সম্ভোগকাতর তাঁহাদের সমস্ত শরীরে তড়িৎপ্রভা খেলিতে লাগিল। হৃদয় ঘন ঘন স্পন্দিত হইল। চন্দ্রোদয়ে ভাগীরথীর হৃদয়োচ্ছ্বাসের মত মনোরমার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইল। রূপময়ীর রূপবিভায় সুরেশ বাবুর অন্তঃকরণ আলোকিত হইল। নবোদ্গত নীপ-কুসুমের মত তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল।

তাহার পর মৃণাল-বিনিন্দিত করকমলে সুরেশবাবুর বামহস্ত স্থাপিত করিয়া মনোরমা বলিল, "অনেক দিন হইতে যে কথা বলিব বলিব মনে করিতেছি, আজ সেই কথা বলিব। আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না।"

সঙ্কুচিত হইয়া সুরেশবাবু উত্তর করিলেন, "আপনার উপর অসন্তুষ্ট কি হইতে পারি?"

অলক্তরাগরঞ্জিত ওষ্ঠাধরে আবার মধুর হাসি খেলিল, আবার সেই কটাক্ষপাত। সুরেশচন্দ্র আত্মবিস্মৃত হইলেন,

ভুলিয়া গেলেন, কি উদ্দেশ্যে তিনি বিদেশে চাকরী করিতে আসিয়াছেন।

দক্ষিণ-হস্তে মনোরমা তাঁহার দাড়িতে হাত বুলাইতে লাগিল, আর বাম-হস্ত তাঁহার হাতের উপর তুলিয়া রাখিয়া তাঁহার মুখের উপর দৃষ্টিস্থাপন করিয়া বলিল, "দেখুন, প্রথম যে দিন আপনাকে দেখি, তখন রোগযন্ত্রণায় আমি নিতান্ত কাতর, তবুও শত কষ্টের ভিতর আপনাকে দে'খে আমি বেশ বুঝ্‌তে পারলুম, আপনিই আমার উপযুক্ত। আমার স্বামী একটা আছে, কিন্তু তাকে আমি একটা বন্যপশু মনে ভাবি। সেই দিনেই আমি মনে ভাবলুম, যদি আমি রোগমুক্ত হই, আমার রূপযৌবন আপনার চরণে সমর্পণ কর্‌ব। যখন আমার হাত ধ'রে আপনি আমার নাড়ী পরীক্ষা কল্লেন, আমার ক্ষীণ অঙ্গ আপনার স্পর্শ-সুখে কণ্টকিত হ'ল। সেই আপনার প্রথম স্পর্শ! যখন আপনি আমায় চক্ষু চাহিতে বলিলেন, আপনার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, মনে করিলাম, অমন সুন্দর মুখ ইহ-জীবনে আর কখনও দেখি নাই।"

সুরেশচন্দ্র মনোরমার সমস্ত কথা শুনিলেন, তাঁহার মনের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। গৃহে পরিত্যক্ত অনুগত ভার্যা সুলোচনার নির্দ্দোষ সুন্দর মুখখানি তাঁহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। নীলকণ্ঠের মত তাঁহার অবস্থা হইল। তাঁহার ভাবান্তর দেখিয়া মনোরমা তাঁহাকে বলিল, "আমার কথা কি তোমার ভাল লাগিতেছে না?"

সুরেশ নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বড় সুন্দর মুখ, তখন তিনি একবারও ভাবিতে

পারেন নাই যে, সেই সৌন্দর্য্যের ভিতর তীব্র হলাহল আছে; প্রচ্ছন্নভাবে অল্পে অল্পে তাঁহার সমস্ত শরীর দগ্ধ করিবে। সুরেশ বাবু মনোরমার দক্ষিণ-হস্ত তাঁহার হাতের মধ্যে রাখিয়া অস্পষ্ট-স্বরে বলিলেন, "আমি কি আপনার উপযুক্ত?"

মনো। কেন, এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

সুরেশ। আমি আপনাদের সামান্য চাকরমাত্র, আপনাদেরই অন্নে প্রতিপালিত।

মনোরমা আবার হাসিলেন, স্ফুরিতাধরের মধুর হাসি যেন নৈশ গগনে বিদ্যুৎ চমকিল। সোহাগভরে বলিলেন, "তা যদি বল, তা হ'লে আমিও বল্‌তে পারি, আমিও তোমার দাসী।"

সুরেশচন্দ্র চমকিত হইলেন। মনোরমা ব্রাহ্মণকন্যা। মনোরমা আবার বলিলেন, "চুপ ক'রে রইলে যে। বল, আমাকে তুমি ভালবাস্‌বে? তুমি বড় সুন্দর। তোমার মত সুন্দর পুরুষ আমি আর কখনও দেখিনি।"

মনোরমা দক্ষিণ-হস্ত সুরেশের স্কন্ধে স্থাপিত করিয়া, বাম-হস্ত তাঁহার দাড়িতে বুলাইতে লাগিল। সোহাগে আদরে আবার বলিল, "বল, তুমি আমার হবে? আমি তোমারই, তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি। বল, তুমি আমায় ভালবাস্‌বে?"

মনোমোহিনী সুন্দরী তাঁহার কণ্ঠলগ্না হইয়া অযাচিতভাবে তাঁহাকে আত্মদান করিতেছে, তিনিও রক্তমাংসমণ্ডিত বিরহী যুবক। মনোরমার রূপরাশিতে বিজলী খেলিতেছে, উত্তেজনার বশে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছে, মুখমণ্ডলে রক্তাভা প্রকটিত হইতেছে। আবেগভরে সে তাহার বাহুলতায় সুরেশ বাবুকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিল। মন্মথ-তাড়িত

সুরেশচন্দ্রের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। আত্মহারা হইয়া তাঁহার ফুল্লারবিন্দ তুল্য মধুর অধরে তিনি ধীরে ধীরে চুম্বন করিলেন।

সুরেশ বাবু সমস্ত ভুলিলেন। পতিপরায়ণা সাধ্বী ভার্য্যা, শুদ্ধাচারিণী বিধবা ভগিনী, নাবালক কনিষ্ঠ সহোদর সমস্ত ভুলিলেন। তাঁহার মান-সম্ভ্রম, ধর্ম্মজ্ঞান, আত্ম-প্রতিষ্ঠা, যশ, কীর্ত্তি সমস্ত অতলজলে বিসর্জ্জিত হইল। মুগ্ধনেত্রে তিনি কেবল মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এমন সময়ে সুখী ঝি গৃহে প্রবেশ করিল; শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "দিদিমণি, বাবু আসছেন।" তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিল। বাসনাদীপ্ত হৃদয় আবার যেন অন্ধকারময় হইল। ত্বরিতপদে সুরেশ বাবু চেয়ারে গিয়া বসিলেন, মনোরমা সংযত-ভাবে পালঙ্কের একপার্শ্বে বসিল। সুখী ঝি মধ্যস্থ হইয়া কথা কহিতে লাগিল।

সীতানাথ বাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন। বিনীতভাবে সুরেশ বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নিকট কন্যার শারীরিক উন্নতির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বাধ্য হইয়া সুরেশ বাবুকে উত্তর করিতে হইল যে, মনোরমার অসুখ সম্পূর্ণ সারিয়াছে।

সেই দিন হইতে মনোরমার গৃহে সুরেশের যাতায়াত বন্ধ হইল। সীতানাথ বাবু মনোরমার শরীরপুষ্টি করিবার জন্য কবিরাজী ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মনোরমা বড়ই বিপদে পড়িল। পিতার নিকট বলিতে পারে না, সুরেশ বাবুকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিতে, কিন্তু সুরেশ বাবুকে না দেখিয়াও ত আর থাকিতে পারে না। কি উপায় করিবে? আরও বলিতে পারে না যে, তাহার শরীর ভাল নয়, অতএব আর একবার ডাক্তার বাবুর দেখা আবশ্যক। তবে কি উপায়ে আবার তাঁহার সহিত মিলন হইবে? তাহার লালসাদীপ্ত অন্তরে আগুন জ্বলিতেছিল, কে সে আগুন নির্ব্বাণ করিবে? তাহার তপ্ত মরুময় হৃদয়ে দুই বিন্দু বারিধারা পড়িতে না পড়িতেই মিলাইয়া গেল, সে ভাল করিয়া তাহার শৈত্য-বুঝিতে পারিল না। তাহার অন্ধকারময় হৃদয়ে সুরেশচন্দ্রের রূপজ্যোতিঃ পূর্ণিমার পূর্ণশশধরের মত। সুখস্বপ্নে মনোরমা বিভোর হইয়াছিল, এমন সময়ে সুখী ঝি আসিয়া তাহার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল। মনোরমা বড়ই অস্থির হইল।

মনোরমা তাহার স্বামীর কথা একবারও ভাবিল না। কুলীন-শ্রেষ্ঠ স্বামী, দেবগুণে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ। সেই সর্ব্বগুণাধার স্বামী অন্যায়রূপে অপমানিত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ভ্রমেও মনোরমা তাঁহার কথা মনে ভাবে না। আজন্ম বিলাসের ক্রোড়ে পালিতা, সে কেবল ভোগৈশ্বর্য্যেরই আদর জানে, স্বামীর মর্য্যাদা সে কি বুঝিবে? তাহার কলুষিত হৃদয়ে স্বামীর মূর্ত্তি স্থান পাইবে কেন? পাপ-পুণ্য-ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান-রহিত হইয়া, কেবল তাহার আকাঙ্ক্ষা-পূরণ করিতেই চিন্তিত। কেনই বা

না হইবে? স্বেচ্ছাচারিণী অপ্রতিহত-গতিতে আশৈশব তাহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া আসিয়াছে. কখন কেহ কোন প্রকারে বাধা দেয় নাই। এখন তাহার মনে ধর্ম্মের ভাব উদয় হইবে কেন?

উপায়ান্তর না দেখিয়া, মনোরমা সুখী ঝির শরণাপন্ন হইল। বৈকালে সুখীকে তাহার গৃহমধ্যে ডাকিয়া, প্রথমে তাহার অনেক প্রশংসা করিল। সুখী বড় সুতুষ্ট হইল। তাহার বড়ই আহ্লাদ হইল। সে বুঝিতে পারিল, রোগীর ঔষধ ধরিয়াছে, এইবারে তাহার অদৃষ্ট ফিরিবে।

সুখী জাতিতে কৈবর্ত্তের মেয়ে। অল্পবয়সেই সে বিধবা হয়। সে তাহার মাতার একমাত্র কন্যা, তাই তাহার মাতা তাহাকে আর শ্বশুরালয়ে পাঠায় নাই। তাহার মাতা দুঃখী ছিল, অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিত, লোকের বাড়ী ধান ভানিয়া চাউল আনিত, গৃহস্থের বাড়ী ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে বাসন মাজিত, কুট্‌না কুটিত, বাট্‌না বাটিত, বাটীস্থ সকলের ফরমাস খাটিত, তাহাতেও দু-পয়সা রোজগার করিত। কিন্তু সুখীকে কখনও কোন কাজ করিতে হয় নাই। মাতা কষ্ট করিয়া যাহা আনিত, তাহাতে তাহার মাতার কষ্টের কখন কোন অংশ গ্রহণ করিতে হয় নাই।

সুখী দেখিতেও বড় মন্দ ছিল না। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবে তাহাকে সুন্দরী বলা যাইতে পারে। তাহার মুক্তা-পাঁতিতুল্য দন্ত, নেত্র আয়ত—উজ্জ্বল। তাহার কমনীয় গঠন-মাধুর্য্যে অনেক যুবক মুগ্ধ হইত। তাহার স্বভাব-চরিত্র আদৌ ভাল ছিল না। লজ্জা কাহাকে বলে, সে একরকম জানিত না;

স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা বেড়াইত, যাহার সঙ্গে ইচ্ছা কথা কহিত। দুশ্চরিত্র ব্যভিচারী যুবকেরা সন্ধ্যার পর তাহার কুটীরে জমা হইত। সুখী তাহাদের সহিত হাস্য-পরিহাস করিত, ভালমন্দ গল্প করিত। তাহার অনুগ্রহ লাভ করিতে অনেকে লালায়িত হইত। স্বেচ্ছাচারিণী সুখী নির্বিবাদে তাহার মনোমত উপপতি লইয়া মনের সুখে কালযাপন করিত। তাহার বৃদ্ধা মাতা কোনদিকেই চাহিয়া দেখিত না, কেবল খাইবার সময়ে তাহাকে ডাকিয়া খাওয়াইত। কন্যার দুশ্চরিত্রের কথা বলিলে সে কথা আদৌ কানে তুলিত না।

কিছু দিন পরে তাহার মাতার মৃত্যু হইল। তখন হইতে সুখী একটু সাবধানে চলিতে লাগিল. তাহার ফল এই হইল যে, তাহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী যুবকগণ তাহাকে একে একে পরিত্যাগ করিল, কারণ, পল্লীগ্রামের অলস যুবক-সম্প্রদায় রিক্তহস্তে বিলাসিনী রমণীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে সর্ব্বদাই লোলুপ।

সুখী পরিশ্রম করিতে পারিত না, কিন্তু সে বুদ্ধিমতী ছিল। সে বিবেচনা করিল, কেবল উপপতির অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করা সঙ্গত নয়. কারণ, রূপ-যৌবন চিরস্থায়ী নয়। শেষ বয়সের জন্য কিছু সঞ্চিত রাখা দরকার। তাই সে জমিদার-বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহার মাতা কাজ-কর্ম্মোপলক্ষে প্রায়ই জমিদার-বাটীতে যাইত, সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া সুখী সেখানে আশ্রয় পাইল।

সুখী বুদ্ধিমতী ছিল বলিয়া অতি সহজেই জমিদার-বাটীতে প্রতিপত্তি লাভ করিল। সে সর্ব্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিত, সেই জন্য মনোরমা তাহাকে ভালবাসিত। শেষকালে সে মনো-

রমার এত প্রিয় হইল যে, মনোরমার কাছ ছাড়া সংসারের আর আর কোন কাজই তাহাকে করিতে হইত না। আজ মনোরমার মুখে তাহার প্রশংসার কথা শুনিয়া, সে একগাল হাসিয়া বলিল, "তুমি আমায় ভালবাস কি না দিদিমণি, তাই আমার এত সুখ্যাতি ক'চ্ছ। কপাল মন্দ, তাই আমি চাকরী ক'র্‌তে এসেছি, নইলে ন'ড়ে ব'স্‌তুম্ না।"

মনোরমা তাহার কথা শুনিয়া হাস্যসহকারে বলিল, "নেহাৎ কপাল মন্দ, নইলে আমি তোকে পাব কেন? যাক্ এখন সে কথা। তুই ত বলিস্, তুই আমায় বড্ড ভালবাসিস্?"

সুখী। সাম্‌নে ব'ল্লে খোসামুদে কথা হয়, কিন্তু যথার্থই ব'ল্‌ছি দিদিমণি, তোমাকে আমি আন্তরিক ভালবাসি।

মনোরমা। যথার্থই তুই যদি আমায় ভালবাসিস্, তবে আমি যা ব'ল্‌ব, তা কর্‌তে পার্‌বি?

সুখী বুঝিতে পারিল, তাহাকে কি কাজ করিতে হইবে। মনে ভাবিল, পয়সা উপায় করিবার এই প্রধান সুযোগ। মুখে বলিল, "তোমার কথায় দিদিমণি, আমি ম'র্‌তে পারি।"

মনোরমা। আমি তোকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নিতে চাই, তুই কি ক'র্‌বি?

সুখী। নিশ্চয়ই ক'র্‌ব। তা আবার জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ?

মনোরমা গলা থেকে সোনার হার খুলিয়া, তাহাকে দেখাইয়া হাসিমুখে বলিল, "এই হার তোর গলায় পরিয়ে দেব, তুই যদি আমার এই উপকার করিস্।"

সুখী নেকী সাজিয়া বলিল, "কি ক'র্‌তে হবে, আমাকে বল। না ব'ল্লে আমি বুঝ্‌ব কেমন ক'রে?"

মনোরমা। আমি চিরদিনের জন্য তোর কেনা হ'য়ে থাক্‌ব, তুই যা চাইবি, আমি তাই দেবো।

সুখী। কি জ্বালা! কি কথাটাই শুনি, তার পর বোঝা যাবে।

মনোরমা। তুই ত বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্‌, তোকে আর বেশী কি ব'লব?

সুখী একটু হাসিয়া বলিল,"ডাক্তার বাবুকে গোপনে তোমার ঘরে এনে দেব?"

মনোরমা সুখীর হাত ধরিল। অত বড় গৌরবান্বিতা জমিদার-কন্যা একজন সামান্য পরিচারিকার হাত ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিল, "এ কাজ তোকে ক'র্‌তেই হবে। ডাক্তার বাবুকে না দেখ্‌তে পেলে, আমি প্রাণে বাঁচ্‌ব না।"

সুখী গম্ভীরভাবে বলিল, "বড় শক্ত কাজ দিদিমণি!"

মনোরমা। তোকে ক'র্‌তেই হবে।

সুখী। কিন্তু বাবু যদি কোন প্রকারে জান্‌তে পারেন, তা হ'লে তোমারও সর্ব্বনাশ আর আমারও সর্ব্বনাশ আর ডাক্তার বাবুর কি গতি হবে, তা জানিনে।

মনোরমা। লুকিয়ে রাত্রিবেলায় আন্‌বি। কে জান্‌তে পার্‌বে?

সুখী। দিদিমণি রাস্তারও চ'খ আছে আর দেয়ালেরও কান আছে।

মনোরমা। সেই জন্যই ত তোকে ব'ল্‌ছি। এ কাজ তুই না ক'র্লে আর আমার উপায় নেই। সুখী! আমি চিরদিন তোর কেনা হয়ে থাক্‌ব। যে দিন থেকে ডাক্তার বাবুকে দেখেছি,

সেই দিন থেকেই আমি তাঁর। মন আর কিছুতেই স্থির ক'র্‌তে পাচ্ছিনে। কতক্ষণে তাঁকে দেখ্‌তে পাব, সেই ভাবনাতেই আমি ডুবে আছি। অমন সুন্দর পুরুষ আমি ইহজীবনে আর দেখিনি।

সুখীও তাহার দিদিমণির কথায় সায় দিল ;—'যথার্থই দিদিমণি, ডাক্তার বাবুর মত সুন্দর মানুষ আমিও আর কখন দেখিনি। তাঁর রূপ দেখে মজ্‌তে হয়, এতে আর তোমার তত দোষ নেই।'—পোড়ারমুখীর অনেকদিনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, তাই তাহার এত আহ্লাদ। অনেক দিন হইতেই সে মত্‌লব ক'রিতেছে,যদি কোন প্রকারে মনোরমাকে কুপথগামিনী ক'র্‌তে পারে, তাহা হইলে আর তাহাকে দাসীত্ব করিতে হইবে না। যে দিন হইতে হরেন্দ্রকুমার শ্বশুরভবন ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সেই দিন হইতেই সুখী চেষ্টা করিতেছে, কি করিয়া মনোরমাকে কুপথে লইয়া যাইবে।

মনোরমা তাহার সম্মতি পাইয়া, তাহার প্রতি বড় সন্তুষ্ট হইল ; মিষ্টবাক্যে তাহাকে আপ্যায়িত করিয়া অনেক লোভ দেখাইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আহারান্তে সুরেশ বাবু বাহিরের গৃহে বসিয়া আছেন। চাকর আসিয়া গড়গড়ায় তামাক দিয়া গেল। তিনিও নলটি হাতে করিয়া মুখাগ্রে স্পর্শ করিবেন, এমন সময় সুখী ঝি উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই তিনি চমকিত হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল।

আঁচলের খুঁট হইতে সুখী পত্র খুলিতে লাগিল আর অপাঙ্গে সুরেশ বাবুর প্রতি চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সুরেশ বাবু মনোরমার পত্র পড়িলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল।

অল্পকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সুখী তাহার পত্রের উত্তর চাহিল। লজ্জার মাথা খাইয়া, পোড়ারমুখী তাঁহাকে বলিল, "আপনার কপাল ভাল, তাই দিদিমণির আপনার উপর অনুগ্রহ হয়েছে।" তাহার পর সুখীতে ও ডাক্তার বাবুতে কিছুক্ষণ কথা হইল। সুখী হাসিমুখে চলিয়া গেল।

সুখী চলিয়া যাইবার পর সুরেশ বাবু চিন্তা করিয়া দেখিলেন, কি করা উচিত? গৃহে প্রীতিময়ী ভার্য্যা তাঁহার আশা-প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। বিদায়কালে তাঁহার অশ্রুভারাবনত আঁখির ম্লান অথচ কাতর দৃষ্টি তাঁহার স্মরণপথে উদয় হইল। প্রাণোপম কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া আছে, সংসারের সর্ব্বসুখ-পরিত্যক্তা বিধবা ভগিনী তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া আছে। তিনি তাহাদের সকলের চক্ষুস্বরূপ। তিনি কি করিবেন?

এ দিকে শিথিলবসনা সুন্দরী মনোরমা রূপের তরঙ্গ বাহিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। তাহার রূপজ্যোতিঃ সুরেশের সমস্ত প্রাণকে চমকিত করিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে তিনি চিত্ত হারাইলেন, সংসারের সমস্ত কার্য্য ভুলিয়া গেলেন। নির্ব্বাপিত বাসনাগ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল। সে আগুনে তাঁহার সমস্ত হৃদয় পুড়িতে লাগিল।

গৌরবান্বিতা জমিদার-কন্যা সুরেশের অযাচিতভাবে আত্ম-দান করিতেছে। তাহার অগাধ প্রেম, অনিন্দ্য-সুন্দর কান্তি, অপরূপ রূপমাধুরী। তিনি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে মুগ্ধ যুবক মনে করিলেন, কি জানি, অদৃষ্টের গতি কোন্ দিকে ফিরে। বেতনভোগী ডাক্তারের ভাগ্যে কি ঘটিবে, কে বলিতে পারে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্বশুরালয় হইতে আনন্দভরা প্রাণে হরেন্দ্রকুমার দেশে ফিরিলেন। দেখিলেন, রোগশয্যায় শায়িতা জননী কণ্ঠাগতপ্রাণা, মৃত্যু যেন তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে, কেবল তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায়। দিবা চলিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। তিনি জননীর চরণপ্রান্তে বসিলেন, দেখিলেন, তাঁহার ক্ষীণ শীর্ণ দেহ অবশ, মৃত্যুর ছায়া তাঁহার সমস্ত শরীরে কালি ঢালিয়া দিয়াছে। দুঃখে তাঁহার প্রাণ পরিপূর্ণ হইল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তিনি ডাকিলেন, "মা!—মা!" অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে জননী তাঁহার মুখপানে চাহিলেন। মৃত্যুযন্ত্রণার ভিতরেও সন্তানের মুখ দেখিয়া তাঁহার অন্ধকারময় হৃদয়ে একবার আলো জ্বলিয়া উঠিল। তাই সেই কালিমামণ্ডিত ওষ্ঠাধরে মুহূর্ত্তের জন্যও হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

মাতৃবৎসল সন্তান মাতার কোন কার্য্যই করিতে পারিলেন না, এ দুঃখ তাঁহার ত মরিলেও যাইবে না। হরেন্দ্রকুমার মনে করিলেন, এমন কি কোন দৈবশক্তি নাই, যাহা দ্বারা তাঁহার মাতাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারেন? ভালবাসার সমস্ত সূত্র দিয়াও কি প্রিয়বস্তুকে বাঁধিয়া রাখিতে পারা যায় না?

তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, "আজ এক মাসের উপর হইল, রোগভোগ করিতেছে। বাবা! আর আমারও কিছুই নাই, যাহা ছিল, সমস্তই ডাক্তার-কবিরাজকে দিয়াছি, তবুও

ও ভাল করিতে পারিলাম না।"—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন পুত্রের আগমনমাত্রেই বহুদিন-সঞ্চিত তাঁহার দুঃখরাশি উথলিয়া উঠিল, অশ্রুজল বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া হরেন্দ্রকুমার তাঁহার পিতাকে বলিলেন, "বাবা! আমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট, তাই আসিতে পারি নাই। এখন সে কথা বলিবার সময় নয়, কিন্তু আমি বড় কষ্ট পেয়েছি।"

তাঁহার পিতা পুনরায় বলিলেন, "তুমি যে আমাদের একমাত্র সন্তান বাবা, আর যে আমাদের কেউ নাই; আজ একমাস ধ'রে ব'লছে, আমার হরেনের সঙ্গে দেখা হ'ল না। তোমাকে দেখ্‌বার জন্য কত যে ব্যাকুল হ'ত, তা আর আমি কি ব'লব? রোগের যাতনায় অস্থির হয়ে কেবল ছট্‌ফট্‌ ক'রেছে, আর তোমার নাম ধ'রে কেঁদেছে,—'আমার হরেন কোথায়, আমার হরেন কোথায়?' আমাকে কত ব'লেছে, একবার আমার হরেনকে এনে দেখালে না? বাবা! সেই সব কথা শুনে আমার প্রাণ ফেটে যেত। মনে হ'ত, কোথায় তুমি আছ, তোমায় সেখান থেকে ধ'রে নিয়ে আসি, এনে একবার তোমায় দেখাই। তোমার শ্বশুরকে কত চিঠি লিখেছি, কিন্তু একখানারও জবাব পাইনি। তোমার ভাবনায় আমরা আরও কাতর।"

হরেন্দ্রের চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িল। মর্ম্মদাহে তিনি অস্থির হইলেন। মনে মনে পিশাচ-প্রকৃতি শ্বশুরের প্রতি সহস্র অভিসম্পাৎ প্রদান করিলেন। তাঁহার পিতা আবার বলিলেন, "কথা বন্ধ হ'য়ে গেছে, তবুও ইসারা ক'রে দেখিয়েছে—তুমি কোথায়।"

হরেন্দ্রকুমার আর সহ্য করিতে পারিলেন না; কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার চরণপ্রান্তে মুখ ঢাকিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার চরণতল সিক্ত হইল। হরেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, "মা, মা!"—হায়, এ স্নেহ সম্বোধনের কে উত্তর দিবে?

স্নেহশীল জনক পুত্রের দুঃখে আরও মর্ম্মাহত হইলেন। তখন নিজের কষ্টের কথা ভুলিয়া সন্তানকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। সমস্ত পৃথিবী নিদ্রার কোলে শায়িত, কেবল ঝিল্লীমন্ত্রমুখরিত রজনী পৃথিবীর গতি নিরীক্ষণ করিতেছে। কেহ বা পরম নিশ্চিন্ত-মনে বিলাসের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছে, আবার কেহ বা ভয়ব্যাকুলিত-চিত্তে অপেক্ষা করিতেছে, কাল-রজনী কখন প্রভাত হয়! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুত্রের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে অবসন্নদেহে রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে শয়ন করিলেন। আজ কতদিন তিনি চক্ষু মুদিত করিতে পারেন নাই; তাই পুত্রের আগমনে কতকটা নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইয়া পড়িলেন। গৃহে মৃণ্ময় প্রদীপের ক্ষীণ আলোকরেখায় হরেন্দ্র-কুমার মাতার জীর্ণ বক্ষের মৃদু স্পন্দন দেখিতে লাগিলেন। মনে ভাবিলেন, শৈশবে সংসার-জ্ঞানহীন বালক মাতার অনাবৃত বক্ষে অঙ্গ ঢালিয়া স্বর্গের সুষমা দেখিতে পাইতেন। হায়, সে দিন চলিয়া গিয়াছে, আর ফিরিয়া আসিবে না!

সুপ্ত জগতের গভীর নিশ্বাসধ্বনি হরেন্দ্রের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত করিল। নয়নে তিনি নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। সেই মুমূর্ষু রোগীর শয্যাপার্শ্বে একা বসিয়া তিনি নানারূপ দুশ্চিন্তা করিতে লাগিলেন ইহজীবনের মত তাঁহার মা

বলা সাধ ফুরাইয়া যায়! কি মধুময়, প্রীতিময়, আনন্দময় সম্বোধন! তাঁহার সন্তাপিত তৃষিত প্রাণে স্নিগ্ধ-সুধা! তাঁহার মরুময় শুষ্ক হৃদয়ে মন্দাকিনী-ধারা! এইবার তাহা ফুরাইয়া যায়! চমকিত-নেত্রে তিনি জননীর মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার নিমীলিত আঁখি ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, দৃষ্টি তখন তেজোময়ী। সেই বিশুষ্ক বদন হইতে যেন অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে, সেই শুষ্ক ওষ্ঠাধরে যেন হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সন্তপ্ত প্রাণে হরেন্দ্রকুমার তাহার পিতাকে জাগরিত করিলেন। তখন পূর্ব্বগগনে প্রভাতারুণ-রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, রূপময়ী উষার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে। মৃদু সমীরণ নিদ্রাতুর প্রাণে শান্তি ঢালিতেছে।

হরেন্দ্রকুমার দেখিলেন, জননীর নাভিশ্বাস হইয়াছে। তখন পিতা-পুত্রে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের মহিমা গান করিতে করিতে তাঁহাকে গৃহের বাহিরে আনিলেন। প্রতিবাসীরা কেহ কেহ সেই শব্দে ছুটিয়া আসিল।

সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্বামি-পুত্রে সুশোভিতা সাধ্বী ভগবানের মহিমা-গান শুনিতে শুনিতে চিরজীবনের মত চক্ষু মুদিত করিলেন। হরেন্দ্রকুমার চক্ষে দেখিলেন—সংসার শূন্য; তাঁহার পিতা মনে ভাবিলেন,—এত দিনে তাঁহার গৃহলক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল!

মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ান্তে হরেন্দ্র ভগ্নপ্রাণে গৃহে ফিরিলেন। নিদ্রাতুর শিশুর বক্ষ-স্পন্দনের মত শোকে তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিতে লাগিল। বাহ্য-কলেবর স্থির, যেন মহাপ্রলয়ের পরে ধরণী নির্ব্বাত—নিস্পন্দ।

বৃদ্ধ পিতার সকরুণ মর্ম্মোচ্ছ্বাসে হরেন্দ্রের মাতৃশোকাতুর চিত্ত

আরও কাতর হইল। পরিণত-বয়সে পত্নীবিয়োগে তাঁহার জীর্ণ হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পিতৃবৎসল সন্তান পিতার কষ্টে প্রাণে আরও ব্যথা পাইলেন; তাই তাঁহার পিতাকে সান্ত্বনা করিতে আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন; আবার সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

রৌদ্রদগ্ধ শুষ্ক তরুর মত বৃদ্ধ ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। তাঁহার মূলদেশে কালের কুঠারাঘাত পড়িয়াছে। জীবনীশক্তিহীন দেহ ক্রমেই অবশ হইতে লাগিল। হরেন্দ্রকুমার দেখিলেন, তাঁহার পিতাও ফাঁকি দিয়া যান, তাই অনবরত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কি করিলে বৃদ্ধের জীবন রক্ষা পায়? সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি পিতাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না।

হরেন্দ্রকুমার মনে ভাবিলেন, তাঁহার ভাগ্য-গগনের শেষ নক্ষত্রটি খসিয়া পড়িল। তাঁহার সংসারের শেষ অবলম্বন চলিয়া গেল, আর কাহাকে লইয়া তিনি সংসার করিবেন? তখন সেই পৈতৃক ভদ্রাসন, পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণের সমস্ত জীবনের লীলাস্থল, পিতার সাধের আম্রকানন, তাঁহার স্বহস্ত-রোপিত নানাবিধ বৃক্ষরাজি সমস্ত ত্যাগ করিলেন। গৃহ-প্রতিষ্ঠিত পুরুষপরম্পরায় সেবিত শালগ্রামশিলা পাড়ার একজন ব্রাহ্মণের বাটীতে রাখিলেন। দেবোত্তর-ব্রহ্মোত্তর যাহা কিছু ছিল, সমুদয় সেই ব্রাহ্মণকে দেবসেবার্থে দান করিলেন। তৈজসপত্র, বাক্স-সিন্দুক কতক বিক্রয় করিলেন, কতক বিলাইয়া দিলেন। উদ্দেশে পিতা-পিতামহ প্রভৃতির চরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করিলেন। তার পর জন্মের মত গৃহত্যাগ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুখী ডাক্তার বাবুর বাটী হইতে ফিরিয়া আসিল। রঙ্গপ্রিয়া পোড়ারমুখী তাহার দিদিমণির ঘরে গিয়া শ্রান্তভাবে মেজের উপর বসিয়া পড়িল; অঞ্চলের অগ্রভাগ সঞ্চালিত করিয়া বাতাস খাইতে লাগিল। মনোরমা ঔৎসুক্যের সহিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "অমন ক'রে ব'সে পড়্‌লি যে?" সুখী তাহার কথার উত্তর না দিয়া আপন মনে বাতাস খাইতে লাগিল। তাহার ভাব দেখিয়া মনোরমার রাগ হইল, তাই একটু উচ্চ-কণ্ঠে তাহাকে বলিল, "কি হ'ল, পোড়ারমুখী বল্ না?" সুখী একবার একটু ঢোক গিলিল, একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিল, তাহার পর মনোরমার মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। মনোরমার আরও রাগ হইল, তাই তাহাকে ভৎর্সনা করিল। পোড়ারমুখী তাহাতেও কোন কথা কহিল না। রঙ্গ করিতে তাহার সমকক্ষ কেহ ছিল না।

মনোরমা অধৈর্য্য হইল, অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিল, "তোকে দূর ক'রে দেব পোড়ারমুখী!"

সুখী মৃদু হাসিয়া অভিমান-মিশ্রিত স্বরে বলিল, "তা দেবে বই কি! আমি যার ভালর জন্য ফিরি, সেই আমাকে দেখ্‌তে পারে না।"

তখন মনোরমা একটু নরম হইয়া বলিল, "তোর নিজের দোষেই ত তুই বকুনি খাস্। সব সময় রঙ্গ কি ভাল লাগে? এখন কি হ'ল, বল্ দেখি?"

সুখী গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "কিছুই হ'ল না।"

মনোরমা ব্যগ্রভাবে বলিল, "সে কি? তোর কথা ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লুম না।"

সুখী। কি বুঝ্‌তে পাল্লে না?

মনো। আমার চিঠির জবাব কৈ?

সুখী। জবাব-টবাব তিনি দিলেন না।

মনো। কি বল্লেন?

সুখী। কিছুই বল্লেন না।

মনো। কোন কথা বল্লেন না?

সুখী। না রাম, না গঙ্গা কোন কথাই নয়।

মনো। তবে তুই গেছ্‌লি কি জন্যে?

সুখী। তুমি পাঠিয়েছিলে, তাই গেছলুম।

মনো। আমি তোকে কি জন্য পাঠিয়েছিলুম?"

সুখী। যে জন্যে পাঠিয়েছিলে, সেই জন্যেই গেছ্‌লুম।

মনো। পোড়ারমুখীর সঙ্গে কথায় কেউ পার্‌বে না। অত কথায় আমার দরকার নাই, তোকে জিজ্ঞাসা করি, সেখানে গিয়ে তোর সঙ্গে তাঁর কি কথা হ'ল?

সুখী। এই ত তোমাকে বল্লুম, কোন কথাই হয়নি।

মনো। ফের যদি চালাকী কর্‌বি, তোকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেব।

সুখী। তা ত দেবেই, কলির ধর্ম্মই এই।

মনোরমা নিরুপায় দেখিয়া সুখীর হাত ধরিয়া তাহাকে মিনতি করিয়া বলিল, "বল্‌ না, আমার মাথার দিব্যি, সত্যি ক'রে বল্‌, তিনি কি বল্লেন?

তখন হাসিমুখে পোড়ারমুখী সুখী তাহার দিদিমণিকে বলিল, 'আমাকে কি দেবে বল ?'—এতক্ষণে মনোরমার দেহে প্রাণ আসিল। দারুণ উৎকণ্ঠিত-চিত্তে সর্ব্বনাশিনী তাহার উপ-পতির সম্মতি-প্রতীক্ষায় এতক্ষণ বসিয়া ছিল, সুখীর ভাবগতিক দেখিয়া তাহার প্রাণের মধ্যে ভয় হইয়াছিল, হয় ত ডাক্তার বাবু অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পর হাতবাক্সের চাবী খুলিয়া মনোরমা দশটা টাকা বাহির করিয়া সুখীর হাতে দিয়া হাসিমুখে বলিল, 'এখন এই নে। সুরেশ বাবুর আসিবার পর আমার এই গলার হার তোর গলায় পরিয়ে দেব। এখন বল্ দেখি, তিনি কি বল্লেন, আর কখন্ আস্‌বেন ?'

সুখী মৃদু হাসিয়া বলিল "বল্‌বেন আর কি ? আজ রাত্রে সবাই ঘুমুলে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসব।"

সন্ধ্যার পর মনোরমা বিলাসের সর্ব্বোপকরণে সজ্জিতা হইল। সযত্নে বিন্যস্ত কবরীতে সোনার ফুল গুঁজিল। কানে হীরার এয়ারিং, হস্তে হীরার খচিত স্বর্ণবলয়, তাহার উপর হীরার চুড়ি। কাঞ্চনরত্ন-খচিত কাঞ্চীর দ্বারা নিতম্ব-দেশকে এবং নূপুর দ্বারা পদ্মকান্তি বিকীর্ণকারী পাদপদ্মকে ভূষিত করিল। গলদেশে বহুমূল্য রত্নহার তাহার পীনোন্নত পয়োধরের উপর পড়িয়া যেন তাহা মন্মথের কুলধনুস্থিত কুসুম স্তবকের মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নানাবিধ রত্নালঙ্কার, যেখানে যা শোভা পায়, তাহার দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিল। হীরামুক্তায় বিভূষিতা মনোরমার রূপরাশি যেন উছলিয়া উঠিল। রূপগর্ব্বগর্ব্বিতা পূর্ণযুবতী হৃদয়ে সহস্র কামানলশিখা প্রজ্বালিত করিয়া স্বর্ণ-পালঙ্কে উপবেশন করিল।

গৃহে রজতনির্ম্মিত বর্ত্তিকাধারে উজ্জ্বল আলোকরাশি গৃহের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চারুচিত্রে বিচিত্র গৃহ-ভিত্তিকা, মাঝে মাঝে বেলোয়ারি আলোকাধার দীপালোকোদ্ভাসিত হইয়া নানা বর্ণের সৃষ্টি করিতেছে। সম্মুখে বৃহৎ দর্পণ, তাহার বক্ষে আপনার রূপরাশি ভাসিতেছে দেখিয়া মনোরমা প্রীত হইল। মনোরমা নিজের সৌন্দর্য্য নিজে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। চিত্রপটের সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনা করিয়া মনে ভাবিল, আমার এমন সুন্দর দেহ, এমন কমনীয় কান্তি, একটা অসভ্য বাঙ্গালের সহবাসে নষ্ট করিব ?—তাহা কখনই হইবে না।

মনোরমার পূর্ণ-যৌবন রূপতরঙ্গে ভাসিতেছে, তাহা কূলপ্লাবনী খরস্রোতার মত উচ্ছৃঙ্খল। মনোরমা ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিতা তাহার বাসনাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে সুরেশবাবুই শ্রেষ্ঠ পুরোহিত। আঁখি যাহাকে ভালবাসিবে, মনোরমা তাহাকেই তাহার অনিন্দ্যসুন্দর রমণীদেহ সমর্পণ করিবে।

সময় আর যায় না। কখন্ গৃহস্থ নীরব হইবে ? মনোরমা ঘড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল।

রাত্রি ক্রমে ক্রমে চারিটা বাজিল। সীতানাথ বাবুর বৃহৎ অট্টালিকা নীরব হইল। সদর-দরজা বন্ধ করিয়া দ্বারবানগণ নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতে লাগিল। তখন অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া সুখী ঝি ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে লইয়া মনোরমার গৃহে প্রবেশ করিল।

সুরেশবাবুকে দর্শন করিয়াই মনোরমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল। আনন্দোচ্ছ্বাসে তাহার বক্ষঃস্থল কাঁপিতে লাগিল। সযত্নে সুরেশবাবুর হাত ধরিয়া মনোরমা পালঙ্কে বসাইল।

ব্রাহ্মণ-কন্যা হইয়াও সর্ব্বনাশিনী তাহার সর্ব্ব-অঙ্গে কালি মাখিল; যৌবনের তপ্তরক্ত-স্রোতে আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়া গেল। একবারও মনোরমা মনে ভাবিতে পারিল না তাহার স্থিতি কোথায়? স্বেচ্ছাচারিণী অকুণ্ঠিত-চিত্তে তাহার নারী-জীবনের সার সামগ্রী একজন বিশ্বাসঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিল; রমণী-হৃদয়ের অমূল্যরত্ন অবহেলায় বিসর্জ্জন দিল; স্নেহময় জনক, স্নেহশীলা পিসীমাতা, রমণী-জীবনের আরাধ্য দেবতা স্বামী—সমস্ত ভুলিল। জ্ঞান, ধর্ম্ম, ভক্তি, ভয় তাহার লালসাগ্নিতে ভস্মীভূত হইল।

হায়! সুরেশবাবু একবারও মনে ভাবিলে না, তোমার অনুগতা পত্নী তোমার অপেক্ষায় কোথায় বসিয়া আছে? অহো! সুরেশের সে ভাবনা কোথায়? মনোমোহিনী সুন্দরী তাঁহার হাত ধরিয়াছে, তিনি কীর্ত্তি, যশ, মনুষ্যত্ব সমস্ত বিসর্জ্জন দিলেন। রূপময়ীর রূপবিভায় তাঁহার চক্ষু অন্ধ হইল।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বামি-হস্তচ্যুত সুখদার মৃতবৎ দেহ গঙ্গা-সলিলে ভাসিতে ভাসিতে এক কূলে গিয়া স্পর্শ করিল। তাহার অনতিদূরে জমিদার রামকানাই বাবুর বাগানবাটী। রামকানাই বাবু প্রত্যহ প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সময় গঙ্গাতীরে বিচরণ করিতেন। ভ্রমণ-কালে দেখিতে পাইলেন, তরঙ্গোত্থিত সুখদার মৃতবৎ দেহ জাহ্নবীপুলিনে শোভা পাইতেছে। তাঁহার মনে হইল, তখনও সে দেহে প্রাণ আছে। রামকানাই বাবু নিকটে গিয়া দেখিলেন, হৃৎপিণ্ড অল্প নড়িতেছে, শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়াও মৃদুভাবে চলিতেছে। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী দুই চারি জন লোককে ডাকিলেন। তাহাদেরই যত্ন ও শুশ্রূষার গুণে সুখদা অল্পে অল্পে চৈতন্যলাভ করিলেন। ব্রজহরি নামক এক ব্যক্তি সেই সব কার্য্যে সিদ্ধহস্ত ছিল। বস্তুতঃ তাহারই যত্নে সুখদা প্রাণ পাইলেন।

রামকানাই বাবু সুখদাকে তাঁহার বাগানবাটীর দ্বিতলোপরি প্রকোষ্ঠে আশ্রয় দিলেন। সেইখানে থাকিয়া দুই চারি দিন পরে তিনি সামর্থ্য ফিরিয়া পাইলেন। আবার তাঁহার পূর্ব্ব-লাবণ্য ফিরিয়া আসিল।

সুখদার মনোমোহন রূপে মুগ্ধ হইয়া নরকুলগ্লানি রামকানাই আতিথ্য-ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিল। তাঁহার রূপের আগুনে পতঙ্গ-বৎ পুড়িয়া মরিতে দুর্ব্বৃত্তের আকাঙ্ক্ষা হইল। তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্য পাপিষ্ঠকে উন্মত্ত করিল। দয়া, ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া নরাধম শরণাগত ব্রাহ্মণকন্যার প্রতি পাশবিক অত্যাচার করিতে সংকল্প করিল।

"এই জন্যই কি বেঁচে উঠ্‌লেম?"—সুখদা মনে মনে ভাবি-লেন, "এই জন্যই কি বেঁচে উঠ্‌লে? আবর্ত্তময়ী ভাগীরথীর উত্তাল তরঙ্গ-মুখে ভেসে যাচ্ছিলেম, মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেম, তার পর এই জন্যই কি বেঁচে উঠ্‌লেম? এই অপমান, এই নিদারুণ অত্যাচার এই বিষম কটূক্তি সহ্য কর্‌তেই কি বেঁচে উঠ্‌লেম?'

স্বামীর কথা সুখদার মনে পড়িল। ইন্দীবরনয়ন ভেদ করিয়া অশ্রুজল ঝর ঝর করিয়া ঝরিল। সুখদা মনে করিলেন 'ছার প্রাণ কেন বেরুলো না? আবার কেন প্রাণ পাইলাম? যদি প্রাণ পাইলাম, তা হ'লে স্বামীকে পাইলাম না কেন?" আমার অমন স্বামী! কত জন্মজন্মান্তরের তপস্যার ফলে তাঁহার দাসী হয়েছিলেম। আজ তিনি কোথায়? আমার চির-মধুর, চির-সুন্দর, আমার সর্ব্বসুখের আকর, নয়নাভিরাম স্বামী কোথায় আছেন? আদরে অনাদরে, সুখে দুঃখে, সোহাগে অভিমানে, সকল সময়, সকল অবস্থায় যাঁর সঙ্গে এত দিন কাটিয়েছি, আজ তিনি কোথায়? সর্ব্বগ্রাসিনী ভাগীরথীর গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়েছি, অস্তিত্বে কিছুমাত্রও বিশ্বাস নেই, তবুও প্রাণ ধ'রে আছি, সে কি এই জন্য? পিশাচপ্রকৃতি ব্যভিচারীর ব্যঙ্গোক্তি শুন্‌বার জন্যই কি ছার প্রাণ এখনও রেখেছি?"

সুখদা মনে ভাবিলেন, 'যদি বাঁচিয়া উঠিলাম, তবে হে ভগবান্, আমাকে এমন কল্লে কেন? এক জন হৃদয়হীন পাষণ্ডের কাছে প্রাণ পেলাম কেন? যদি এ হতভাগিনীকে জীবন্তে দগ্ধ কর্‌বার তোমার এত অভিলাষ হয়েছিল, যদি তার সর্ব্বাঙ্গ-পূর্ণতার তোমার এত ঈর্ষা হয়েছিল, তার আনন্দময়ী প্রকৃতিতে কালি ঢেলে দিতে তোমার এত সাধ গিয়েছিল,হায়, নাথ, সে কি তার সমস্ত প্রাণের সারটুকু কেড়ে নিয়ে হয়নি? আর কি কেউ লোক ছিল না যে, একজন নিষ্ঠুর, পিশাচ, নরদেহে রাক্ষস, তার কৃপায় তাকে তোমার অনন্ত লীলার প্রধান উপাদান ক'রে হতভাগিনীকে বাঁচালে?'

সুখদা চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। কি হ'বে? দুর্ব্বৃত্ত বলিয়া গিয়াছে, আবার ফিরিয়া আসিবে। হায়, কি করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিবেন? ব্রাহ্মণ-কুলের মর্য্যাদা—রমণী-দেহের পবিত্রতা কি করিয়া রক্ষা করিবেন? নারায়ণ! তুমি মাত্র ভরসা শরণাগত ব্রাহ্মণ-কন্যাকে তুমিই রক্ষা কর। মা সতীকুলরাণি, সতীর মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে তুমি দশ হস্তে দশ-প্রহরণ-ধারিণী, এ অভাগিনী নন্দিনীকে তুমি মা রক্ষা কর।

সাধ্বী নারীর অসাধ্য কি? কালের করাল গ্রাস হ'তে আপনার প্রিয় বস্তুকে কাড়িয়া লয়। তাহার দীর্ঘনিশ্বাসে পল্লবিত বৃক্ষ মুহূর্ত্তে শুকাইয়া যায়। সোনার সংসার দুই দিনে ছারখার হয়। নারী কোমলতাময়ী, প্রকৃতি-গঠিতা করুণা-প্রতিমা - বিশ্বস্রষ্টার অতুলনা ছবি। কিন্তু আবার কি ভীষণা—অত্যাচার-পীড়িতা সেই নারীর নয়নাগ্নিতে সহস্র দাবানলের সৃষ্টি হয়।

সন্ধ্যার পর আবার রামকানাই আসিল। ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে সুখদা ভগবান্‌কে ডাকিলেন।—'হে নারায়ণ! আমাকে রক্ষা কর, হে ভগবান্, আমি অবলা স্ত্রীলোক, আমার সর্ব্বস্ব অপহৃত হয়, আমায় রক্ষা কর।'

রামকানাই সুরাপান করিয়া আসিয়াছিল। কামোন্মত্ত নরপিশাচ সুখদার শয্যার উপর গিয়া বসিয়া পড়িল। সঙ্কুচিতা হইয়া সুখদা সরিয়া দাঁড়াইলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া রামকানাই সুখদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুখদার পদ্মপলাশলোচন দীর্ঘায়ত, জ্যোতি উজ্জ্বল অথচ করুণা-ব্যঞ্জক। রামকানাই নম্রভাবে তাঁহাকে বলিল,"আমার প্রতি তুমি এত নির্দ্দয় কেন?"

সুখদা স্থিরভাবে তাহার কথার উত্তর দিলেন, "কে বলে, আমি আপনার প্রতি নির্দ্দয়? আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য দ্বারা আপনার উপকার করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এই রাত্রিকালে আপনি আমার এই গৃহে আমাকে একাকিনী দেখে কি জন্য এসেছেন? আপনার এ সময় আসাটা ভাল দেখায় না, আপনি এখনই চ'লে যান।"

রামকানাই হাসিয়া বলিল, "ঘড়-বাড়ী তোমারই। সে কথা মন্দ নয়।"

সুখদা। ঘর-বাড়ী আপনার নয়'ত কি আমার বল্‌ছি? কিন্তু যখন আমায় থাক্‌তে দিয়েছেন, যে কয়দিন আমি আপনার ঘরে থাক্‌ব, সে কয়দিন আমার ত।

রাম। তুমি চিরকাল থাক্‌তে পার, আমি কখন আমার বল্‌ব না; কিন্তু আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। তোমার রূপ দে'খে আমি পাগল হয়েছি।

সুখদা। আমাকে সেরূপ নীচপ্রকৃতির স্ত্রীলোক বিবেচনা করবেন না। সহস্র চেষ্টাতেও আপনি আমার কোন ক্ষতি করতে পারবেন না।

রাম। আমি তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করতে চাই না। তোমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার ক'রে তোমার ভালবাসা লাভ করব, ইহাই আমার ইচ্ছা।

সুখদা। আপনি আমার জীবন দান করেছেন, সুতরাং আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ, সে উপকারের প্রত্যুপকার করতে আমি ধর্ম্মের নিকট বাধ্য। কিন্তু আপনি মুহূর্ত্তের জন্যও মনে স্থান দেবেন না, আপনার প্রলোভনে প'ড়ে আমি আমার নারীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেব? আপনাতে আমাতে একত্রে স্থিতি এই নির্জ্জনে রাত্রিকালে এক মুহূর্ত্তের জন্যও উচিত নয়। আপনি এখনই প্রস্থান করুন।

নরপশু রামকান্ত সুখদার কথায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। ধর্ম্মের মহিমা সে কি বুঝিবে? আশৈশব বিলাসের ক্রোড়ে প্রতি-পালিত হইয়া কেবল অসৎপথে চলিয়াছে; সুতরাং সদুপদেশ তাহার কর্ণে স্থান পাইবে কেন?

সুরার মাদকতা-শক্তি, তাহার উপর সুখদার অপরূপ রূপ-মাধুরী দুর্ব্বৃত্তকে উন্মত্ত করিল। দয়া, ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব তাহার প্রচণ্ড কামানলে ভস্মীভূত হইল। সে তখন অশ্রাব্য অকথ্য কথায় সুখদাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তোমায় সাফ্ বল্‌ছি, তোমার রূপ আমায় উন্মত্ত করেছে, আমি প্রাণ থাকতে তোমার ছাড়তে পারব না।"

ঘৃণায় সুখদার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু তখনও তিনি

ধৈর্য্য হারাইলেন না ; তখনও আশ্রয়দাতা উপকারী ভাবিয়া রামকানাইকে বলিলেন,“ছি ছি। এই জন্যই কি আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন ? আশ্রয়হীনা ব্রাহ্মণকন্যা আপনার শরণাগত, তার প্রতি এরূপ কটূক্তি কি আপনার শোভা পায় ? মিনতি কচ্ছি, আপনার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি, আমায় অব্যাহতি দিন। জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন।”

রামকানাই বলিল, “তোমার জন্য আমি নরকে যেতেও ভয় করি না। তোমার পায়ে ধরি, আমার প্রতি বিরূপ হইও না।”

রূপোন্মত্ত রামকানাই সুখদার পদস্পর্শ করিতে উদ্যত হইল ; সুখদা কিঞ্চিৎ পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। রামকানাই আবার বলিল, “দেখ আমি তোমায় সর্ব্বস্ব দেব, দাস-দাসী, এলবাৎ-পোষাক, হীরা, মুক্তা, যত রকম অলঙ্কার আছে, যাহা রমণীর অঙ্গে শোভা পায়, তোমায় সব দেব। তোমায় সোনার অট্টালিকায় বসাইয়া রাখিব, আমি তোমার আজ্ঞাকারী ভৃত্যের মত তোমার মনোরঞ্জনার্থে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকব। তুমি যখন যা চাইবে, তৎক্ষণাৎ তা পূর্ণ হবে। তোমার হুকুমে আমার অধীনস্থ সমস্ত লোকজন ফিরবে, বল তুমি আমার হবে ?”

সুখদা ঘৃণাভরে উত্তর করিলেন, “আমি সুখ চাই না, ঐশ্বর্য্য চাই না, আপনার প্রদত্ত হীরা-মুক্তা এলবাৎ-পোষাক আমি কিছুই চাই না। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা, আর দরিদ্র ব্রাহ্মণের স্ত্রী ; ভগবানের কাছে কায়মনোবাক্যে আমি প্রার্থনা করি যেন, এই ভাবেই আমার মৃত্যু হয়। আপনাকে মিনতি কচ্ছি, আমাকে অব্যাহতি দিন। আমি আপনাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে চলে যাব।”

রাম। "তা হবে না। তোমায় সব দিতে পারি, তোমার জন্য সব কর্‌তে পারি, কিন্তু তোমায় বিদেয় দিতে পার্‌ব না। যেমন ক'রে হোক্, তোমাকে আমায় বশ কর্‌তেই হ'বে।"—তাহার পর পাপিষ্ঠ একটু হাসিয়া বলিল, "আমি তোমার মত কত মেয়েমানুষ বশ করেছি, আর তোমায় বশ কর্‌তে পার্‌ব না?"—এই বলিয়া নরাধম সুখদার দিকে পুনরায় অগ্রসর হইল।

সুখদার আর সহ্য হয় না। তাঁহার বুকের ভিতর আগুন জ্বলিতে লাগিল। তাঁহার সমস্ত শরীরে চিতানলের মত অগ্নি-প্রবাহ খেলিতে লাগিল। ক্রমেই রামকানাই উত্তেজিত হইতেছিল; বাধা-প্রাপ্ত হিংস্র জন্তুর ন্যায় ক্রমে সে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। জ্ঞান-ধর্ম্ম-মায়া-মমতা-বর্জ্জিত উন্মত্ত পশুর ন্যায় নরাধম সুখদাকে পুনরায় আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। সুখদা পরিত্রাহি চীৎকার করিলেন। তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহৃত হয়! সেই নির্জ্জন নিশীথে তাঁহার সেই কাতর আর্ত্তস্বর বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। নারীদেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া সুখদা রামকানাইকে দুই হস্তে ঠেলিয়া দিলেন। সে আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া পাষণ্ড পড়িয়া গেল। সুখদা মনে ভাবিলেন, নরপশুকে বধ করিয়া তিনি মুক্তি পাইতে পারেন। তাঁহার শক্তির নিকট দুর্ব্বৃত্ত তখন ক্ষুদ্র পতঙ্গের সমান। ইচ্ছা করিলে তাহাকে পদ-বিদলিত করিতে পারেন। কিন্তু নারী-হৃদয়ের সমস্ত কোমলতা বিসর্জ্জন দিয়া কি করিয়া নরহত্যা করিবেন? তাহার অপেক্ষা আত্মপ্রাণাবসর্জ্জনই শ্রেয়ঃ। ক্ষুদ্র নারী বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে ক্ষণস্থায়ী জলবুদ্বুদের মত মুহূর্ত্তের মধ্যে মিলাইয়া যাইতে পারে, তাঁহার মৃত্যুতে সংসারের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই।

রামকানাইয়ের নেশার ঘোর অনেকটা কাটিয়া গেল। শরাহত শার্দ্দূলের মত সে আরও ভয়ঙ্কর হইল। বাসনার আগুনে তাহার সর্ব্ব-অঙ্গ দগ্ধ-বিদগ্ধ হইতেছিল, তাহার সমস্ত শরীরে তড়িৎপ্রভা খেলিতেছিল। দুরাত্মা পাশবিক শক্তি চালিত করিতে সুখদার দিকে ধাবিত হইল।

শক্তিরূপিণী সুখদা উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "স'রে দাঁড়া পিশাচ! সতী নারী সিংহিনীর বল ধারণ করে।"

কিছুক্ষণের জন্য রামকানাই স্তম্ভিত হইয়া সুখদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জবাপুষ্পের মত ক্রোধে আরক্তবর্ণ সুখদার নেত্র হইতে যেন ভয়ঙ্কর দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছিল। গণ্ডস্থলে লোহিতাভা সুস্পষ্ট প্রকটিত। তাঁহার কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশরাশি মুখমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, যেন শৈবালজাল-পরি-বেষ্টিত প্রস্ফুটিত পঙ্কজ। রামকানাই তাঁহার এই ক্রোধোদ্দীপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া আরও মুগ্ধ হইল। তাহার অন্তর্নিহিত কামানল শিখা আরও জ্বলিয়া উঠিল।

কি উপায় করিবেন, কি করিয়া সেই পাপ-গৃহ হইতে বাহির হইবেন, সুখদা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। গৃহদ্বার বাহির হইতে আবদ্ধ। তখন একমাত্র উপায় দেখিতে পাই-লেন—জানালার নীচেই বৃহৎ দীর্ঘিকা,' জানালার উপর হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া সেই দীর্ঘিকার জলে পতিত হইবেন, আর ত কোন উপায় নাই!

তাহাই স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়া সুখদা বাতায়ন-পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বহুদূর-বিস্তৃত দীর্ঘিকার সলিলরাশি মৃদু-সমীরণ-সঞ্চালিত হইয়া কাঁপিতেছে,

লক্ষ লক্ষ তারকারাজি তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রতিবিম্বিত। মরণ ত অতি সুখের, তাঁহার বিন্দুমাত্রও মৃত্যুভয় নাই; কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে জানিতে পারিলেন না, তাঁহার স্বামী জীবিত কি মৃত? যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করা হইল না!

দুর্ব্বুদ্ধি রামকানাই সুখদার এই অসাবধানতায় সুযোগ পাইল। মুহূর্ত্তকালের জন্য সুখদা স্বামিচিন্তায় আত্মবিস্মৃত হইলেন। সেই অবকাশে পাপিষ্ঠ ত্বরিতপদে যাইয়া তাঁহার হাত ধরিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সুখদা আপনাকে মুক্ত করিয়া দীর্ঘিকা-জলে নিপতিত হইলেন।

রামকানাই সুখদার এই আকস্মিক পতনে একবার স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইল। দুর্ব্বৃত্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করে নাই যে, প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়া সুখদা এরূপভাবে আত্মবিসর্জ্জন করিবে। মনে ভাবিতে পারে নাই, সতী নারীর সতীত্বের নিকট তাহার প্রাণ অতি তুচ্ছ! তখন তাহার প্রাণে ভয় হইল, হয় ত তাহাকে খুনের দায়ে দায়ী হইতে হইবে। এই মনে করিয়া রামকানাই ত্বরিতপদে তাহার বাগানবাটী হইতে পলায়ন করিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ভজহরি ও সন্ন্যাসী ভোলানন্দ সরস্বতী সেই বাগানবাটীতে প্রবেশ করিলেন। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আসিতে পারিলেও বোধ হয়, তাঁহারা সুখদাকে রক্ষা করিতে পারিতেন। ভজহরির বাটী রামকানাই বাবুর বাগানের পার্শ্বেই। তিনি ভোলানন্দ সরস্বতীর মন্ত্রশিষ্য। আহারান্তে তাঁহারা বাটীতে আছেন, এমন সময়ে সুখদার আকুল চীৎকারধ্বনি তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। অনুমানে বুঝিতে পারিলেন, বাবুর বাগান-

বাটীতে অসহায়া কোন জলমগ্না রমণী আত্মরক্ষায় অসমর্থা হইয়া মানুষের সাহায্য ভিক্ষা চাহিতেছে। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহারা দুই জনে রামকানাই বাবুর বাগানবাটীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রামকানাই তাহার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তেই বাগানবাটী হইতে বাহিরে গিয়াছিল, সেই সঙ্গে বাগানের গেটও বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহারা পার্শ্বস্থ প্রাচীর উলঙ্ঘন করিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাটীর সদর-দরজাও বন্ধ। কিছুক্ষণ সজোরে দ্বারে আঘাত করিবার পর মালী দ্বার খুলিয়া দিল। তাঁহারা বলপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের সমস্ত শরীরের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। দুর্ব্বৃত্ত রামকানাইকে শাস্তি দিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহারা মুহূর্ত্তমধ্যে কর্ত্তব্য নিদ্ধারিত করিয়া দীর্ঘিকা-তীরে উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘিকাকূলে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, জীবনমৃত্যুর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সুখদা আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার হস্ত-পদ প্রায় অবশ হইয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে ভজহরি জলে ঝাঁপ দিয়া তাঁহার অবশ দেহ তুলিয়া লইয়া তীরে উঠিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের অসাধরণ গুণে এবং ভজহরির যত্নে সুখদা সত্বরেই সুস্থ হইলেন।

ভজহরি রামকানাই বাবুর উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন। এতদিন ধরিয়া রামকানাই বারবনিতা লইয়া তাহার উদ্যানবাটীতে নির্ব্বিবাদে নানাপ্রকার কুৎসিত আমোদ করিয়াছে। ভজহরি তাহাকে বন্ধুভাবে অনেক সময় অনেক সদুপদেশ দিয়াছেন, উচ্ছৃঙ্খল যুবক তাঁহার সারগর্ভ হিতোপদেশে কর্ণপাতও করে নাই। সেই হেতু তিনিও আর রামকানাইকে বেশী কিছু

বলিতেন না। এখন এই সাধ্বীর প্রতি এরূপ অন্যায় অত্যাচারে তিনি রামকানাইয়ের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। স্বার্থানুসন্ধানে অর্থশালী লোকের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে তিনি কখন রামকানাই বাবুর নিকট যাইতেন না। রামকানাই বাবু তাঁহার স্বজাতি, দেশের জমিদার এবং তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। এই সমস্ত কারণে তাঁহাকে অধঃপতনের পথ হইতে টানিয়া আনিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, অধঃপতনের পথ হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনা দুঃসাধ্য, তখন হইতে তাহার সংস্পর্শ ত্যাগ করিলেন; ইচ্ছাপূর্ব্বক কখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। সুখদা চৈতন্য লাভ করিয়া রামকানাই বাবুর বাগানবাটীতে উপনীত হইবার পর ভজহরি সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ রহিলেন। সুখদার প্রতি রামকানাই বাবুর অত্যাচার করা বিচিত্র কথা নয়, কারণ, সুখদা অসামান্যা সুন্দরী এবং পূর্ণযুবতী। তাই তিনি ব্রাহ্মণ কন্যাকে উদ্ধার করিবার জন্য সর্ব্বদা সতর্ক রহিলেন।

ভজহরি যখন দেখিলেন, সুখদা সুস্থ হইয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মা! আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তা হ'লে আমার বাটীতে আপনার পদধূলি পড়িলে আমি কৃতার্থ হইব।"

তাঁহার মাতৃ-সম্বোধনে প্রথম সুখদার জীবনে অপত্য-স্নেহের সঞ্চার করিল। সুখদা ভাবিয়া দেখিলেন, উপস্থিত ভজহরির গৃহ ব্যতিরেকে আর তাঁহার স্থান কোথায়?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মনোরমা কুল হারাইল। ক্ষণস্থায়ী যৌবন-স্রোতে ভাসিয়া রমণী-জীবনের সারধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিল। ভ্রান্ত হৃদয়ে বাসনারাশি ফুটিয়া উঠিল। তাহাকে সহস্র দিক্ হইতে সহস্র প্রলোভন সহস্র কারে প্রলুব্ধ করিল। মনে ভাবিল, বড়ই সুখ, বড়ই আনন্দ! মুগ্ধা নারী বুঝিতে পারিল না যে সে সুখ, সে আনন্দ অতি অল্পক্ষণস্থায়ী।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে; কিন্তু কে বলিতে পারে, চাঁদের শোভা কতক্ষণ? চারুহাসিনী ফুল্লযামিনীর মনোমোহিনী শোভা ক্ষণেকের মধ্যে অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া মনোরমা বাকী রাখিল কি? নারী-হৃদয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষার ধন সে স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিল। অমন স্নেহশীল স্বামী—চরিত্রগুণে যিনি দেবতারও শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে লইয়া কুল-কলঙ্কিনী মনোরমা বাস করিতে পারিল না। যিনি সর্ব্বরকমে, সর্ব্বগুণের আদর্শ স্বরূপ, মন্দভাগিনী তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। তাই লজ্জা, ধর্ম্ম, ভয়, রমণী-হৃদয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন অবহেলায় বিসর্জ্জন দিল। একবারও তাহার মনে হইল না, সকল বিষয়েরই সীমা আছে।

প্রতি রাত্রেই ডাক্তার সুরেশ বাবু মনোরমার গৃহে আসিতে লাগিলেন। পরিচারিকা সুখী দূতীর কাজ করিত। এ প্রকার কার্য্যে যে বিশেষ পটু। মনোরমার আসক্তি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তাহার তপ্ত হৃদয়ে সুরেশ বাবুর ভালবাসা যেন স্নিগ্ধ

সুধা। তাহার আকাঙ্ক্ষার অনলে আহুতি দিতে সুরেশ বাবু প্রধান পুরোহিত। তাহার তৃষিত প্রাণে তাঁহার প্রেম মন্দাকিনীর পীযুষ-ধারা। পাপিষ্ঠা মনোরমা সমস্ত ভুলিল, লজ্জা সরম, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্ত ভুলিল, ভুলিয়া গেল সে কে কোন্ মহৎ-কুলসম্ভূতা।

হে ভগবান্, তোমার সৃষ্টিতে এমন তারতম্য কেন? হরেন্দ্রকুমারের মত নির্ম্মল হৃদয়ে মনোরমার পাপ-চিত্রের ছায়া পড়িল কেন? সহধর্ম্মিণীর কলুষিত কার্য্যে লোক-সমাজে তাঁহার উচ্চ মস্তক কেন অবনত হইল? কে উত্তর দিতে পারে? বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণসন্তান হরেন্দ্রকুমারের ইহা কোন্ কর্ম্মের প্রতিফল?

সচ্চরিত্র সুরেশ বাবু সমস্ত ত্যাগ করিলেন। চরিত্র-ভ্রষ্ট নীচাশয়ের মত তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই আতঙ্কে কাঁপিতে লাগিল। এ অবৈধ প্রণয়ের পরিণাম কোথায়, এ কথা যখন তাঁহার মনের মধ্যে উদয় হইত তখন তাঁহার অন্তর শুকাইয়া যাইত। তবুও ত তিনি সে পাপ-পথ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না। প্রস্ফুটিত কুসুম-কোমলা মনোরমার সুকোমল সৌন্দর্য্য-চিন্তা তাঁহার সর্ব্বশরীর প্রদীপ্ত করিয়াছে। তাহার লালসাগ্নিতে তিনি ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরিবেন, তবুও নিবৃত্ত হইবার উপায় নাই। তাহার আকর্ষণী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তিনি নরকের পথে যাইতেও প্রস্তুত। আর তাঁহার কোন রকমে উদ্ধার নাই। রূপ, যৌবন, সুখ, ঐশ্বর্য্য একাধারে। তিনি কোন মতে আত্মপ্রবোধ দিতে পারিলেন না। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাঁহাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষা বাড়িতে লাগিল। অতৃপ্ত যৌবনের বাসনা-কুসুম একে একে ফুটিতে

লাগিল। ধৈর্য্যের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে, ইচ্ছা করে, অহোরাত্র দুই জনে একত্রে অবস্থিতি করেন।

লোকচক্ষের অগোচরে অধিক দিন আর এ সুখভোগ হয় না। পাপকর্ম্ম যতই কেন প্রচ্ছন্নভাবে হউক, ক্রমেই তাহা লোকের কর্ণগোচর হয়। কিন্তু তবুও ত মন মানে না। এক দিনের বিচ্ছেদ যেন এক যুগ বোধ হয়। মনোরমাকে না দেখিয়া ডাক্তার বাবু থাকিতে পারেন না, আর ডাক্তার বাবুকে না দেখিয়া মনোরমা থাকিতে পরে না। সুরেশ বাবু ভাবিয়া দেখিলেন, ইহার এক উপায় আছে। মনোরমাকে গৃহত্যাগিনী করিতে পারিলে তিনি নির্ভাবনায় পরম সুখে থাকিতে পারেন। সুরেশ বাবু আরও মনে করিলেন, তাহার অনেক টাকা, তিনি সমস্ত জীবনে তাহা সঞ্চয় করিতে পারিবেন না। কুলত্যাগিনী স্বৈরিণীর সর্ব্বৈশ্বর্য্যের তিনিই একমাত্র অধিকারী।

এক দি· মনোরমার নিকট সুরেশ বাবু এই প্রস্তাব করিলেন এবং তাহাকে স্পষ্ট বলিলেন, এরূপ গোপনে যাওয়া আসা আর তার চলে না। অতএব মনোরমার গৃহত্যাগ করাই উচিত। মনোরমাও ভাবিয়া দেখিল, সেই যুক্তিই উত্তম। লোকলজ্জার ভয় সকলেরই আছে। দুশ্চারিণী শেষে উপপতির প্রস্তাবে সম্মতা হইল। তখন উভয়ে মিলিয়া যুক্তি করিয়া দিন স্থির করিলেন এবং সময় ঠিক করিয়া রাখিলেন, কখন্ যাত্রা করিতে হইবে।

কুক্ষণে মনোরমা ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিল। কুক্ষণে সুরেশ বাবু হুগলীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই একবারও ভবিষ্যতের দিকে চাহিলেন না। সকল সুখেরই সীমা আছে

তখন তাঁহাদের কি গতি হইবে? মনোরমা ভাবিল, তাহার সঙ্গে অনেক অর্থ, সারা জীবনেও তাহা ফুরাইবে না। তখন তাহার একবারও মনে হইল না, এ অর্থ কতক্ষণ, সূর্য্যোদয়ে শিশিরের মত ক্ষণেকের মধ্যেই শুকাইয়া যাইতে পারে।

সমস্ত দিন ধরিয়া মনোরমা যাইবার জন্য আয়োজন করিল। গোপনে গোপনে তাহার সমস্ত দ্রব্যই গোছাইয়া লইল। তাহার মাতার বহুমূল্যের রত্নালঙ্কার, তাহার নিজের সমস্ত অলঙ্কার, তাহার পর তাহার পিতামহের ও পিতার প্রদত্ত তাহার নিজ নামের পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ। মনোরমা সমস্ত দ্রব্য সজ্জিত করিয়া রাখিল।

সন্ধ্যা হইল। মনোরমা সুখীকে ডাকিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেল। তাহাকে আপনার বিছানায় বসাইয়া নিজে তাহার পার্শ্বে বসিল। সুখী এতটা খাতিরের কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মনে করিল, নিশ্চয় ইহার ভিতর কোন গূঢ়ত্ব আছে।

মনোরমা সুখীকে বলিল, "দেখ, সুখী, তোকে আমি ঝি ব'লে মনে ভাবিনে।"

সুখী হাসিমুখে বলিল, "তা কি আমি জানিনে দিদিমণি, তুমি আমাকে যে রকম ভালবাস, তা আমি বরাবরই জানি।"

মনো। তুইও ত আমাকে সেই রকম ভালবাসিস্।

সুখী। তা নইলে তোমার জন্য এত করি?

মনো। আরও এক কাজ তোকে করতে হবে।

সুখী। কি কাজ দিদিমণি?

মনো। আমার সঙ্গে তোকে যেতে হবে।

কথা শুনিয়া সুখী চমকিত হইল। বুঝিতে পরিল, তাহাকে কোথায় যাইতে হইবে। আরও বুঝিল, তাহার স্বহস্ত-রোপিত বৃক্ষে ফল ধরিয়াছে। এত দিনে তাহার মনের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তখন সে নেকী সাজিয়া মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিল 'কোথায় যেতে হবে দিদিমণি ?'

মনো। আমি তোকে যেখানে নিয়ে যাব।

সুখী। তুমি কোথায় যাবে ?

মনো। তীর্থ কর্‌তে। কেন, আমার সঙ্গে যেতে তোর ভয় হয় নাকি ?

সুখী। তীর্থ কর্‌তে যাব, তাতে আর ভয় কি ? কোথায় যাবে, সে তীর্থ স্থান ?

মনো। বাড়ী থেকে বেরোবার পর বুঝ্‌তে পার্‌বি।

সুখী। তার আগেই না হয় বুঝ্‌লুম।

মনো। কেন, আমাকে কি তোর বিশ্বাস হয় না ?

সুখী। তোমাকে বিশ্বাস হবে না ত কাকে বিশ্বাস হবে দিদিমণি ? তা যাক্, সেথো হবেন ত ডাক্তার বাবু ?

মনোরমা হাসিয়া বলিল, "ডাক্তার সঙ্গে না গেলে ওষুধ দেবে কে ? শুনেছি, সেখানে গেলেই লোকের রোগ ধরে।"

সুখী। তবে আমি যাব না। ডাক্তার বাবু তোমায় যেন ওষুধ দে ভাল কল্লেন ; কিন্তু আমাকে দেখ্‌বার যে একজন লোকও নেই।

মনো। লোকের ভাবনা কি ? তখন দেখ্‌বি, তোর জন্যে কত ডাক্তার ব্যাকুল হবে।

সুখী। আমার আর রোগ নেই যে, ডাক্তার দরকার হবে। তা যাক্, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এ মতলব হ'ল কেন?

মনো। সত্য কথা বলতে কি, এখানে থাকা আর চলে না।

সুখী। কেন?

মনো। কেন? এত ভয়ে ভয়ে কি মানুষ থাকতে পারে? বিশেষতঃ সুরেশ বাবু বলেছেন, না গেলে আর তিনি আসবেন না। যদি সকলে জান্‌তে পারে, তখন কি মুস্কিলে পড়্‌তে হবে, বল্ দেখি?

সুখী। সে কথা ঠিক। কেবল তোমাদের মুস্কিল নয়, আমারও শুদ্ধ মুস্কিল। তা কোথায় যেতে মনস্থ করেছ?

মনো। যেখানে সুরেশ বাবু নিয়ে যান। তুই এখানেও যেমন ছিলি, সেখানেও তেমন থাক্‌বি।

সুখী। কবে যাবে?

মনো। কবে কি? আজই, আর একটু পরেই।

সুখী। গম্ভীরভাবে বলিল, "তা হ'লে আমি যেতে পার্‌ব না।"

মনো। কেন যাবি নি, তোর তাতে ক্ষতি কি?

সুখী। তোমার সঙ্গে গেলে লোকে মনে কর্‌বে, আমার জন্যই তুমি বেরিয়ে গেলে। তোমাকে কুপথে নিয়ে যাবার আমিই প্রধান কারণ।

মনো। সত্য ক'রে বল্ দেখি, আমার এ অধঃপতনের মূল তুই কি না?

সুখী। এ কথা জানে কে? তুমি কখন আমার উপর রাগ ক'রে নিজের কলঙ্কের কথা প্রকাশ কর্‌তে পার্‌বে না।

মনো। তার পর আমি যদি এখানে থাকি, আর এ কথা প্রকাশ পায়, তখন খোঁজ হ'লে কি জান্‌তে পার্‌বে না, তুই আমার কলঙ্কের মূল?

সুখী। আমি ঝি বই ত নয়। আমাকে না হয় জবাব দেবে। এর বাড়া আর ত কিছু কর্‌তে পার্‌বে না।

মনো। আচ্ছা, তোর এখানে থেকে লাভ কি?

সুখী। তোমার সঙ্গে গিয়েই বা লাভ কি? মিথ্যে কেন কলঙ্কের ভাগী হই?

মনো। তোর যাতে লাভ হয়, আমি তাই কর্‌ব।

সুখী। কি কর্‌বে, আমাকে আগে বল।

মনো। তোর যাতে পোষায়, আমি তাই কর্‌ব। আমি তোর মাইনে বাড়িয়ে দেব।

সুখী। তাতে আর কি লাভ?

মনো। কেন?

সুখী। আমার এখানকার চাকরী চিরদিনের, কিন্তু তুমি চিরদিন রাখ্‌বে, তার বিশ্বাস কি?

মনোরমা হাসিয়া বলিল, "ভয় নেই, আমি তোকে কখনও জবাব দেব না।"

সুখী কিন্তু তাহার উত্তরটা অন্য অর্থে ব্যবহার করেছিল, পাঠক তাহা পরে জানিতে পারিবেন।

সুখীকে না হইলে মনোরমার চলে না। তাহার পরিচর্য্যা-গুণে পাপিষ্ঠা বিলাসিনীর নরক-গমনের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। আরও, তাহাকে রাখিয়া গেলে সে হয় ত তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা প্রকাশ করিবে। মনোরমা দেখিল, দু এক টাকায় তাহার

মন পাইবে না। সুখীও পণ করিল, এ সুযোগে কিছু রোজগার করিবে,—যাহাতে তাহার ভবিষ্যতে চাকরী না করিয়া অনায়াসে চলিতে পারে। অবশেষে সুখীরই জয় হইল। মনোরমার নিকট গহনাতে ও নগদে সে প্রায় পাঁচ শত টাকা আদায় করিল।

নির্দ্ধারিত সময়ে সুরেশ বাবু উপস্থিত হইলেন, অনেক অর্থ লইয়া মনোরমা গৃহ ত্যাগ করিল। তখন অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত-প্রায়। সুপ্ত-জগতের গভীর নিস্তব্ধতা সমস্ত প্রাণীতে ব্যস্ত। নির্ব্বিকার-চিত্তে মনোরমা সুরেশ বাবুর হাত ধরিয়া চলিল। তাহাদের গাত্রে যেন অন্ধকার আরও মিশিয়া গেল।

মাথার উপর উদার অনন্ত আকাশ। বিস্মিত-নেত্রে তারকাবলী চাহিয়া দেখিতেছে, দিবসের কার্য্য-অবসরে মানুষ কোন্ ভাবে কি কার্য্যে নিযুক্ত? একটা পেচক মনোরমার মাথার উপর দিয়া কর্কশ-কণ্ঠে ডাকিয়া গেল। মনোরমার প্রস্তরবৎ কঠিন হৃদয়ও সেই শব্দে চমকিত হইল।

গঙ্গাতীরে নৌকা বাঁধা রহিয়াছে। মনোরমা, সুখী ঝি আর ডাক্তার সুরেশ বাবু তিন জনে নৌকায় উঠিলেন। সেই নিস্তব্ধ গঙ্গাবক্ষ ভেদ করিয়া তাহাদের পাপ-কার্য্যের সহচরীস্বরূপ তরণী ছুটিয়া চলিল। কোথায় যাইবে?—নরকের পথে

বাল্যাবধি পিতৃ স্নেহে প্রতিপালিতা মনোরমা একবারও তাহার পিতার কথা মনে করিল না। মাতৃহারা কন্যা পিতৃ-স্নেহে শৈশবে মাতার অভাব জানিতে পারে নাই, সংসারের কোন অভাবই জানিতে পারে নাই, আজ তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার চক্ষে এক ফোঁটাও জল পড়িল না।

প্রতিদিন যে ভাবে প্রভাত হয়, সে দিনেও সেইরূপে প্রভাত প্রভাত হইল। সেইরূপ কাকলীর মধুময় তান উষার হিল্লোলে ভাসিতে ভাসিতে সুপ্তোত্থিত মানবের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিল। প্রাতঃক্রিয়া-সমাপনান্তে সীতানাথ বাবু বাহিরের কক্ষে গিয়া বসিলেন। নিধে বেহারা তামাক দিয়া গেল। তিনি গড়গড়ার মুখনলটি মুখে দিয়া অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে সুগন্ধি তামাকুর রসাস্বাদ করিতে লাগিলেন, আর মনে মনে কত সুখের চিত্র আঁকিতে লাগিলেন, এমন সময়ে বামা ঝি বাটীর ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল। তাহার মলিন মুখ ও ব্যস্ততা দেখিয়া সীতানাথ বাবু উদ্বিগ্নচিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ?" বামা সভয়-অন্তরে তাঁহাকে বলিল, "দিদিমণিকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।" সীতানাথ বাবু তাহার কথা ভাল রকম বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় তাহাকে বলিলেন,"কি বল্লি, দিদিমণিকে পাওয়া যাচ্ছে না ?" বামা পুনরায় বলিল,"দিদিমণিকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।" সীতানাথ বাবুর চমক ভাঙ্গিল। ব্যাপার কি, বুঝিবার জন্য তিনি অন্দর-মহলে ছুটিলেন। বাটীর ভিতরে তাঁহাকে দেখিয়া যোগমায়া দেবী কাঁদিয়া বলিলেন, "আমার মণি কোথায়, তাকে ত কোথাও দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।"

সীতানাথ বাবু সোৎকণ্ঠায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাগানে বেড়াতে যায় নি ত ?"

যোগ। না, সেখানে খোঁজা হয়েছে।

সীতা। সুখী জানে না কোথায় ?

যোগ। সুখীকেও ত দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।

সীতানাথ চমকিয়া উঠিলেন ;—বলিলেন, "সে কি ?"

যোগ। কি হ'ল ভাই, আমার মণি কোথায় গেল?

সীতা। আচ্ছা দেখ্‌ছি।

সীতানাথ বাহিরে গেলেন। মনোরমাকে অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে হাজির করিবার জন্য সকলের প্রতি হুকুম জারি করিলেন। আমলা, গোমস্তা, সরকার, দরোয়ান, বেহারা, বরকন্দাজ সকলেই শশব্যস্তে চারিদিকে ছুটিল। এমন সময় হাঁসপাতাল হইতে দরোয়ান ছুটিয়া আসিল, অনেক রোগী বসিয়া আছে, কিন্তু ডাক্তার বাবু কোথায়, কেহ সন্ধান পাইতেছে না।

সীতানাথ বাবু এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, ব্যাপার কি? দুনিয়া কেমন, এত বয়স পর্য্যন্তও ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। আপনার অবিমৃষ্যকারিতায় আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিলেন। নির্দ্দোষ জামাতার প্রতি নিষ্ঠুর পীড়ন, তাঁহার উপর অমানুষিক কঠোর অত্যাচার সমস্ত কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইল। এত দিন পরে তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

বহু বলশালী দোর্দ্দান্তপ্রতাপবান্ সীতানাথ রায়—যাঁহার ভয়ে সহস্র লোক নিত্য সশঙ্কিত, আজ তাঁহার অন্তঃপুরের পবিত্রতা একজন অতি সামান্য লোক—তাঁহার চাকরের চাকর অতি সহজে হরণ করিল। পুরুষপরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত যশের মন্দির এক ঝটিকাঘাতে একেবারে ধূলিসাৎ হইল। নিরুদ্ধ ক্রোধাবেগ অন্তঃকরণে স্ফীত হইতে লাগিল, প্রকাশ করিবার নয়। এতদিন পরে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী ঠাকুর সুখদাকে অধিক দিন ভজহরির গৃহে রাখা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না; ভজহরিও তাঁহার মতে মত দিলেন। পরিচয়ে বুঝিতে পারিলেন, সুখদা তাঁহারই শিষ্য সদানন্দের পরিণীতা ভার্য্যা। এই স্বেচ্ছায় গৃহীত ভার তিনি ত কোন রকমে পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

অনেক চিন্তা করিয়া সন্ন্যাসী স্থির করিলেন, সেই স্থান হইতে বিশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী মধ্যমগ্রামে তাঁহার আর এক মন্ত্রশিষ্য আছেন। তিনি পরিণতবয়স্ক, সাধু পুরুষ, জিতেন্দ্রিয় ও স্বধর্ম্ম-পরায়ণ। তাঁহার অবস্থাও স্বচ্ছল এবং নিজেও তিনি অতিথি-পরায়ণ। এই গুরু-প্রদত্ত ভার-গ্রহণে তিনিই একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। তাঁহার বহু জনপূর্ণ সংসার, তবুও সেখানে নিত্য শান্তি বিরাজ করে। সুখদাকে সেইখানে রাখা স্থির করিয়া, সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মধ্যমগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যথাসময়ে সন্ন্যাসী ঠাকুর মধ্যমগ্রামে রামকান্ত চট্টোপাধ্যা-য়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। গুরুদেবের আকস্মিক আগ-মনে পরিজনবর্গ সহিত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যার পর নাই আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহার নিকট সন্ন্যাসী ঠাকুর সুখদার পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে কন্যানির্ব্বিশেষে লালন-পালন করিতে অনুরোধ করিলেন; তাহার পর আপনার অভীষ্টস্থানোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের চারি পুত্র ও পাঁচ কন্যা। পুত্র-কন্যাগণের সকলেরই বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শোভনাসুন্দরী দেবী তাঁহার পুত্র-কন্যা সহিত ইদানীং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসারভুক্তা ছিলেন। তাহা ছাড়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার শ্বাশুড়ী, দুইটি বিধবা ভগিনী, একটি বিধবা ভাগিনেয়ী তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা পত্নী এবং আরও দুই চারি জন নিকট অথবা দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়া তাঁহার সংসার-ভুক্তা ছিল। অন্নদান করিতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কখন কাতর হইতেন না। সুখদাও তাঁহার পরিজনভুক্তা হইলেন। বাটীস্থ সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা-যত্ন করিতে লাগিল; তিনিও আপনার সরল-হৃদয়ের পরিচয় দিয়া সকলেরই প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গৃহিণীকে তিনি জননী সম্বোধন করিতেন, গৃহিণীও তাঁহাকে কন্যাবৎ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। সকলের অপেক্ষা শোভনাসুন্দরীর সহিত সুখদার অধিক সদ্ভাব হইয়াছিল। এই পরান্নপুষ্ট জীবনের ঘোরতর দুর্দ্দিনে সমদুঃখভাগিনী সঙ্গিনী শোভনা তাঁহার বিষাদপূর্ণ জীবনের কাহিনী শ্রবণ করিয়া অশ্রু-মোচন করিতেন। সমবয়স্কা সঙ্গিনীর নিকট আত্মনিবেদন করিয়া সুখদাও কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা বোধ করিতেন।

রাত্রি প্রায় প্রহরাতীত। পরিজনবর্গ সকলেই শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সুখদা শোভনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুখুয্যে মহাশয় এসেই যে চ'লে গেলেন, এক দিনও যে থাকলেন না?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শোভনা উত্তর দিলেন, "অনেক বল্লুম, কিন্তু কিছুতেই রইলেন না।"

সুখদা। তোমার মুখে শুন্‌তে পাই, প্রায় ছয় মাস পরে দেখা, কিন্তু এক দিনও রইলেন না। পুরুষ-মানুষ বড় নিষ্ঠুর!

শোভনা। না বোন্‌, এমন হৃদয়বান্‌ পুরুষ সংসারে নেই। দয়ার সাগর, বিপন্নের উদ্ধারকর্ত্তা। লোকের কষ্ট দেখ্‌লে তিনি চখের জল সংবরণ কর্‌তে পারেন না। কিন্তু—

সুখদা। কিন্তু ব'লে চুপ ক'রে র'লে যে?

শোভনা। কিন্তু বড় অভিমানী। এই অভিমানের বশবর্ত্তী হয়ে চিরটা জীবন কষ্ট পাচ্ছেন।

সুখদা। তাই ত ভাই, তা হ'লে ত তোমার বড় কষ্ট। আমি মনে করি, স্বামী স্ত্রীর নিমেষের অদর্শনও কষ্টকর।

শোভনা। কষ্ট! সে কথা আর জিজ্ঞাসা কচ্ছ? আমি কি না দেখেছি বোন্‌! সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেছে, রাজ-অট্টালিকা শ্মশানে পরিণত হয়েছে। চক্ষের উপর দেখ্‌লেম, আমার সোনার পুতলীকে নিয়ে শ্মশানে গেল। তার পর স্বামী থাক্‌তেও একরকম সংসারে অবলম্বন হীন হলুম।

সুখদা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "পুত্রশোক বড় কঠিন। কিন্তু বোন্‌, কখনও পুত্রস্নেহ বোধ কর্‌তে পার্‌লেম না।"

শোভনা সুখদাকে বলিলেন, "থাক্‌ আমার কথা। তোমার সধবার বেশ, তুমি কেন বোন্‌ স্বামিপরিত্যক্তা? আজ নিরাশ্রয়ার মত আমাদের বাটীতে আশ্রয় নিয়ে আছ। যখনি তোমায় এ কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি পরে বল্‌ব, ব'লে ওজর কর। আজ তোমাকে বল্‌তেই হবে।"

সুখদা। বোন্‌, আমার মত অভাগিনী সংসারে আছে কি

না, বল্‌তে পারিনে। আমি আমার সর্ব্বস্ব ভাগীরথীর গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়েছি। তবুও ত বোন্ প্রাণ ধ'রে আছি!

শোভনা। কিন্তু তোমার সধবার বেশ?

সুখদা। গুরুদেবের আজ্ঞা। তাঁর আশ্বাসবাণীতে আশ্বস্ত হয়ে এখনও আমি প্রাণ ধ'রে আছি। যাঁর একদিনের অদর্শনে চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌তুম, আজ কতদিন হ'ল, তাঁকে দেখিনি।

পূর্ব্বস্মৃতি আন্দোলন করিয়া সুখদা প্রাণে বড় ব্যথা পাইলেন। তখন ধৈর্য্যের বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। নীরবে তাঁহার চক্ষের জল গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল।

শোভনা। পূর্ব্বকথা আলোচনা ক'রে যদি প্রাণে কষ্ট পাও, তা হ'লে তোমার ব'লে কাজ নেই।

সুখদা। 'না বোন্, তোমার কাছে মনের কথা খুলে বলে প্রাণের বেদনা অনেক লাঘব হয়,'—এই বলিয়া সুখদা অকপটে তাঁহার নিকট নিজের সুখ-দুঃখ পরিপূর্ণ জীবনের কাহিনী প্রকাশ করিলেন। তাঁহার এই হর্ষবিষাদপূর্ণ বিবরণ শ্রবণ করিয়া শোভনা চমৎকৃত হইলেন; আগ্রহ সহকারে আপনার হাতের ভিতর তাঁহার হাত রাখিয়া বলিলেন, "বোন্, এ সংসারে তুমিই রমণী-রত্ন। তোমার তুলনা নাই, তোমার তুলনা তুমি। কিন্তু বোন্, আমি তোমায় বিশেষ বল্‌ছি, তোমার এ কষ্ট অধিক দিন থাকবে না। তুমি আবার তোমার স্বামীকে নিশ্চয় ফিরে পাবে, নিশ্চয় তিনি জীবিত আছেন, আর তোমারই মত তোমায় দেখ্‌বার জন্য কাতর। তোমার মনস্কামনা নিশ্চয় পূর্ণ হবে।"

সুখদা। প্রভু বলেছেন, আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে, দেববাক্য অটল; তুমি সতী, সতীর কথাও কখন নিষ্ফল হয় না;

কিন্তু আর ত আশার প্রতীক্ষায় থাক্‌তে পারি না। কত দিনে তাঁর দেখা পাব? তিনি কোথায় আছেন, জান্‌তে পারলে আমি ছুটে গিয়ে তাঁকে দে'খে আসি।

শোভনা। অতি সত্বরেই তুমি তাঁকে দেখ্‌তে পাবে। মহাপুরুষের বাক্য কখন নিষ্ফল হয় না।

সুখদা। সেই আশায় এখনও প্রাণ ধ'রে আছি। আজ কত দিন হ'ল, তাঁকে দেখিনি। ভগিনি! তুমি স্বামিপ্রাণা, তুমি স্বামীর মর্য্যাদা বুঝ্‌তে পার, তাই তুমি আমার ব্যথায় ব্যথী। যাকে এক দণ্ড না দেখ্‌তে পেলে, আমার এক যুগ ব'লে মনে হ'ত, সেই আমি আজ কতদিন হ'ল তাঁকে না দেখে প্রাণ ধ'রে আছি। বোন্‌, আমি বড় সুখে ছিলুম।

কোমলহৃদয়া শোভনাসুন্দরী সুখদার দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার সন্তাপিত প্রাণে শোভনা যেন স্নিগ্ধ বারিধারা, আদরে মিষ্ট কথায় তাঁহাকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

সুখদা বলিতে লাগিলেন, "বোন্‌, আমি কখন কষ্ট পাইনি, কোন অভাব আমার ছিল না, তাই কি আমার অদৃষ্টে এত কষ্টভোগ হ'ল? শৈশবের সমস্ত কথা আমার মনের মধ্যে জেগে ওঠে। তিনি আমাকে বড় ভালবাস্‌তেন, তাঁর ভালবাসার তুলনা নাই। ঠাকুর বলেছেন, তিনি নিরাপদে আছেন, তাঁর কথাতেই আশ্বস্ত হয়ে এখনও প্রাণ ধ'রে আছি, মনের মধ্যে এখনও তাঁর মিলনের সুখ বোধ কচ্চি।"

বাস্তবিকই তাই। আশার ক্ষীণরশ্মি তখনও পর্য্যন্ত অল্পে অল্পে সুখদার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছিল। কল্পনার মোহে কখ-

নও তিনি বিভোর হইয়া থাকিতেন; স্বামীর চরণতলে বিলীন হইয়া আত্মবিস্মৃত হইতেন; তার পরে চৈতন্যের আবির্ভাবে সে মোহঘোর কাটিয়া গেলে আপনাকে কুড়াইয়া পাইতেন। তাঁহার সে আনন্দ নাই, সে হাসি নাই, সে সুখ নাই, সে উৎসাহও নাই, জ্যোৎস্নাস্তে স্তব্ধ নিশার মত মলিন ছায়াখানি যেন তাঁহার স্বামীর অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইত।

সুখদার ইন্দীবরনয়ন ভেদ করিয়া অশ্রুজল ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। হৃদয়ের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। সমবেদনায় ব্যথিতা শোভনা-সুন্দরী অঞ্চলে তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন; মধুর-বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

সে দিন অনেক রাত্রি হইল। শোভনা সুখদাকে বলিলেন, "দিদি, আজ অনেক রাত হয়েছে। কাল তোমার কাছে আমার কথা বল্‌ব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"বড় সুন্দর শোভা!"—পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া সদানন্দ এই কথা বলিতেছিলেন। ঘাটের নাম দশাশ্বমেধ ঘাট।

বড় সুন্দর শোভা! পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে দাঁড়াইয়া সদানন্দ প্রকৃতির চারু চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। অনন্তে বিস্তৃত নীল নির্ম্মল অম্বরে অনন্ত শোভার আধার পূর্ণ-শশধর। আনন্দ-কিরণোচ্ছ্বাসিত গঙ্গানীরে চন্দ্রালোকচ্ছটা প্রতিফলিত। স্থানের পবিত্রতায় তাঁহার প্রাণ পূর্ণ হইল। মনোমোহিনী যামিনীর কি সুন্দর শোভা! শুভ্র-প্রকৃতির শ্যাম অঙ্গে কৌমুদীর হাসিরাশি ভাসিতেছে, যেন আপনার আনন্দে আকুল-প্রাণে সমস্ত জগৎকে হাসাইতেছে।

সেই শোভা দেখিয়া সদানন্দ মুগ্ধ হইলেন; আত্মবিস্মৃত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, আমার ইচ্ছা হয়, এই অনন্ত মোহ-ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকি। আত্মবিস্মৃত হয়ে অতীতের কথা ভুলে যাই।

দীর্ঘায়ত-নেত্রে সদানন্দ চাহিয়া দেখিলেন, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শোভিত বারাণসীর কি অপূর্ব্ব শোভা! সমস্ত জগতের প্রতিবিম্ব যেন তাঁহার সমস্ত হৃদয়ে প্রতিফলিত। দিনান্তে আকাশের মত যেন তাহা নানা বর্ণে চিত্রিত। পাপ-পুণ্য, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, চৈতন্য-মোহ যেমন আঁধারের পর আলোক, দিবার পর রাত্রি। যেমন নিদাঘের দিনান্তে সগর্ভা প্রমদার স্তনপ্রভার ন্যায় অথবা

নীলোৎপলপত্রের মত নব-কাদম্বিনীর কোলে সৌদামিনীর তীব্র হাসি। সদানন্দ বিস্মিত-নেত্রে দেখিতে পাইলেন, স্থাণুর ন্যায় উপবিষ্ট জ্ঞানময় মহাপুরুষ ভগবানের আরাধনায় আত্মহারা—আবার তাঁহারই পার্শ্বে পাপের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে নরকের জ্বলন্ত প্রতিকৃতি কামাদি ছয় রিপুকে সমভাবে আশ্রয় দিয়া আছে। আশ্চর্য্য, এমন স্থানে আসিয়াও ত পাপী মনের কালী মুছিতে পারে না।

সদানন্দ মনে ভাবিলেন, আমি ও আমার মনের কালী মুছিতে পারিলাম না। বিশ্বেশ্বরের রাজত্বে সকলেই হাসিতেছে, সকলেই আনন্দে ভাসিতেছে ; কিন্তু আমার হাসি জন্মের মত নিবিয়া গিয়াছে। আমার প্রাণে যতটুকু সুখ, যতটুকু আনন্দ, যতটুকু হাসি—সব গেছে, কেবল নিরানন্দ প্রাণে আনন্দ-স্মৃতি কখন কখন ভেসে উঠে !

প্রাণের ব্যথা জানাইবার আর স্থান কোথায় ? তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইবে, এমন লোকই বা আর কে আছে ? সেই পুণ্যময় ধামে, প্রকৃতির কোমল অঙ্কে আরোহণ করিয়া সদানন্দ তাঁহার প্রাণকে খুব উঁচু সুরে বাঁধিলেন ; ভক্তের ভক্তি-নৈবেদ্যের মত তাঁহার অন্তরের ভক্তিটুকু বিশ্বেশ্বরের চরণে নিবেদন করিয়া, তাঁহার চরণে প্রাণের বেদনা জানাইয়া তিনি প্রার্থনা করিলেন, 'হে দেব ! আমি যেন আপনার মনের শান্তি ফিরিয়া পাই।' ভগবান্ জানেন, তাঁহার অন্ধকারময় জীবনের আঁধার কখন ঘুচিবে কি না। এ সংসারে মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-অশ্রু, আনন্দ-নিরানন্দ সবই তাঁহার বিচারের ফল। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণে বসিয়া তিনি সমভাবে সকলের কার্য্যের বিচার করিতে-

ছেন। অজ্ঞ নর তাঁহার বিচারের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করে।

সদানন্দ মনে ভাবিলেন, গুরুদেব, আপনার বাক্য অবহেলা করেছি, স্পর্দ্ধা করেছিলাম, আমি আমার মনকে আয়ত্তাধীন কর্‌বো; কিন্তু প্রভু, মন ত আমার নিজের নয়। ক্ষমা কর দয়াময়; আমি পুণ্য চাহি না, আমায় আনন্দ ফিরে দাও। বুকের ভিতর হাত দিলে বুঝ্‌তে পারি, বুকটা আমার খালি হ'য়ে গেছে, মাথায় হাত দিলে জান্‌তে পারি, বিকৃত-মস্তিষ্কে আর আমার ধারণা-শক্তি নাই। এই উন্মাদ অস্থির চিত্তকে কি ক'রে সংযত করি? এ জীর্ণ হৃদয়ের সমস্ত শক্তি নির্গত হয়ে গেছে, কি নিয়ে প্রভু কার্য্যক্ষেত্রে পা ফেলব? —শক্তিহীন অকর্ম্মণ্য, জড়বৎ, নিস্পন্দ। হে ভগবন্! আমার অস্তিত্ব লোপ কর। আমার দ্বারা সংসারের কোন কর্ম্মই সাধিত হবে না। গুরুদেব, এই হতভাগ্য শিষ্য তোমার সারগর্ভ উপদেশের মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না। ক্ষমা কর প্রভু, যদি আমার প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ থাকে, তা হ'লে অশেষ যন্ত্রণা দাও, আমি বজ্রদগ্ধ জীর্ণ তরুর মত মাথায় বইব। শুষ্ক তরুর অনাবৃত তলে কে আশ্রয় গ্রহণ করে, তার জীর্ণ বক্ষে সামর্থ্যই বা কোথায় যে, সে অতিথিসৎকার ক'র্‌বে? পল্লবিত তরুচ্ছায়ে মধ্যাহ্ন-তাপিত পথিক ক্লান্ত-দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে, তার বুক-ভরা প্রেম, স্নিগ্ধতায় সমস্ত শরীর শীতল হয়।

চমকিতভাবে সন্ত্রস্ত-নেত্রে সদানন্দ চাহিয়া দেখিলেন। এ কিসের শব্দ! যেন কোন পীড়িতের আকুল যন্ত্রণাধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি উৎকর্ণ হইয়া স্থিরভাবে রহিলেন।

নিদারুণ ব্যাধিগ্রস্তের মর্ম্মন্তুদ বিলাপ! তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; শব্দ লক্ষ্য করিয়া ত্বরিত-চরণে সেই দিকে যাইলেন। যাহা দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইলেন।

সেই পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে সদানন্দ দেখিতে পাইলেন, গঙ্গা-সলিল-স্পৃষ্ট প্রস্তর-সোপানোপরি হরেন্দ্রকুমারের মৃতবৎ দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সদানন্দ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিলেন; কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া উপরে উঠিলেন। নিকটে তান্ত্রিক-প্রধান পূর্ণানন্দ সরস্বতীর আশ্রম। সদানন্দ হরেন্দ্রকুমারকে বহন করিয়া তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

পূর্ণানন্দ স্বামী সদানন্দকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন; শীঘ্র-হস্তে শয্যা রচনা করিয়া হরেন্দ্রকুমারকে শয়ন করাইলেন। সদানন্দ কাতর হইয়া স্বামীজীকে অনুরোধ করিলেন, "আমার বন্ধুকে বাঁচান।"

অবধূতাচার্য্য স্বামীজী হরেন্দ্রকুমারের গাত্রে হাত দিলেন। দেখিলেন, শরীরে উত্তাপ অধিক নাই। নাড়ী দেখিলেন, অত্যন্ত ক্ষীণ। রোগীর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ভাল বোধ হইল না। জ্বরত্যাগ হইবার পর কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে, কে বলিতে পারে? সদানন্দকে বলিলেন, "ইহাঁর অবস্থা ভাল দেখিলাম না। সান্নিপাতিক জ্বর, প্রায় চিকিৎসার বাহিরে। তবে মায়ের ইচ্ছা। এখনও স্থির করিয়া কিছু বলিতে পারি না।"

আকুল নয়নে একবার সদানন্দ স্বামীজীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। স্বামীজী বুঝিতে পারিলেন, পরদুঃখে কাতর

সদানন্দের হৃদয়ের যাতনা কত গভীর। তাই তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তুমি কাতর হইও না আমার দ্বারা যতদূর সম্ভবে, তাহার কোন ত্রুটি হইবে না।"

স্বামীজী পূর্ণকাম হইলেন। শক্তির প্রিয়তম পুত্র, তাঁহার সাধনায় মা কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? হরেন্দ্রকুমার অনেকটা সুস্থ হইলেন।

সদানন্দ ভক্তিভরে স্বামীজীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন; কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনার অনুকম্পায় আমার সোদর-প্রতিম সুহৃৎ হরেন্দ্রকুমার প্রাণ পাইলেন। আপনার অমোঘ ঔষধে তাঁর মৃতপ্রায় দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে। প্রভু, আপনার ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিব না।"

পূর্ণা। আমি উপলক্ষ্য মাত্র। মা আমার কার্য্যকরী-শক্তি, আমি মাত্র তাঁর দাসানুদাস।

স্বামী পূর্ণানন্দ সরস্বতী অসাধারণ পুরুষ। তন্ত্রবিদ্যায় সিদ্ধ; তাঁহার সমকক্ষ লোক বারাণসীধামে আর কেহই ছিল না। অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পূর্ণানন্দ যখন পঞ্চমুণ্ড-প্রতিষ্ঠিতা শক্তির সম্মুখে বসিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি প্রদান করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া কে বলিতে পারিত, ইনি সামান্য মনুষ্য মাত্র? প্রজ্বলিত হোমানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া তাঁহার অভিষিক্ত শিষ্যগণকে স্পষ্ট দেখাইতেন, অগ্নিশিখামধ্যে মায়ের জ্বলন্ত প্রতিমা!

সদানন্দ ঠাকুর কাশীধামে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীর আশ্রমে গমন করেন। তাঁহার বিবিধ গুণগ্রামে বিমুগ্ধ হইয়া স্বামীজী তাঁহাকে সন্তানের মত ভালবাসিতেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্বামীজীর কৃপায় এবং সদানন্দের শুশ্রূষায় হরেন্দ্রকুমার রোগ-মুক্ত হইলেন। আবার তাঁহার সামর্থ্য ফিরিয়া আসিল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। কেদারেশ্বরের আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে। বহুজনপূর্ণ বৃহৎ পুরী নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে। সদানন্দ ও হরেন্দ্রকুমার কেদার ঘাটের প্রস্তরসোপানে বসিলেন।

হরেন্দ্রকুমার বলিলেন, "আপনি যথার্থই আমার ভাই। আপনি না থাকিলে, দাদা, এ পৃথিবীতে আমার অস্তিত্ব-লোপ হইত।"

সদানন্দ হাসি-মুখে বলিলেন, "তুমি আমার ছোট ভাই।"

হরেন্দ্র। আপনি বড় ভায়েরই কাজ করেছেন, কিন্তু আমি ছোটর কিছুই করতে পারিনি।

সদা। সময়মত তুমিও করবে। মনুষ্য-জীবনে সুখ-অসুখ, বিপদ্-সম্পদ অবশ্যম্ভাবী। আমারও অসময়ে তুমি ভিন্ন আর আমার কে আছে?

হরেন্দ্র। ঈশ্বর না করুন্, কিন্তু দাদা, আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার বিপদ্ আপদে আমি যেন সর্ব্বাগ্রে বুক দিতে পারি। নারায়ণ করুন, যেন এ প্রবৃত্তির কখন না পরিবর্ত্তন হয়।

সদা। কি আশ্চর্য্য, যে সময় জীবনটা নিতান্ত অসার ব'লে আপনাকে ধিক্কার দিয়েছিলেম, সে সময়ই তোমাকে ওরূপ অবস্থায় দেখতে পেলেম। কর্ম্মহীন জীবন দুর্ভর বলে যে সময়

আপনাকে বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেম, তখন আমি কাউকে পাইনি, তুমিই তখন আমার একমাত্র অবলম্বন হলে।

হরেন্দ্র। দাদা, আপনার কথা শুনলে আমি যেন আত্ম-বিস্মৃত হই। কি পুণ্যফলে যে আপনার ভালবাসা পেয়েছি!

সদানন্দ হাসি-মুখে উত্তর দিলেন, "ঈশ্বর আমায় অবলম্বনহীন দেখে তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল এখন তুমি। কিন্তু তুমি যে অবলম্বনহীন হয়ে উদাসীনের ন্যায় জীবন যাপন করবে, এ আমার স্বপ্নের অগোচর।"

হরেন্দ্রকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অতীতের স্মৃতি তাঁহার হৃদয়কে বড় আন্দোলিত করিল। তাঁহার বুকভরা বাসনা ঈশ্বর একেবারে ধূলিসাৎ করিয়াছেন।

সমবেদনায় কাতর সদানন্দের হৃদয় হরেন্দ্রের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বড়ই ব্যাকুল। তিনি সান্ত্বনাচ্ছলে তাঁহাকে বলি-লেন, "যাক্, সে কথার এখন আর আন্দোলন করিয়া কোন ফল নাই!"

হরেন্দ্রকুমার বাধা দিয়া বলিলেন, "এ জীবনটা যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়। শৈশবে পিতা-মাতার আদরে প্রতিপালিত, এ জীবনে কত সুখই অনুভব করেছি, সমস্ত সংসার যেন মধুময়—আনন্দে ভরা। তার পর শৈশব-যৌবনের সন্ধিস্থলে এক অপূর্ব্ব আশালোকে আমার সমস্ত হৃদয় আলোকিত হয়েছিল। বুকভরা আশা নিয়ে, দাদা, আমি শ্বশুরালয়ে প্রবেশ কল্লেম। সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী আমার ক্রীড়াসঙ্গিনী, বিলাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণে সর্ব্বদা সজ্জিত রইলেম। তখন অভাব যে কি, এক মুহূর্ত্তের জন্যও বোধ

কর্‌তে পারিনি। দাদা, শ্বশুরের স্নেহ, যত্ন, তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা আমাকে মুগ্ধ কর্‌লে। কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পারিনি, এত শীঘ্র আমার অদৃষ্টে কেমন ক'রে এরকম পরিবর্ত্তন ঘট্‌লো"।

হরেন্দ্রকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ-ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সদানন্দ নির্ব্বাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। মনে ভাবিলেন এমন সুন্দর মুখ, এমন সরল চিত্ত, হে ভগবন্, তাতে এত কালী ঢেলে দিলে কেন? তোমার চরণে এমন কি অপরাধ করেছে যে, তাকে তুমি এত শাস্তি দাও?

হরেন্দ্রকুমার আবার বলিলেন, "শৈশবাবধি শ্বশুরালয়ে অনেক দিন প্রতিপালিত হয়েছি; কিন্তু কেহই আমায় এক-দিনের জন্যও স্নেহের চক্ষে দেখেননি। এক জন সামান্য স্ত্রীলোক, তার সামর্থ্য অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তার মহত্ত্বে আমার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ ক'রে রেখেছে। তা না হ'লে দাদা, জননীর মৃত্যুশয্যায় বুঝি উপস্থিত হ'তে পাত্তেম না। সে সব কথা মনে হ'লে এখনও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, পাষাণ-চক্ষে জননীর নিশ্চল দেহ দেখ্‌লেম। মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও তাঁর কাতর দৃষ্টি আমার মুখের উপর পড়েছিল। আশৈশব সমস্ত স্মৃতি আমার মনের 'মধ্যে জেগে উঠ্‌ল। কত কষ্টে, কত যত্নে মা আমায় প্রতিপালন করেছিলেন, অভাগা সন্তান - তাঁর কোন কার্য্যই কর্‌তে পার্‌লেম না। যদি আমায় ওরূপ ঘৃণিত-ভাবে আবদ্ধ থাকৃতে না হ'ত, তা হ'লে এত শীঘ্র বোধ হয়, মা আমাকে পরিত্যাগ কর্‌তে পার্‌তেন না। বাবার মুখে শুন্‌লেম, আমার চিন্তাতেই তাঁর রোগ বৃদ্ধি পায়, আর সেই রোগেই তাঁর

মৃত্যু হ'ল। বৃদ্ধবয়সে পত্নীবিয়োগশোক সহ্য কর্‌তে না পেরে পিতাও আমাকে পরিত্যাগ কল্লেন। দাদা, বল্‌তে গেলে আমিই আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর কারণ।"

সদানন্দ মিষ্টবাক্যে হরেন্দ্রকে বলিলেন, "বৃথা অনুতাপ, সরল-হৃদয় বালক, তুমি ত ভাই সংসারের ধারা কিছুই জানো না। অভাগা যেখানে যায়, অশান্তি শতফণায় তাকে বেষ্টন করে। শ্বশুর পিতৃস্থানীয়, তাঁর স্নেহ তোমার উপর ওরূপ ভাবে বর্ষিত হবে, এ যে স্বপ্নের অগোচর, এ কথা কি কল্পনাতেও কেউ ভেবেছে? সকলই তোমার অদৃষ্ট।"

হরেন্দ্র। অদৃষ্ট বটে, সে কথা স্বীকার করি। স্বীকার করি, আমার পিতা অর্থহীন, কিন্তু আপনিই বলুন, দুষ্কর্ম্মান্বিতের কার্য্যে দোষ দেব, না যে তার ফল ভোগ করে, তার দোষ দেব?

সদা। একজন গত কর্ম্মের ফল ভোগ কচ্ছে, আর একজন নূতন ক'রে নরকের পথ পরিষ্কার কচ্ছে।

হরেন্দ্র। মনে হয় না ত দাদা, এ জীবনে এমন কোন পাপ করেছি যে, তার জন্য আমায় এরূপ কঠোর শাস্তি পেতে হ'ল।

সদা। যদি আবার কখন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পাই, তিনি তোমার এ প্রশ্নের মীমাংসা কর্‌বেন। আমিও এক দিন তাঁকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। যে দিন ভাগীরথীগর্ভে সুখদাকে বিসর্জ্জন দিয়ে, সেই নিস্তব্ধ নদীতীর কম্পিত ক'রে ভগবানের নামে সহস্র দোষারোপ করি, সেই সময় তাঁকে দেখ্‌তে পাই।

হরেন্দ্র। এ সংসারে এমন লোকও থাকে, যার শরীরে দয়ার লেশমাত্র নাই?

সদা। এ সংসারে সবই আছে। যেখানে অমৃত, সেইখানে গরল, যেখানে স্বর্গ, সেইখানে নরক।

হরেন্দ্র। সবই ত এইখানে দেখ্‌তে পাই। কিন্তু দাদা, অধর্ম্মের দণ্ড কৈ? বরং ধর্ম্মের আগে অ দিয়ে কার্য্য কর্‌লে তার শ্রীবৃদ্ধি হয়।

সদা। দণ্ড ইহজন্মে না হয়, পরজন্মে হবেই।

হরেন্দ্র। সবই বুঝ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। মার কথা, বাবার কথা মনে হ'লে আর আমার এক দণ্ডও বাঁচ্‌তে ইচ্ছে হয় না। বাবাও যদি আর দিন কতক বাঁচ্‌তেন, তা হলেও আমি সংসারে আর দিন কতকের জন্যও স্থির হতে পাত্তেম।

সদা। কাল পূর্ণ হ'লে সবই চ'লে যায়। স্নেহের সমস্ত সূত্র দিয়েও ভালবাসার বস্তুকে আবদ্ধ করা যায় না। আমারও ভাই অতি অল্পবয়সে পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ হয়। এখনও তাঁদের কথা মনে পড়্‌লে আমি ত্রিভুবন শূন্য দেখি। সুখদা আমার সমস্ত কষ্টই দূর করেছিল, সংসারে আমার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল সে ছিল, ভাগ্যদোষে তাকেও হারালেম। সব যায়, স্মৃতি যায় না, ক্ষত ভাল হয়, কিন্তু তার দাগ থাকে।

হরেন্দ্র। দাদা, আমার ধ্রুব বিশ্বাস, বৌঠাকুরাণীকে আবার পাওয়া যাবে। আপনাকে চিরদিন কষ্ট দিলে ঈশ্বরের নামে কলঙ্ক হবে।

হরেন্দ্রকুমারের এই আশ্বাসবাক্যে সদানন্দের হৃদয়ে একটু

আশার সঞ্চার হইল; কিন্তু মন কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না। ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন হইবে!- কিন্তু কি জানি, মহাপুরুষের বাক্য।

হরেন্দ্র। মহাপুরুষের বাক্য নিশ্চল!

সদা। সবই তাঁর ইচ্ছা। যাক্, তোমার কথাই এখন জিজ্ঞাসা করি। তোমার এই অল্প বয়স, তুমি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, তোমার এই রকম অবলম্বনহীন হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ান শোভা পায় না।

হরেন্দ্র। আমায় কি কর্‌তে বলেন?

সদা। আমার বিবেচনায় তোমার আবার নারায়ণপুরে ফিরে যাওয়া উচিত।

বিস্মিত-নেত্রে হরেন্দ্রকুমার সদানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সদানন্দ গম্ভীর-ভাবে পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, "দোষ কি? তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন কর। ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে তুমি যাকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করেছ, বিনা দোষে তাকে একেবারে পরিত্যাগ করা ধর্ম্মসঙ্গত নয়।"

হরেন্দ্র। সে আমায় প্রত্যাখ্যান করেছে, বিশেষরূপে অপমান করেছে, আমি আবার উপযাচক হয়ে তার সংবাদ নিতে যাব?

সরল-হৃদয় সদানন্দ ঠাকুর বলিলেন, "সে তোমায় অপমান করেনি, তার পিতার দোষে সে কেন কষ্ট পাবে? এত দিন তুমি যাও নি, হয় ত তোমার অভাবে তার জ্ঞান ফিরে এসেছে। তুমি গিয়ে হয় ত দেখ্‌তে পাবে, অনুতপ্ত হৃদয়ে হয় ত সে তোমার অপেক্ষায় ব'সে আছে। এ রকম অনেক দেখা যায়।"

হরেন্দ্র। যেখানে অত লাঞ্ছনা ভোগ করেছি, অপমানের সীমা ছিল না, সেখানে আবার কি ক'রে যাব ?

সদা। আমি তোমায় শ্বশুরালয়ে বাস কর্‌তে যেতে বল্‌ছি না। তোমার ধর্ম্মপত্নীর উপর তোমার সম্পূর্ণ অধিকার। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদের বাটীতে গিয়ে বাস কর্‌তে পার।

হরেন্দ্র। সে কি আমার সঙ্গে যেতে স্বীকার কর্‌বে, না তার বাপ তাকে পাঠাবে ?

সদা। যদি তোমার স্ত্রী তোমার অনুগামিনী হয়, তোমার শ্বশুর সহস্র চেষ্টা ক'রেও তাকে রাখ্‌তে পার্‌বেন না।

হরেন্দ্র। অসম্ভব ; মনোরমা আমার অনুগামিনী হবে, এ সম্পূর্ণ অসম্ভব। দাদা, জানেন না আপনি, কি উপাদানে বিধাতা মনোরমাকে সৃজন করেছেন। আমি স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করিতে এক দিনের জন্যও ক্রটি করিনি। আদর জানাতে ভালবাসায় তার মন ভোলাতে আমি বিধিমতে চেষ্টা করেছি ; কিন্তু ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব গর্ব্বিতার নিকট আমার ভালবাসা দেখান কেবল বাতুলতা মাত্র। আত্মসুখেই যার তৃপ্তি, স্বামিসেবার সে কি বুঝ্‌বে ? বিলাসিনীর হৃদয়ে কি তার কুরূপ নিঃস্ব স্বামীর মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয় ? দাদা, কেন আবার আমায় অপমান হ'তে পরামর্শ দেন ?

সদা। সংকল্প কর্‌বার পূর্ব্বে কি একবার চেষ্টা ক'রে দেখা উচিত নয় ? তোমার ধর্ম্মপত্নী জীবিত থাকৃতে এরূপ উদাসীন-ভাবে এমন ক'রে কথনও কি মনের শান্তি লাভ কর্‌তে পার্‌বে ? মনু বলেছেন, অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যাকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবে, তাহাতে অধর্ম্ম স্পর্শ করিবে না ; কিন্তু এই কলিকালে

অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যাও ক্ষমার পাত্রী—যদি সে ব্যভিচারণী না হয়। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর মত অনুগত সমদুঃখভাগিনী সহ-ধর্ম্মিণী মানুষের ভাগ্যে বিরল, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তাই ব'লে কি সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ ক'রে বনবাসী হবে? তাহা হ'লে ত সংসার চলে না। তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন কর, তার পর যদি তোমার স্ত্রী নিতান্ত দুর্ভাগ্যবতী হয়, সে তোমায় প্রত্যাখ্যান কর্‌বে। তখন যাহা উচিত হবে, তাই ক'রো।

হরেন্দ্রকুমার তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন; কিন্তু তাঁহার মনে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, স্ত্রীর সহিত তাঁহার ইহজীবনে কখনও সদ্ভাব হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

কথাবার্ত্তায় অনেক রাত্রি হইল। সেই বহুজনপূর্ণ বৃহৎ নগরী যেন প্রগাঢ় সুষুপ্তির ঘোরে নিস্তব্ধ; কেবল ভগবদারাধনায় নিযুক্ত কোন কোন মহাপুরুষ মাঝে মাঝে উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের স্তোত্রগান গাহিয়া সেই নিস্তব্ধ পুরীর সুপ্তিভঙ্গ করিতেছেন আর পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর কুলুকুলু ধ্বনি কর্ণে মধুক্ষরণ করিতেছে।

সদানন্দ হরেন্দ্রকুমারকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মনোরমাকে লইয়া সুরেশচন্দ্র কোথায় যাইবেন? কোন অপরিচিত স্থানে গিয়া দুই জনে স্বামি স্ত্রীর মত বাস করিলে তাঁহাদের জীবনটা বড়ই সুখে কাটিবে; অথচ এ কলঙ্ক-কাহিনী অন্যে কেহ জানিতে পারিবে না। কিন্তু সঙ্গে অনেক অর্থ, এত অর্থ লইয়া বিদেশে উপস্থিত হইলে বিপদ্ ঘটিতে পারে। অপরিচিত স্থানে অজ্ঞাত বন্ধুর অভাব হইবে না আর অর্থলোভে তাহাদের প্রবৃত্তি কোন্ পথে ধাবিত হইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? দুষ্কর্ম্মান্বিতের জীবনের ভয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক. তাহাদের কলুষিত চিত্তে নরকের জ্বলন্ত চিত্র নিত্য প্রতিফলিত। মনোরমাও তাঁহার এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন না। কিন্তু কোথায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবেন আর কেই বা তাঁহাদের আশ্রয় দিবে? আত্মীয়-স্বজনের নিকট কি করিয়া মুখ দেখাইবেন আর তাঁহারাই বা আশ্রয় দিবেন কেন? কারণ, সমাজের ভয় সকলেরই আছে। মনোরমা সুরেশ বাবুক জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এমন কেহ নাই যে, তাঁহাদিগকে বাসস্থান দিতে পারে? প্রত্যুত্তরে সুরেশচন্দ্র জানাইলেন, কলিকাতায় গিয়া থাকিলে কোন গোল হইবে না। কিন্তু মনোরমা তাহাতে প্রতিবাদ করিয়া নিজের অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। সেখানে তাহার পিতৃকুলের অনেক আত্মীয়-স্বজন আছেন, দৈবযোগে যদি তাঁহারা তাহার বাসস্থান জানিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা তাহার পিতা অনায়াসে তাহার সন্ধান

করিতে পারেন। কলঙ্কিনী তাহার পিতার নিকট মুখ দেখাইতে পারিবে না, সে সাহসও তাহার নাই। স্নেহশীল জনকের কোপ-দৃষ্টির আশঙ্কা তাহার অন্তঃকরণকে অভিভূত করিল। সুরেশ-চন্দ্রের কোন পরিচিত বন্ধুর সাহায্য গ্রহণ করিতে মনোরমা তাঁহাকে পরামর্শ দিল। সুরেশচন্দ্র ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার এমন কে বন্ধু আছে, যে স্বেচ্ছায় তাঁহার দুষ্কর্ম্মের সহায় হইবে? তাঁহার মত দুষ্কর্ম্মান্বিতকে আশ্রয় দিয়া লোকের নিকট কে নিন্দ-নীয় হইবে? ভাবিতে ভাবিতে সুরেশ বাবুর মনে পড়িল, রাম-কানাই রায় তাঁহার বাল্যকালের সুহৃৎ, তাঁহার পিতার অন্নদাতার ভ্রাতুষ্পুত্র; মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী; তাঁহার দুষ্কর্ম্মের প্রশ্রয় দিবার উপযুক্ত পাত্র। তাঁহাদের নিজ গ্রাম হইতে অধিক দূরে নয়, অথচ অত্যন্ত নিকটেও নয়। গঙ্গাতীরে নির্ম্মিত তাঁহার বাগান-বাটী, অথচ ভদ্রপল্লীর মধ্যে। সেই স্থান তাঁহাদের পাপকার্য্যের প্রশস্ত স্থান। রামকানাই অর্থ-লোভে সেই বাগানবাটী তাঁহাকে ভাড়া দিবে, এই তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাস হইল। তিনি মনোরমাকে এ কথা বলিলেন, মনোরমাও সম্মত হইল।

তখন নাবিকগণকে সেই দিকে নৌকা লইয়া যাইতে আদেশ করা হইল। সেই পূতসলিলা জাহ্নবীর বারিরাশি ভেদ করিয়া তাঁহাদের পাপকার্য্যের সহচরীস্বরূপ তরণী নাচিয়া নাচিয়া, তরঙ্গ ভেদ করিয়া অবিরাম-গতিতে ছুটিতে লাগিল। পথে যাইতে যাইতে দুই জনেই মনে মনে কত সুখের চিত্র অঙ্কিত করিলেন, কল্পনার মোহে কত সম্মোহন স্বপ্ন দেখিলেন। তখন দিবা দ্বিপ্রহর অতীতপ্রায়, ভাস্কর-কিরণ গঙ্গাসলিলে পতিত হইয়া সলিলের শোভা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। মনোরমা নৌকার

প্রকোষ্ঠমধ্যে বসিয়া তাহার হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর, কল্পনার নায়ক সুরেশচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। সুরেশচন্দ্রও মুগ্ধ-চিত্তে তাহার অম্লান পঙ্কজতুল্য মুখের পানে আপনার দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া আছেন। মনোরমার সৌন্দর্য্য-সাগরে তিনি ডুবিয়া গিয়াছেন। এমন রূপ ত কখন দেখেন নাই! তাহার নীলমণিময় আঁখি নীলেন্দীবর তুল্য—যেন নির্ম্মল সরসী-হিল্লোলে ভাসিতেছে, মলয়ানিল-সঞ্চারে কাঁপিতেছে। তাহার মৃণাল-বিনিন্দিত সুগঠিত বাহু—সেই বাহু-বেষ্টিত আলিঙ্গনে তিনি নরকের পথে যাইতেও শঙ্কিত নহেন। সংসার ভাসিয়া যাউক্, ধর্ম্ম লোপ পাক্, কর্ত্তব্যজ্ঞান অতলজলে বিসর্জ্জিত হোক্, ক্ষতি নাই। এ সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিতে, তাহার প্রদীপ্ত বাসনানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে তিনি সংসারের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিতে পারেন। সম্ভোগকাতরা মনোরমার হৃদয়-নিহিত কামানল-শিখা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত করিতেছে, তাহার জ্বালাময় তপ্ত-নিশ্বাসে সুরেশ বাবুর সমস্ত শরীরে তাড়িৎপ্রভা খেলিতেছে। সেখানে জ্ঞান লুপ্ত, চৈতন্য পরাভূত, বিবেক অন্তর্হিত। সুরেশচন্দ্র চক্ষে আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি দেখিতে পাইলেন, সমস্ত সংসার শূন্য, কেবল মনোরমার সুন্দর মুখখানি তাঁহার নয়ন-সমক্ষে ভাসিতেছে। তাঁহার হৃদয়প্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; সমস্ত হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া পূর্ণিমার স্নিগ্ধ-শশধরের মত মনোরমার মুখখানি বিরাজ করিতেছে। সুরেশচন্দ্র তন্ময় হইয়া বাহুদ্বয়ে তাহাকে বেষ্টন করিলেন। তাহার নবনীত-কোমল সুকুমার অঙ্গ-স্পর্শে তাঁহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। মনোরমা তাঁহার স্কন্ধে মস্তক-স্থাপন করিয়া আকুল-

নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ফুল্লারবিন্দ তুল্য মধুর অধর সুরেশের কপোল-সংলগ্ন হইল। সুরেশচন্দ্র কম্পিত-কণ্ঠে ডাকিলেন, "মনোরমা!"

নায়কের এই প্রিয়-সম্বোধন মনোরমার কানের মধ্য দিয়া তাহার মর্ম্মে গিয়া স্পর্শ করিল। মনোরমা তখন তাহার সুকোমল বাহুলতা দ্বারা সুরেশ বাবুর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া অবাক্ত-মধুর-কণ্ঠে উত্তর দিল, "প্রাণেশ্বর! আমার হৃদয়েশ্বর!"

কি মধুর কণ্ঠস্বর! কি সুন্দর শ্রুতিসুখকর প্রিয়-সম্বোধন! সুরেশচন্দ্র মনোরমার চিবুক ধরিয়া, মুগ্ধ আঁখি তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া আবেগভরে বলিলেন, "মনোরমা, তুমি বড় সুন্দর! তোমার রূপ দেখে আমি চৈতন্য হারিয়েছি। আমাকে যেন পরিত্যাগ করিও না।"

"এ জন্মে নয়!"—মনোরমা দৃঢ়স্বরে তাঁহাকে বলিল, "এ জন্মে নয়! এ জন্মে তোমায় পরিত্যাগ করতে পারব না। তোমার জন্য ত আমি সব ত্যাগ করেছি। আমার পিতা-মাতা, অমন স্নেহশীলা পিসীমাতা—যিনি মায়ের চেয়েও যত্ন ক'রে আমাকে প্রতিপালন করেছেন, আমার আত্মীয়-স্বজন, রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা, অতুল বৈভব—তোমার জন্য—শুধু তোমার জন্য ছেড়ে এসেছি।"

হতভাগিনী কলঙ্কিনী স্বৈরিণী একবারও তাহার স্বামীর কথা মনে ভাবিল না। পার্থিব দেহে তাহার যাহা কিছু প্রিয়-বস্তু ছিল, সব তাহার মনে পড়িল, ক্ষণেকের জন্য একবার সে মস্তক অবনত করিল, তাহার মুখভাব গম্ভীর হইল, একবারমাত্র সে প্রাণের মধ্যে স্বজন-বিরহের আকুলতা অনুভব করিল। ক্ষণ-

মাত্র শ্মশান-ক্ষেত্রে বিচরণ করিলে যেমন মানবের মন ক্ষণেকের জন্যও বিচলিত হয়, মনোরমারও সেইরূপ হইল। পরক্ষণেই তাহার সে ভাব দূর হইল। আবার তাহার ফুল্লাধরে মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল, আবার নয়নের জ্যোতি পূর্ব্ববৎ ফিরিয়া আসিল। মনোরমা তখন দুই বাহুর দ্বারা সুরেশচন্দ্রের কণ্ঠালিঙ্গন করিল। সুরেশচন্দ্র মনে ভাবিলেন, এই সুখ-মদিরায় বিভোর হইয়া তাঁহার জীবনটা যদি স্বপ্নের মত কাটিয়া যায়, তাহা হইলে নরদেহ ধারণ করিয়া ইহার অপেক্ষা আর অধিক সুখ কি হইতে পারে?

মনোরমা সুরেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আর কতদূর আমাদের যাইতে হইবে?"

সুরেশচন্দ্র মাঝিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে স্থানের নাম কি? উত্তরে জানিতে পারিলেন, সে স্থান হইতে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে রাত্রি অতিবাহিত হইবে। অন্ধকার রাত্রি, জল পথ, সঙ্গে যুবতী স্ত্রী; সুরেশ বাবুর রাত্রিকালে যাইতে সাহস হইল না। তিনি মাঝিদিগকে সম্মুখে কোন নিরাপদ্ স্থানে নৌকা রাখিতে আদেশ দিলেন।

চতুর্থ খণ্ড।
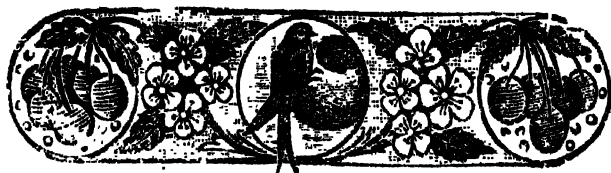
প্রথম পরিচ্ছেদ।

সময় সন্ধ্যা। স্থান রামকান্তবাবুর অন্তঃপুর। সুখদা পান সাজিতেছেন। বৃহৎ দরদালান। গৃহিণী একপার্শ্বে দেয়াল ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিয়া হরিনামের মালা ফিরাইতেছেন। বিন্দে ঝি শোভনার কনিষ্ঠ পুত্রকে কোলে করিয়া তাহার মাথা চাপড়াইয়া ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। ছেলে তার কোলে থাকিতে নারাজ। কান্নার সুর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সুখদা পান সাজা বন্ধ করিয়া ঝিয়ের কোল হইতে ছেলেকে লইয়া তাহাকে পান কটা শেষ করিতে বলিলেন; তাহার পর ছেলেকে লইয়া শোভনার গৃহে গেলেন।

সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়া, ঘরের মেঝেয় আসন পাতিয়া, শোভনা সে সময় ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সুখদা তাঁহার কোলের ছেলেকে লইয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে শোভনার মন্ত্রজপ শেষ হইলে পরিহাসচ্ছলে সুখদা তাঁহাকে বলিলেন, "তপ জপ শেষ হ'ল গোঁসাই ঠাকুরুণ? তোমার ছেলে যে আমার কোলে থাকৃতে নারাজ।"

শোভনা হাসিয়া বলিলেন, "কৈ, একবারও ত ছেলের কান্না শুনলুম্ না। ও তোমায় পেয়ে বসেছে।"

সুখদা। তোমার ছেলেকে কোলে নিলে আমার প্রাণটা যেন জুড়িয়ে যায়।

শোভনা। তুমি ওকে ভালবাস কি না, তাই ও তোমার কোলে থাক্‌তেও ভালবাসে। বালকে ভালবাসাটা বেশ বুঝ্‌তে পারে। এর ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রতিদান আছে, কিন্তু পুরুষের হৃদয় এত কঠিন যে, তার ভালবাসার বস্তুকে একবারও মনে করে না। পুরুষ একবারও মনে ভাবে না যে, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে দেখ্‌তে নারীর হৃদয় কত ব্যাকুল হয়।

সুখদা। সবই কপাল। কপালে দুঃখ থাক্‌লে কেউ কি তা খণ্ডন কর্ত্তে পারে? তোমার কথার ভাবে বুঝ্‌তে পারি, তুমি এককালে সুখের সপ্ত-সাগরে ডুবে ছিলে। তোমার মুখ দেখ্‌লে বোধ হয়, দিবা-রাত্রি তুমি দারুণ অশান্তি ভোগ কর্‌ছ। তবুও আমি তোমায় মিনতি কচ্ছি, সহস্র দুঃখে পড়েও তুমি তোমার স্বামীর প্রতি ভক্তিহীন হইও না। আমি আজ এতদিন এখানে এসেছি, এক দিনের জন্যও তোমার স্বামীকে দেখ্‌তে পেলেম না। মাত্র এক দিন তিনি অতি অল্পক্ষণের জন্য এসে-ছিলেন, কি রকম কঠোর হৃদয় তাঁর, বল্‌তে পারি না।

বড় কাতর হইয়া শোভনা উত্তর দিলেন, "এমন কথা মুখে এনো না বোন্! তাঁর মত কোমল অন্তঃকরণ মানুষের সম্ভবে না। তিনি সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত, সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী। এক অভাব—তিনি বড় অভিমানী। আর সেই অভাবেই তিনি সর্ব্বস্বান্ত হলেন।"

সুখদা। এ সব আন্দোলনে যদি মনে কষ্ট পাও, তা হ'লে আমি তোমার কথা শুন্‌তে চাই না।

শোভনা। কেন, আমি কি না দেখেছি? সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেল; রাজ-অট্টালিকা ধূলিসাৎ হয়েছে। বিচিত্র পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় যার নিদ্রা হ'ত না, এখন সেই মানুষ কত দিন ধূলি-শয্যায় রাত্রিযাপন করে। তাঁর প্রাণের যাতনা বুঝ্‌বার লোক নেই, সংসারে সহৃদয় মানুষ নেই, তা না হ'লে তিনি এত কষ্ট পেতেন না।

সুখদা। থাক্ ভাই, তুমি অন্য কথা বল। দুঃখের আন্দোলন যতই কর্‌বে, মনে ততই কষ্ট পাবে।

শোভনা। আজ তোমার কাছে আমার সব কথা প্রকাশ কর্‌ব। এ সব কথা পরিচয় দেবার লোক পাইনে। ব্যথার ব্যথী না পেলে কার কাছে মনের কথা বল্‌ব? তুমি আমার দুঃখে দুঃখী, ভাই, তোমার কাছে এ সব কথা ব'লে আমার অনেক দুঃখের অবসান করি। সমবেদনায় কাতর যে জন, তার কাছে মনের কথা বল্লে, প্রাণের জ্বালা অনেকটা জুড়োয়, প্রাণের মধ্যে অনেকটা শান্তি পাওয়া যায়।

সুখদা। হয় ত আমাদের চেয়ে আরও অনেক মন্দভাগিনী আছে, ভালবাসা পাওয়া দূরে থাক্, অন্ন-বস্ত্রের অভাবে যার চ'খে নিত্য জল পড়ে। সেও ত ভাই প্রাণ ধ'রে আছে। পিতার মুখে শুনেছি, অপমৃত্যু মহাপাপ, নিয়তির নিয়ম লঙ্ঘন না ক'রে এবং নিজের কর্ম্মফল ভোগ না ক'রে, এ জীবনের অবসান করা কাহারও উচিত নয়। নচেৎ এই বোঝা বয়ে আর লাভ কি?

শোভনা। রাজ-পুত্তুরের মত ছেলে, কে বল্‌বে, সে আমার গর্ভজাত সন্তান? আজ তিন বৎসর হ'ল তাকে দেখিনি; দেখা দূরে থাক, তার কুশল-সংবাদও সব সময় পাইনে। অপরের মুখে কখন কখন শুন্‌তে পাই, নাদু আমার ভাল আছে। আমার প্রাণ কত ব্যাকুল হয়, তোমার ছেলে হয়নি, ছেলের কি মায়া. বুঝ্‌তে পার না; কিন্তু বড় যাতনা?

সুখদা। অপত্য-স্নেহ সংসারে অতুলনীয়।

শোভনা। বাছাকে ভাল ক'রে কোলে কর্ত্তে পারিনি। খোকা তখন আমার সূতিকাঘরে। আমাকে দেখ্‌বার জন্য বাছা আমার নির্ব্বিকার-চিত্তে সেই সূতিকা-ঘরেই গেল। খোকাকে কোলে ক'রে নিয়ে বস্‌লে। দেখে যেন আমার প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। যে দিন সূতিকা-ঘর থেকে বেরিয়ে আমি শান্তির জল নিলুম, সেই দিনেই বাছা আমার এখান থেকে চ'লে গেল। যাবার সময় যখন আমি তাকে কোলে ক'রে নিলুম, বাছা আমার গলা জড়িয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। তার মনোগত ইচ্ছা, আমাকে সে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়। বোন্‌, সন্তানকে দেখ্‌বার জন্য মায়ের প্রাণ কত ব্যাকুল হয়, তা আর তোমায় কি ক'রে বল্‌ব। তার চাঁদমুখ স্মরণ ক'রে তাকে দেখ্‌বার জন্য আমার যে কি আগ্রহ হয়, তাকে না দেখ্‌তে পেয়ে আমার প্রাণের মধ্যে কি রকম হাহাকার ওঠে, আমি তা কথার দ্বারা প্রকাশ ক'রে বল্‌তে পারিনি।

সুখদা। যাঁর সন্তান, তিনিও ত একবার দেখে আস্‌তে পারেন।

শোভনা। তিনি যেন অভিশপ্ত জীবের মত সমস্ত পৃথিবী

ঘুরে বেড়াচ্ছেন। উদরের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাঁর সর্ব্বশরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। সে রূপ নাই, সে শ্রী নাই, যে সুন্দর মুখে সর্ব্বদাই হাসি শোভা পেত, সে মুখের হাসি একেবারে যেন নিবে গেছে। সদাই বিষণ্ণ, সদাই চিন্তাকুল। অদৃষ্ট-চক্রের ঘোর আবর্ত্তনে সে সুন্দর প্রকৃতির আর সে কোমলতা নাই। সহস্র নির্য্যাতনেও যার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়নি, শত প্রলোভনেও যিনি প্রলুব্ধ হননি, দারিদ্র্যের কঠোর আক্রমণে আজ তিনি জ্ঞানশূন্য। বোন্, এত সহ্য ক'রেও ত আমি প্রাণ ধ'রে আছি, কিন্তু তাঁর অদর্শন আর সহ্য হয় না। জ্যেঠা মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলুম, যদি কোন দিন কোন কারণ বশতঃ আপিস থেকে বাড়ী আস্‌তে তাঁর দেরী হ'ত, আমি আকুল-নেত্রে পথের দিকে চেয়ে থাকৃতেম। সেই আমি এখন কদাচিৎ তাঁর চরণ দর্শন কর্‌তে পাই।

সুখদা। এখানেও মাঝে মাঝে এলে ত পারেন। কেউ ত তাঁকে অযত্ন করে না।

শোভনা। বড় অভিমানী তিনি। এক দিন যারা খোসামোদ ক'রে, কত আদর-অভ্যার্থনা করেও তাঁকে হঠাৎ বাড়ী আন্‌তে পারেনি, এখন উপযাচক হয়ে তাদের বাড়ীতে আস্‌তে তাঁর প্রাণটা যেন ফেটে যায়। আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি। তাঁর মলিন মুখের কাতর দৃষ্টি আমার অন্তর ভেদ করে, আমি সাহস ক'রে তাঁকে বল্‌তে পারিনে যে, তুমি এস না কেন, আমি তোমায় না দে'খে আর থাকৃতে পারিনে।

সুখদা। তোমার জ্যেঠা মহাশয়ের সে ধন, ঐশ্বর্য্য গেল কি ক'রে?

শোভনা। তাঁর নিজের দোষে। বিলাসিতার উপকরণে আমরা সর্ব্বদা সজ্জিত থাকৃতাম, স্বামী আমার বিলাসের ক্রোড়ে প্রতিপালিত। বাল্যকাল হ'তে কখন কোন অভাব জানেন নি। জ্যেঠা মহাশয়ের কৃপায় তাঁর কোন অভাব জানতেও হয় নি। যখন তাঁর জ্ঞান হ'ল, তিনি বুঝতে পাল্লেন, এ সুখ ঐশ্বর্য্য অধিক দিন স্থায়ী হবে না। ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি চাকরীতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর চাকরী করার সম্বন্ধে জ্যেঠা মহাশয়ের সম্পূর্ণ অমত ছিল। আমিও তাঁকে বলেছিলাম, জ্যেঠা মহাশয় যে-কালে বারণ কচ্ছেন, তখন চাকরী করা কেন? তিনি বল্লেন, এক পয়সার দরকার হ'লে তিনি জ্যেঠা মহাশয়ের কাছে হাত পাত্‌তে পারবেন না। এই সব কারণে আমার স্বামীর সঙ্গে জ্যেঠা মহাশয়ের মনোমালিন্য ঘটে। আমার স্বামী তাঁকে তখন স্পষ্ট বুঝিয়ে বল্লেন, আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করলে ভাগ্যলক্ষ্মী অধিক দিন প্রসন্ন থাকেন না। কারণ, আমার স্বামী বুঝতে পেরেছিলেন, সে সময় তাঁর দেনা হয়েছিল। এই ভাবেই দিন যেতে লাগ্‌ল। আমার স্বামী ক্রমেই তাঁর প্রিয় পাত্র হতে লাগ্‌লেন। শেষকালে অকস্মাৎ এক দিন শুনলেম যে, দেনার দায়ে জ্যেঠা মহাশয়ের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী হয়ে গেছে। তিনি তখন জমিদারীতে ছিলেন। আমার স্বামী তাঁর সম্পত্তির কতক অংশ বজায় রাখ্‌তে অনেক চেষ্টা কল্লেন, কিন্তু একমাত্র কাশীর ভদ্রাসন ছাড়া আর কিছুই রক্ষা হ'ল না। কারণ, সম্পত্তির দামের চেয়ে দেনার টাকা বেশী হয়ে পড়েছিল। এক কাশীর বাড়ী ছাড়া আর তাঁর দাঁড়াবার জায়গা রৈল না। সেই অবধি আমি পিত্রালয়ে আশ্রয় নিয়ে আছি।

সুখদা। পিতার রাজ-প্রাসাদ অপেক্ষাও স্বামীর পর্ণকুটীরে বাস করায় অনেক সুখ।

শোভা। তাও যে নেই। নিকট কিংবা দূর-সম্পর্কীয় তাঁর এমন কোন আত্মীয় নেই যে, আমি চার দণ্ডের জন্যও সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিই। জ্যেঠা মহাশয় কাশীতে আছেন, কিন্তু যে অবধি তিনি কলিকাতা ত্যাগ করেছেন, সেই অবধি তিনি যেন নিঃসম্পর্কীয় আত্মীয়ের মত ব্যবহার কচ্ছেন। তিনি গুরুলোক, তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমার অন্যায়, তবে আমার বোধ হয়, অর্থাভাবে তিনিও অপদার্থ হয়েছেন।

সুখদা। তবে কেন তোমার ছেলেকে তাঁর কাছে রেখেছ ?

শোভনা। সে কেবল জ্যেঠাইমার জন্যে। তিনি প্রায় আমার সমবয়সী, বড় জোর তিন চার বছরের বড় হবেন। আর আমাকে বড় ভালবাসেন।

সুখদা। সমবয়সী ?

শোভনা। জ্যেঠা মহাশয়ের তৃতীয় পক্ষের বিবাহ।

সুখদা। তিন সংসার অথচ কারও সন্তান হয়নি ?

শোভনা। দ্বিতীয় পক্ষের এক কন্যা ছিল। অনেক অর্থ ব্যয় ক'রে তার বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টদোষে বছর পেরুতে না পেরুতে শ্বশুরালয়ে তার মৃত্যু হ'ল। তখনও পর্য্যন্ত মেয়ের বিয়ের দেনা শোধ কর্‌তে পারেননি। কন্যার শোকে জ্যেঠা মহাশয় বড়ই কাতর হয়ে পড়্‌লেন। আমরা কোন মতেই তাঁকে সান্ত্বনা কর্‌তে পার্‌লেম না. সমস্ত দিনের মধ্যে

তাঁকে একটু জল পর্য্যন্ত খাওয়াতে পারলেম না। আমার স্বামী আফিস থেকে বাড়ী এলে তাঁর অনুরোধে তবে একটু মুখে জল দিলেন। সেই দিন আমরা বুঝ্‌তে প্যারলেম. যদিও আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর ততদূর বনিবনাও ছিল না, তবুও অন্তরে অন্তরে তাঁকে যথেষ্ট ভালবাস্‌তেন। তাঁর প্রস্তাবে তার পরদিনেই জ্যেঠা মহাশয় আমাদের সকলকে নিয়ে তীর্থ-দর্শনে যাত্রা করেন। অনেক দিন ধ'রে আমরা পশ্চিমে নানাস্থানে ভ্রমণ করি। শেষকালে ৺কাশীধামে এসে ছয় সাত মাস বাস করি। সেই সময় তিনি কাশীতে বাড়ী কেনেন। বাড়ীখানি জ্যেঠাইমার নামেই খরিদ করা হ'ল। সেইখানেই তিনি আমাদের ব'লে রাখেন যে, তাঁর শেষ-জীবনের সম্বল যদি আর কিছুও না থাকে, তা হ'লে এই বাড়ীতে এসে বাস কর্‌বেন। তখনও আমরা কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি যে, তাঁর এই কথা এক কালে সত্যে পরিণত হবে।

সুখদা। আচ্ছা, তোমার জ্যেঠা মহাশয়েরও পৈতৃক বিষয়, তবে তিনি একা পেলেন আর তোমার স্বামী কিছু পেলেন না কেন?

শোভনা। আমার দাদা শ্বশুরের জীবদ্দশায় আমার শ্বশুরের মৃত্যু হয়, কাজেই আইন অনুসারে জ্যেঠা মহাশয় একা বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন।

সুখদা। আচ্ছা, তাঁর চাকরী গেল কি ক'রে? চাকরী ত্যাগ করা তাঁর ভাল হয়নি।

শোভনা। তিনি অন্যায় অত্যাচার কারও সহ্য কর্‌তে পার্‌তেন না—তা সে জন্মদাতাই হোক আর অন্নদাতাই হোক। বিদ্যায় তিনি আফিসের অনেক লোকের চেয়েও পণ্ডিত ছিলেন;

আর কখনও কোন কার্য্যে অমনোযোগী ছিলেন না। তা ছাড়া কোন কাজে তিনি 'পারবো না' বলতেন না। এমন কি, কথন কথন বাড়ীতেও তিনি অনেক রাত পর্য্যন্ত আফিসের কাজ কর্‌তেন। আমি তাঁর পাশে শুয়ে থাক্‌তেম, কাজ শেষ না ক'রে তিনি আমার দিকে ফিরেও চাইতেন না। এত গুণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর পদোন্নতি হ'ল না, অথচ বড় বাবুর অনুগ্রহের পাত্র একজন অশিক্ষিত অকর্ম্মণ্য লোককে তাঁহার উচ্চপদে কাজ দেওয়া হ'ল। অভিমানে তিনি বড় সাহেবের কাছে দরখাস্ত কল্লেন। বড় বাবুর খাতিরে সাহেবও অবিচার কল্লে; প্রতীকার করা দূরে থাক, তাঁর মাহিনে আরও কমিয়ে দিলে। এই অপমান সহ্য কর্‌তে না পেরে তিনি কর্ম্মত্যাগ কল্লেন। তার অল্প দিন পরেই জ্যেঠা মহাশয়ের সমস্ত সম্পত্তি নীলামে বিক্রী হয়ে গেল। জ্যেঠা মহাশয়ের ভবিষ্যৎ-বাণীও তখন সত্য হ'ল। নাদু আমার তখন দেড় বছরের ছেলে। জ্যেঠাইমার অনুরোধে আমি আমার সেই দেড় বছরের ছেলেকে তাঁর হাতে সমর্পণ কল্লুম। ছেলেও আমার তার দিদিকে না দে'খে থাক্‌তে পার্‌তো না। আর যে শত্রু হয়ে আমার গর্ভে জন্মেছিল, তখন সে তিন মাসের ছেলে। দিদি, আমি তখনও বুঝ্‌তে পারিনি যে, নাদুকে জ্যেঠাইমার হাতে দিয়ে আমাকে পুত্রহীনার দুঃখ ভোগ করতে হবে। ন'মাস পরে আমার মেজ ছেলে মারা গেল, তখন আমি এইখানেই। তিনিও সে সময় আমার কাছে ছিলেন না যে, তাঁর মুখ দেখেও আমি কতকটা জুড়াই। জ্যেঠাইমাকে বড় কাতর হয়ে পত্র লিখ্‌লেম যে, অন্ততঃ এক দিনের জন্যও যেন নাদুকে আমায় দেখিয়ে নিয়ে যান। তার মুখ দেখ্‌লে আমার প্রাণটা

অনেক ঠাণ্ডা হবে। জোঠাই মা আমার পত্রের উত্তরে অনেক দুঃখ জানালেন ; কিন্তু নাদুকে আমার কাছে পাঠালেন না। তিনি আরও লিখ্‌লেন, নাদু আমার আস্‌তে চায় না। ভাই, শোকের সময় সন্তানের মুখ দেখ্‌লে মায়ের প্রাণটা অনেক শান্ত হয়। তিনিও যে সে সময় কোথায় ছিলেন, তাও আমি জান্‌তুম না যে, তাঁকে একখানা চিঠি লিখি। সে দিনের কথা মনে হ'লে এখনও আমার বুকটা কেঁপে উঠে।

সুখদা। থাক্, আজ অনেক রাত হয়েছে। বিন্দেকে জায়গা কর্‌তে বলি। ছেলেদের পড়া বোধ হয় এতক্ষণ শেষ হ'ল।

তখন দুই জনেই বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া কি দেখিলেন ?—দরদালান আলো করিয়া শোভনার স্বামী তাঁহার মাতার সহিত কথা কহিতেছেন। সুখদা দেখিলেন, সুপুরুষ বটে। এত দুঃখ-কষ্টের ভিতরও তাঁহার রূপের জ্যোতি নয়ন মুগ্ধ করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শোভনা। তুমি আর ভেবো না। সত্য সত্যই কি মানুষের চিরদিন সমান যায়?—তা কখনও নয়। তুমি নিশ্চয়ই আবার দিন পাবে।

আহারান্তে যখন শ্যামাচরণ শোভনার গৃহে যাইলেন, তখন পতিগতপ্রাণা শোভনা তাঁহার স্বামীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তুমি কেন এত কাতর হইতেছ? নিশ্চয়ই আমাদের আবার সুদিন আসিবে।"

হতাশ্বাসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামাচরণ পত্নীর কথায় উত্তর দিলেন, "আর কবে পাব? জীবনের মধ্যাহ্নকাল কেটে গেল। এক দিনের জন্যও দুর্ভাবনার হাত থেকে নিস্তার পেলেম না। সোনামণি, তুমি কি বুঝ্‌তে পার, দরিদ্রতার কঠিন পীড়নে আমি কি কষ্টই না পাচ্ছি?"

শোভনা। তুমি অত ভেবো না। তোমার কি চেহারাই হয়ে গেছে, বল দেখি?

শ্যামা। এখন ঈশ্বরের নিকট একমনে প্রার্থনা করি, যেন শীগ্‌গির এ বোঝা নামাতে পারি। এ জীবনটা বহন কর্‌তে আমি বাস্তবিকই বড় ভার বোধ করি।

শোভনা। এ সব কথাগুলো আমার সাক্ষাতে বলো না।

শ্যামা। রাগ করো না সোনামণি, জীবনটা আমার প্রকৃতই ভার বোধ হয়েছে। তুমি হয় ত বুঝ্‌তে পার্‌বে না সোনা, আমার প্রাণের মধ্যে কি গভীর বেদনা। এমন নরাধম কে

সংসারে আছে যে, তার স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালন কর্‌তেও সে অক্ষম ?

শোভনা। আমাকে তুমি এখান থেকে নিয়ে চল। যেমন ক'রে হোক্ দিন যাবেই। ঈশ্বরের রাজ্যে কেউ উপবাস ক'রে থাকে না।

শ্যামা। এ তোমার উপযুক্ত কথা বটে, কিন্তু কোথায় নিয়ে যাব ? কোথাও বাসা ভাড়া ক'রে নিয়ে যেতে আমার ভয় হয়, শেষকালে কি সপরিবারে উপবাস কর্‌বো ?

শোভনা। সেও ভাল ! অদৃষ্টে যদি তাই হয়, সেও ভাল। তার জন্যে আক্ষেপ কি ? তাতেও আমার সুখ। বাপের বাড়ী আছি, ভাল কাপড় পর্‌ছি, কিন্তু তুমি মনে কর কি আমি সুখে আছি ? আমার মুখে অন্ন যায় কি ক'রে ? কোথায় তুমি থাকো, তার ঠিক নেই, কি অবস্থায় তুমি দিন কাটাও, তা জান্‌তে পারিনি। তোমার পায়ে ধরি, আমায় নিয়ে যাও যেখানে হোক্, আমায় রাখ, এ সুখ আমার অসহ্য, এ সুখ আমি চাইনে।

শ্যামা। তাই ত, ভেবে দেখি। সব কাজ ভেবে করা উচিত।

শোভনা। এর আর ভাব্‌বার কি আছে ? মনে ক'রে দেখ দেখি, এক দিন তোমার কি অভিমান ছিল। এক অভিমানের বশবর্ত্তী হয়ে কি যাতনা ভোগই না কচ্ছ। এক দিন যারা তোমাকে কত আদর-অভ্যর্থনা ক'রে বাড়ীতে আন্‌তে পারেনি, যাদের বিন্দুমাত্র ত্রুটিতে তুমি অসন্তোষ প্রকাশ করেছ, এখন উপযাচক হয়ে, অনাহূত অবস্থায় তাদের বাড়ীতে আস্‌ছ। আমি তোমার মুখের দিকে চাই, বুঝ্‌তে পারি, তুমি সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত, পাছে কেউ পূর্ব্বের কথা তুলে তোমায় লজ্জা দেয়।

শ্যামা। সত্য সোনামণি, এখন আমি মনে মনে হাসি, আমার সে অভিমান গেল কোথায়? ঈশ্বর, তুমি সবই কর্‌তে পার। দেখ সোনামণি, যে সঙ্কল্প ক'রে জীবনটা কাটাব মনে করি, ঈশ্বর ঠিক তার বিপরীত পথে নিয়ে যান। আমার আস্‌তে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু তোমায় না দেখেও থাক্‌তে পারিনি। কেউ যদি আমাকে প্রকাশ্যভাবে অপমান করে, এখন তাও বোধ হয়, আমি অবনত-মস্তকে সহ্য কর্‌তে পারি। তোমার এমনি আকর্ষণ যে, আমার সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভেসে যায়; মনের বাঁধন একেবারে খুলে যায়। বল্‌তে পারিনে সোনামণি, শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে তোমায় প্রথম দর্শন করি, কিন্তু যে অবধি তোমায় দেখেছি, সেই থেকে সমস্ত সংসারের মধ্যে লক্ষ্য আমার তোমার দিকে।

শোভনা। তাই তোমায় বল্‌ছি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল। তোমায় যদিও আমি দেখ্‌তে না পাই, তবুও আমি তোমায় সাহস ক'রে বল্‌তে পারিনে, তুমি এখানে এসো। যদিও আমার ভাইয়েরা বাড়ীর সকলেই তোমাকে খুব যত্ন করে, তবুও আমার ভয় হয়, পাছে কেউ তোমায় অযত্ন করে, পাছে কেউ তোমায় কোন কথা বলে। তোমার অনুপস্থিতিতে যদি কেউ পরিহাসচ্ছলে তোমাকে কোন কথা বলে, তাতেও আমার প্রাণে যেন শেল বাজে।

শ্যামা। কোথায় তোমায় নিয়ে যাই বল দেখি? আমি কোথায় থাকি, তার ঠিক নেই। মাণিকের সঙ্গে বাল্য কাল থেকে বড় ভালবাসা, সেই ভালবাসার খাতিরে সে আমার সমস্ত খরচ চালাচ্ছে। কিন্তু তাকে কি ক'রে বল্‌ব যে, আমার

পরিবারকে নিয়ে বাসা করব, তুমি আমার সমস্ত খরচ দাও। একটা কি কোন উপায় হবে না? হা ভগবান্!

শোভনা। কেন হবে না? আচ্ছা আগে যে জায়গায় চাকরী কর্ত্তে, সেইখানেই একখানা দরখাস্ত ক'রে দেখ না। তারা ত তোমাকে চেনে। সাহেবের সঙ্গেও ত একবার দেখা করতে পার।

শ্যামা। সেখানে আর কিছুতেই যেতে পারবো না, আর গেলেও কিছু হবে না। গবর্ণমেণ্টের চাকরী আমার আর হবে না, কারণ, আমার অনেক বয়স হয়েছে। যদিও কোন ঠিকে চাকরী অস্থায়িভাবে হয়, তাও আমি করতে পারব না। সেখানে গেলে যদি আমার আগেকার চেনা লোক আমাকে পরিহাস করে, আমি তা সহ্য করতে পারব না। এক দিন আমার আগেকার কোন বন্ধুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়, সেই বন্ধু আমার চেহারা দেখে হেসে বল্লে, 'কে ও, শ্যাম বাবু যে! শ্যাম বাবুর এ রকম অবস্থা কেন? এখন সে পম্‌সু জুতো, আদ্দির সার্ট কোথায় গেল?' তার কথা শুনে আমার প্রাণটা যেন ফেটে গেল।

শোভনা। যে লোকটা নিতান্ত অভদ্র, তাই তোমাকে ও রকম বলেছে। মানুষের সব দিন কি সমান যায়?

শ্যামা। সেই থেকে রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে যদি দেখি, আমার কোন পুরাতন বন্ধু আস্‌ছে, আমি ছাতা আড়াল ক'রে চ'লে যাই—পাছে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়—পাছে সে আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করে।

শোভনা। এত লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ, কেউ একটা চাকরী ক'রে দিতে পারে না?

শ্যামা। এই ত তোমায় বল্লুম, আলাপী লোকের সঙ্গে দেখা কর্‌তেও কুণ্ঠিত, তা চাকরীর জন্য অনুরোধ করা দূরে থাক্; প্রাণ যায়, সেও ভাল, তবুও কোন বন্ধুবান্ধবের কাছে চাকরীর জন্য উমেদারী কর্‌তে পার্‌ব না।

শোভনা। তবে কি হবে? তোমার বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, তোমার চাকরী হবে না, এ যে বড় আশ্চর্য্যের বিষয়।

শ্যামা। হবে না কেন? কলিকাতায় চাকরী কর্‌তে পার্‌বো না। কল্‌কাতায় আর থাক্‌তেই পার্‌বো না। যেখানে গৌরবের সহিত এ জীবনের অধিকাংশ কাল কাটিয়ে এসেছি, সেখানে এই দুরবস্থায় পড়ে দীনভাবে কখনই থাক্‌তে পার্‌বো না। তবে এক বিষয় মনে মনে আন্দোলন ক'রে রেখেছি, তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ব। সেই কথা বল্‌ব বলেই আজ আমি তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি।

শোভনা। কি কথা?

শ্যামা। তোমায় আরো কিছু দিন এখানে থাক্‌তে হবে।

শোভনা। তা আমি পার্‌ব না।

শ্যামাচরণ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এক সময়ে তুমি বাপের বাড়ী আস্‌বার জন্য আমাকে কত অনুরোধ কর্‌তে, আর আজ তুমি আমাকে সেই বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ কচ্ছ, দেখ, মানুষের কত পরিবর্ত্তন হয়।

শোভনা। সে এক দিন ছিল, আর আজ কি দিন। তখন এক দিনের জন্য এলে পাড়ার লোক আমাকে দেখ্‌তে ছুটে আস্‌ত, আর আজ আমি কি ভাবে আছি! আমি আর এখানে কিছুতেই থাক্‌তে পার্‌ব না।

শ্যামা। না পার্‌লে চল্‌বে কেন সোনা? তুমি ত অবুঝ নও।

শোভনা। দেখ, তোমার আদরেই আমার আদর। তোমার অবস্থা ভাল যখন ছিল, তখন আমার কি খাতির ছিল, যদিও আমার এখানে কোন কষ্ট নেই, তবুও আমি যেন মনে মনে বড় লজ্জা পাই।

শ্যামা। আমি কি তা বুঝ্‌তে পারিনি। কি কর্‌বো বল।

শোভা। তুমি কি কর্‌বে?

শ্যামা। আমি কোন দূরদেশে যাব ব'লে মনস্থ করেছি। এত দূরে যাব যে, সেখান থেকে হঠাৎ বাড়ী ফিরে আসা সহজ নয়। আমার বাল্যকালের একজন বন্ধু বর্ম্মায় চাকরী করেন, তাঁকে আমি চিঠি লিখেছিলাম। চিঠির জবাবে আমাকে যেতেও লিখেছেন।

শোভনা। সেখানে গেলে চাকরী হবে?

শ্যামা। হয় ত জানি, তবে আমার ভাগ্যে কি আছে, তা বল্‌তে পারিনি। শুনেছি, সেখানে বাঙ্গালীর আদর আছে, আর সেখানকার সাহেবেরাও শুনেছি, এখানকার সাহেবদের মত বাঙ্গালীকে ঘৃণা করে না। তারা বাঙ্গালীর সঙ্গে সম্ভ্রম রেখে কথা বলে।

শোভনা। কত দিনে ফির্‌বে?

শ্যামা। তা বল্‌তে পারিনে। পয়সা রোজগার কর্‌তে পারি, তবে ফির্‌বো, নচেৎ নয়। আর্থিক অশান্তির মত জীবনে এত গ্লানি আর নেই। যদি লোকে পুত্রশোক পায়, আর সেই সময় খুব কতকগুলো টাকা পায়, আমার বোধ হয়, পুত্রশোক

ভুলে গিয়ে সে টাকা পেয়ে আনন্দ করে। পয়সা না থাকলে তুমি স্ত্রী—তুমি পর্য্যন্ত বিরূপ হও। সমস্ত সংসারের চক্ষে সে যেন ঘৃণিত। লোকে মনে করে, অর্থহীন লোক যেন বন্য পশুরও অধম।

শোভনা। আমি কি কখন তোমায় কোন কথা বলেছি?

শ্যামা। বল না, এ আমার ভাগ্য। কিন্তু তুমি যদি আমায় কোন অপ্রিয় কথা বল, তাতে তোমার দোষ নেই। ঘৃণার বদলে তুমি যে আমায় ভালবাসার চক্ষে দেখ, সে আমার বহু ভাগ্য। যে নরাধম তার স্ত্রীকে অন্ন-বস্ত্রের দ্বারা প্রতিপালন কর্‌তে না পেরে তার পিত্রালয়ে ফেলে রাখে, আবার হাসি-মুখে সোহাগ জানিয়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ কর্‌তে আসে, তার ভাগ্যে যে শতমুখী হয় না, এই যথেষ্ট।

শোভনা। স্ত্রীলোকের এত দূর নীচপ্রকৃতি হয় না। কি জানি, বল্‌তে পারিনে।

শ্যামা। হয় না কি বল্‌ছ সোনা, হওয়া উচিত। তুমি যে দিন আমায় ঘৃণা কর্‌বে, হেনস্থা কর্‌বে, সেই দিনে আমি মনে ভাব্‌ব, এত দিনে আমার ষোল কলা পূর্ণ হ'ল। হওয়া কি উচিত নয়? দেখ সোনা, আমি নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় নিজেই অনুতপ্ত। কিন্তু এখন অনুতাপে আর সে দিন ফিরে আসবে না। তুমি ত জানো, এক সময় কত অর্থ উপার্জ্জন করেছি, দু হাতে খরচ করেছি, এক পয়সাও রাখ্‌তে পারি নি।

শোভনা। সেইটেই অন্যায় কাজ হয়েছে। দেখ, এতক্ষণ

তোমায় বল্‌তে ভুলে গেছি, নাদু আমায় নিজের হাতে চিঠি লিখেছে। দেখ্‌বে?

শ্যামা। দেখ্‌বো? দেখ্‌তে আমার ভরসা হয় না। আজ তিন বৎসর তাকে দেখিনি। চখের দেখা দূরে থাক্‌, একখানা চিঠি লিখে তার সংবাদ নেবো, সে প্রবৃত্তিও আমার হয়নি। সোনামণি, বিধাতা আমায় উন্মাদ করে না কেন, আমি পাগল হ'লে ত আমার জ্ঞান থাকে না, পাগল হ'লে ত আমার পূর্ব্বের কথা মনে পড়ে না।

শোভনা। তুমি কাঁদ্‌ছ?

শ্যামা। না, কাঁদ্‌বার আমার কি অধিকার আছে? অপত্য স্নেহে পাষাণও আর্দ্র হয়। আমার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। কিন্তু সোনামণি, নাদুর কথা মনে হ'লে আমি আত্ম-সংবরণ কর্‌তে পারিনে। দেখ, সোনামণি, যদি কখনও কোন দূরদেশে যেতুম, যাবার সময় বাছার চাঁদমুখে সহস্র চুম্বনেও আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হ'ত না। দু'দিন তাকে না দেখ্‌লে সেও আমার জন্য কাতর হ'ত, আর আমার মনে হ'ত, তাকে যেন কত দিন দেখিনি। সেই আমি আজ তিন বৎসর তাকে দেখিনি মনে ভাব, আমার স্নেহ নাই। আমি অন্ধ হয়ে আছি। চোখ আছে সত্য, কিন্তু দেখ্‌তে পাইনি; কান আছে, তবুও যেন শুন্‌তে পাইনি। কেন জানো সোনামণি, আমার পয়সা নেই।

শোভনা। পয়সা নেই, কিন্তু পয়সা হ'তে কতক্ষণ? তুমি অত ভেবো না। আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, আবার তোমার পয়সা হবে, আমাদের এ অবস্থা কখন থাকবে না।

শ্যামা। তুমি সতী, তোমার ভাগ্যে যদি হয়। আমার কিন্তু এ পোড়া অদৃষ্ট—আর বিশ্বাস হয় না।

সে দিন রাত্রে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কেহই নিদ্রা গেলেন না। অনেক কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল, শ্যামাচরণ বর্ম্মায় যাইবেন। শোভনা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন।

....

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মনোরমাকে লইয়া সুরেশচন্দ্র দেবীপুরে উপস্থিত হইলেন। ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া তিনি রামকানাই বাবুর বাটী যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রামকানাই বাবুর নিকট তিনি বাল্য-কাল হইতে পরিচিত। তাঁহার স্বভাব-চরিত্র রামকানাইয়ের অবি-দিত ছিল না। মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া সুরেশচন্দ্র রামকানাই বাবুর ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী রমণীয় উদ্যান-বাটীতে আশ্রয় পাই-লেন। সুরেশ বাবু তাঁহাদের আশ্রয়দাতাকে যথেষ্ট সুখ্যাতি করিলেন এবং কত টাকা মাসে ভাড়া দিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিলেন। দুষ্ট রামকানাই ভাড়া লইতে অস্বীকার করিয়া তাঁহাদের নিকটে নিজের সরলতার পরিচয় দিল, কিন্তু তাহার অভিসন্ধি অন্যরূপ ছিল, পরে তাহা প্রকাশ পাইবে। বসন্তে যেরূপ ফুল-পত্রে সুশোভিত উপবনের শোভা হয়, কোকিল-কূজন যেরূপ শ্রুতিসুখকর হয়, শিশিরাবসানে চন্দ্রকর যেরূপ সুধাধারা বর্ষণ করে, মনোরমার আগমনে তাহার অপরূপ রূপ-রাশির উজ্জ্বল প্রভায়, সেই পরিত্যক্ত উপবনের শোভা সেইরূপ বৃদ্ধি পাইল। তাহার সুন্দর মুখের মধুর হাসি সে গৃহের অন্ধকার দূর করিল। সুরেশচন্দ্র সেইরূপ নির্জ্জন স্থানে, রম-ণীয় প্রকৃতির মধুময় ক্রোড়ে সুন্দরীপ্রধানা মনোরমাকে লইয়া মনে মনে কত সুখের চিত্র অঙ্কিত করিলেন, বাসনারাশি সহস্র-দলের মত তাঁহার হৃদয়-সরসে ফুটিয়া উঠিল, মধু পবন হিল্লোলে লহর তুলিয়া তাঁহার ধরার স্মৃতি লোপ করিল, কল্পনার চক্ষে

তিনি পৃথিবীকে স্বর্গের সহিত তুলনা করিলেন। বিলাসিনী মনোরমা পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইবার পর একবারও নিজকৃত কর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করিল না, পাপিষ্ঠা একবারও মনে ভাবিল না, তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার পিতা কত ভাবিতেছেন, তাহার পিসীমাতা তাহার জন্য কত কাতর হইয়াছেন। এ সংসারে তাহার কোন অভাব ছিল না। সর্ব্বগুণের আধার অকলঙ্কচরিত্র স্বামী, রাজার মত ঐশ্বর্য্যশালী পিতা, জননীর মত স্নেহশীলা পিসীমাতা; দুশ্চারিণী কাহারও কথা একবার মনেও ভাবিল না। কামাসক্ত নারী তাহার দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সংসারে এমন কোনও কার্য্য নাই, যাহা সে অবহেলায় না করিতে পারে। এই মনোরমা-চরিত্রে পাঠকগণ তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবেন। সুরেশচন্দ্র ভদ্রবংশোদ্ভব শিক্ষিত যুবক, বিজ্ঞানচর্চ্চায় অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ ও সদ্বিবেচক লোক ছিলেন; তাঁহার মত চরিত্রবান্ যুবকও স্বেচ্ছাচারিণী স্বৈরিণীর অপূর্ব্ব মোহিনীমন্ত্রে মুগ্ধ হইল। কন্দর্প যেখানে আধিপত্য বিস্তার করে, মানুষের বিবেচনা সেখানে অন্তর্হিত, শাস্ত্র সেখানে পরাভূত, ধর্ম্মজ্ঞান তিরোহিত, যুক্তি-তর্ক অগাধ-জলে বিসর্জ্জিত হয়। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস ঠিকই লিখিয়াছেন :—

"অবিদিতসুখদুঃখং নিগুর্ণং বস্তু কিঞ্চিৎ,
জড়মতিরিহ কশ্চিৎ মোক্ষ ইত্যাচচক্ষে।
মম তু মতং অনঙ্গস্তেব তারুণ্য ঘূর্ণন্
মদকলমদিরাক্ষী নীবিমোক্ষো হি মোক্ষঃ॥"

মানুষের প্রকৃতির একবার অধোগতি হইলে মানুষ কিরূপে

অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে অধঃপতনের অন্তঃসীমায় উপনীত হয়, এই সুরেশচন্দ্রই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। তাঁহার কি না ছিল?—মমতার মানস-সরসী, সংসার-সমুদ্রের একমাত্র তরণী, সমদুঃখভাগিনী সহধর্ম্মিণী, সংসারে সর্ব্বসুখপরিত্যক্ত শুদ্ধাচারিণী বিধবা ভগিনী, আজ্ঞানুবর্ত্তী কনিষ্ঠ সহোদর। মানুষের জীবনে যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়, তাঁহার সমস্তই ছিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন না, কিরূপে অল্পে অল্পে সেই বহু দিনের চিত্রিত অন্তরের ছবিগুলি একে একে অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। বসন্তে চাঁদ হাসে, মধু-সখার মধুর কাকলী শ্রবণে মধু বর্ষণ করে, মৃদু সমীরণ-সঞ্চালিত পুষ্প-সুরভি প্রাণে অমৃত বর্ষণ করে, কিন্তু কেহ কি ভাবিয়া দেখে যে, শিশির আগমনে ম্লানমুখী ধরণীর হাসিটুকু নিবিয়া যায়, চন্দ্রকিরণ অস্পৃহণীয় হয়, নক্ষত্রশোভিত নভস্তলের আর সে শোভা থাকে না? সুরেশচন্দ্র ভাবিতে পারিলেন না যে, তাঁহার জীবনের এই যে মধুময় কাল, এ কাল চিরদিন থাকিবে না।

সময়ে অনেকেই বন্ধু বলিয়া আগ্রহ করে। মানুষের যত দিন অবস্থার স্বচ্ছল থাকে, সমস্ত লোকই তত দিন তাহার বশীভূত থাকে। সুরেশচন্দ্র মনোরমার সঙ্গে অনেক অর্থ আনিয়াছেন, ঐশ্বর্য্য অপরিসীম, তাহার অনেক বন্ধু জুটিল। ঘৃণার পরিবর্ত্তে তিনি প্রশংসা, উপহাসের পরিবর্ত্তে উৎসাহ পাইলেন। সুতরাং তিনিও বুঝিতে পারলেন না যে, তাঁহার অধঃপতনের কত দূর বাকী ছিল।

রামকানাই বাবু প্রায় সদা-সর্ব্বদাই বাগান-বাটীতে আসিতেন। গ্রামের অনেকগুলি বন্ধু আসিয়া সমবেত হইল।

সকলেই রামকানাই বাবুর কার্য্যানুবর্ত্তী, পানাসক্ত ও ব্যভি-চারী। রামকানাই বাবু মনোরমার নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া সমবেত বন্ধুগণের সহিত সুরাদেবীর অর্চ্চনা করিতেন। সুরেশচন্দ্র প্রথম প্রথম বড়ই বিরক্তি প্রকাশ করিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন, তাহারা মনোরমার আশ্বাস পাইয়াছে, তখন তাঁহার আন্তরিক ভাব প্রকাশ করিতেও সাহস করি-লেন না।

এক দিন গেল, দুই দিন গেল, মনোরমা রামকানাই বাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না। রামকানাই বাবু গেলাস পূর্ণ করিয়া তাহার হস্তে দিত, প্রথম প্রথম মনোরমা অত্যন্ত সঙ্কুচিতা হইত, অনেক ওজর করিত; কিন্তু রামকানাই বাবুর আগ্রহাতিশয়ে তাহার সে বন্ধন খুলিয়া গেল। স্ত্রীলোক যেমন প্রথমে পুরুষ-সংস্পর্শে সঙ্কুচিতা হয়, প্রথম যেমন অবগুণ্ঠনে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত থাকে, বসনাগ্রভাগ নাসিকাগ্র স্পর্শ করে, পরে যেমন অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে সে অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত হইয়া কেবলমাত্র কবরীপ্রান্তে বসন সংস্পর্শমাত্র থাকে, মনোরমারও অবগুণ্ঠন ক্রমে ক্রমে সেইরূপ উন্মোচিত হইল। সুরার কি তীব্র উন্মাদকরী শক্তি! সে শক্তির প্রভাবে মানুষ স্বীয় দুষ্প্রাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এক মুহূর্ত্তের জন্যও সঙ্কুচিত হয় না।

রামকানাই বাবু দেখিলেন, সুরেশচন্দ্র যদি পানাসক্ত না হন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি সহজে হইবে না। সুতরাং তিনিও প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে প্রকারে হউক, সুরেশচন্দ্রকে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিবেন। অনুরোধে

যখন তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন কৌশলে আপনার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে তিনি মনোরমার শরণাপন্ন হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রামকানাই মনোরমাকে এত দুর বশীভূতা করিলেন যে, মনোরমা তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দাসীর মত তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিল। সুরেশচন্দ্র রামকানাই বাবুর অনুরোধ অধিক দিন উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মনোরমা যখন সুরেশচন্দ্রের প্রতি রামকানাইয়ের অনুরোধ উপেক্ষা করাতে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিল, বিলাসিনীর কি মহিমা, সুরেশচন্দ্রের হৃদয়ও সে সময় বিচলিত হইল।

চারু-চিত্রে চিত্রিত গৃহভিত্তিকায় সংলগ্ন বেলোয়ারী বর্ত্তিকাধারে উজ্জ্বল আলোক, বৃহৎ দর্পণে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়া গৃহের শোভা শতগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। পার্শ্বে মেহগ্নী-কাষ্ঠের কারুকার্য্য-শোভিত বিচিত্র পালঙ্ক; তদুপরি দুগ্ধফেননিভ শয্যা, নিম্নেও তাহাই। অনেকগুলি বসন্তের অনুচরের মত বন্ধুগণ একত্রে সমবেত। তাহার মধ্যস্থলে ফরাসী-দেশীয় মূল্যবান্ স্যাম্পেন। রামকানাই বাবু পানপাত্র পূর্ণ করিলেন, মনোরমার মুখের দিকে চাহিলেন, চখে চখে অনেক কথাবার্ত্তা হইল, মনোরমা তৃপ্তির সহিত রামকানাই-প্রদত্ত সেই সুরা পূর্ণ-মাত্রায় পান করিলেন। বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে সমভাবে একবার পানপাত্র ঘুরিয়া আসিল। সুরেশ বাবুকে রামকানাই আবার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি বিরক্তি বোধ করিলেন।

মনোরমা এখন বেশ গাহিতে পারে। রামকানাই বাবুর প্রস্তাবে কলিকাতা হইতে ওস্তাদ আনাইয়া মনোরমা সঙ্গীত শিক্ষা করিত। রামকানাইও কলাবিস্তায় অনিপুণ ছিলেন না।

চাকর হারমোনিয়ম দিয়া গেল। রামকানাই বাজাইতে লাগিলেন, আর মনোরমা গাহিতে লাগিলেন।

"যাও যাও ফিরে যাও আরে মন বাঁধা যেখানে।
পরেরি পরাণ তুমি আমি কি তা জানিনে॥
তুমি এসেছ এখানে,
সে যদি তা শোনে কানে,
বিচ্ছেদে মনের খেদে ম'রে যাবে মনাগুনে॥"

খাম্বাজ রাগিণী সপ্তমে উঠিল। সেই সুস্বর-লহরী গৃহমধ্যে ধ্বনিত হইতে লাগিল। অপ্সরা-লাঞ্ছিত মনোরমার মধুর স্বরে মুগ্ধচিত্ত যুবকমণ্ডলীর ব্যগ্র আঁখি তাহার মুখের উপর নিপতিত হইল। সেই বিম্বোষ্ঠের ঈষৎ কম্পন, স্ফুরিতাধরের মধুর হাসি, কম্পিত বক্ষের উত্থান-পতনের অপূর্ব্ব শোভা। আঁখি ইচ্ছা করে—সহস্র বৎসর ধরিয়া অনিমেষ-নেত্রে সে শোভা দেখি। কোন চিত্র - স্বর্গের কিংবা নরকের, তাহা বলিতে পারি না; যদি নরকের হয়, তাহা হইলে এ নরকে যাইবার পথ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত।

গান থামিল। শ্রান্তি বশতঃ মনোরমা সুরেশচন্দ্রের স্কন্ধের উপর হেলিয়া পড়িল; তাঁহার লম্বিত কোঁচার অগ্রভাগ হস্তে লইয়া বাতাস খাইতে লাগিল। রামকানাই আবার পানপাত্র পূর্ণ করিল। মনোরমা আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া, নিজে একটু খাইল, অবশিষ্টটুকু সুরেশ বাবুর হস্তে দিল। একটু হাসিয়া, একবার তাঁহার দিকে চক্ষু ফিরাইয়া, যেন তাঁহার হৃদয়কে চমকিত করিয়া ছলনাময়ী স্বৈরিণী তাঁহাকে মদ্য পান করিতে অনুরোধ করিল। চঞ্চলচিত্ত সুরেশচন্দ্র

এবার আর তাহার এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার প্রতিজ্ঞার বন্ধন খুলিয়া গেল। হায় নারী! তোমার আঁখি নীলমণিময়, শরচ্চন্দ্রের শোভা তোমার মুখের শোভায় হার পায়, তুমি প্রকৃতিগঠিতা কোমলতাময়ী, তোমার তুলনা তুমি ; কিন্তু তোমার অন্তঃকরণ কেন পাষাণনির্ম্মিত, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই।

সুরাদেবি! আমি অবনত-মস্তকে তোমাকে প্রণাম করি, কি ভয়ঙ্কর শক্তি তোমার! তুমি সর্ব্বসন্তাপ-হারিণী! তোমার প্রসাদে পুত্রশোকাতুর তাঁর উপযুক্ত পুত্রের আশৈশবের স্মৃতি মুছিয়া ফেলে। যন্ত্রণাময় সংসারে সহস্র চিন্তার দংশনে জর্জ্জরিত দেহ তোমার অনুকম্পায় কিছুক্ষণের জন্যও শান্তি লাভ করে। তোমার যেখানে অধিকার, সেখানে ধর্ম্ম লুপ্ত, চেতনা অন্তর্হিত। তুমি ত্রিদেবের সুধা কিংবা রকের তীব্র হলাহল, তাহা স্থির করা মানবের সাধ্যাতীত।

ব্যভিচারী সুরেশচন্দ্র মদ্যপায়ী হইলেন। তাঁহার মনের বন্ধন অনেক দিন খুলিয়া গিয়াছিল, তবুও পূর্ব্বস্মৃতি মাঝে মাঝে তাঁহাকে সন্তাপিত করিত। হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিগুলি তখনও পর্য্যন্ত একেবারে লোপ পায় নাই। তাঁহার এক সময়ের প্রিয় পরিজনবর্গের পবিত্র ছবিগুলি তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে অস্পষ্টভাবে অঙ্কিত ছিল। আজ তাহা একেবারে মুছিয়া ফেলিবার জন্য তিনি রামকানাই-প্রদত্ত সেই সুধা আবার পান করিলেন। রামকানাই বাবু আবার পান-পাত্র পূর্ণ করিল, সমবেত বন্ধুবর্গের মধ্যে আবার তাহা সমভাবে ঘুরিয়া আসিল। মনোরমা আবার পানপাত্র ধারণ করিয়া

সুরেশ বাবুকে আবার অনুরোধ করিল। সুরেশ বাবু এবার অবিকৃত-মুখে তাহা পান করিলেন। এখন নিজেই মনোরমাকে অনুরোধ করিলেন, 'মনোরমা আর একটা গান গাও।' মনোরমা আবার গান ধরিল :—

"সে যে অতীতের স্মৃতি অতি সুমধুর,
মরম-বীণার আকুল তান।
প্রাণের আবেগে নব অনুরাগে
গাহি সদা তারি মহিমা-গান॥
আপন-রাজ্যে সে রাজরাজেশ্বর
আঁধার হৃদয়ে শ্যাম শশধর
বঙ্কিম অধরে মৃদু মধু-হাসি
সে চরণ দাসী করিছে ধ্যান॥
উষার হৃদয়ে অরুণ রেখা
সান্ধ্য গগনে তপন-লেখা (সে যে)
অনন্ত জগতে প্রশান্ত হৃদয়
কাতরে করিছে দান॥"

কি সুমধুর কণ্ঠস্বর! সুরেশ বাবু আত্মহারা হইয়া মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার লাবণ্য-সরোবর যেন বাসন্তী পবনে কাঁপিতেছে, নাচিতেছে, আর সেই সরসী-হৃদয়ে তাহার সেই আঁখি—সহস্রদলশোভিত নীলকমল তুল্য আঁখি মন্মথের ফুলধনু তুল্য আঁখি। ইচ্ছা করে, সহস্র বৎসর ধরিয়া দেখি, যত দেখি, দেখার সাধ ত মিটে না।

রূপবতী নারী! কি উন্মাদকরী শক্তি তোমার, যে শক্তির

প্রভাবে তুমি সমস্ত জগৎ আকর্ষণ করিয়া তোমার চরণতলে নিক্ষেপ করিতে পার!

গান থামিল। রামকানাই আবার পানপাত্র পূর্ণ করিলেন। প্রথমেই তাহা আবার সুরেশ বাবুর হস্তে পড়িল। তিনি আবার তাহা উদরস্থ করিলেন। আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল। কি সুন্দর—কবির বর্ণনায় ত্রিদিবের কথা পড়িয়াছেন, যেখানে সুরাঙ্গনাগণসহ ত্রিদশাধিপতি সুরগণে বেষ্টিত হইয়া রতিরূপ ফলসাধক কল্পতরু-সম্ভূত সুরাপানে সর্ব্বদা আসক্ত থাকেন, যে স্থানে উন্মত্ত ভ্রমরকুল নিত্য প্রস্ফুটিত মন্দার-মধুপানে উন্মত্ত হইয়া শ্রুতিসুখকর গুন্ গুন্ ধ্বনি করে, যে স্থানে অমার অন্ধকার নিত্য জ্যোৎস্নালোকে প্রতিহত, নিত্য কোকিল-কূজন শ্রবণতৃপ্তি করে, যে স্থানে আনন্দ ভিন্ন কখন চক্ষের জল পতিত হয় না, যে স্থানে মন্মথের কুসুম-শরাঘাতে চিত্তের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাওয়া ভিন্ন অন্য কোন কারণে সন্তাপ নাই, যেথায় দুঃখ নাই, শোক নাই, চিন্তা নাই, বিষাদ নাই, বিড়ম্বনা নাই; সুরেশ বাবু মনোরমার সঙ্গে একত্রে অবস্থিতি করিয়া সুরাদেবীর কৃপায় সেই ত্রিদিবের ছবি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। মনোরমার মনোমহিনী রূপ যেন প্রাবৃটের কুলপ্লাবী স্রোতস্বিনী—রূপের তরঙ্গ খেলিতেছে। আর সেই আঁখি, আকর্ণ-বিস্তৃত নীলকমল তুল্য আঁখি, সন্ত্রস্ত কুরঙ্গিণীর মত চারি দিকে বিলোল অপাঙ্গে হৃদয় বিদ্ধ করিতেছে। আর তাহার সেই কুঞ্চিত ভ্রমরকৃষ্ণ অলকদাম তাহার ললাটপ্রান্ত হইতে অপসারিত হইয়া কতক বা গণ্ডস্থলে কতক বা চক্ষের উপর পড়িয়াছে। শ্রান্তি বশতঃ স্বেদনীর মুক্তাফলের মত বিন্দু বিন্দু ঝরিতেছে।

সুরাপানে সুরেশচন্দ্র উন্মত্ত হইলেন। তাঁহার লজ্জা-সম্ভ্রম সমস্ত দূর হইল; এবার সুরাপানার্থে স্বয়ং রামকানাইয়ের দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন; আবার সেই তীব্র হলাহল আকণ্ঠ উদরস্থ করিলেন। সুরার তেজে তিনি জ্ঞানশূন্য হই-লেন; তাঁহার সমস্ত শরীরের শোণিত-প্রবাহ যেন প্রচণ্ড অনলে ফুটিতে লাগিল। কামানলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িতে লাগিল। তখন উন্মত্তের ন্যায় মনোরমাকে ধরিবার জন্য উভয় হস্ত প্রসা-রিত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হতচৈতন্য হইয়া মনোরমার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন। মনোরমা তাঁহার সংজ্ঞাশূন্য দেহ শয্যার উপর রাখিয়া দিল।

রামকানাইয়ের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে আর কোন বাধা নাই। তিনি তখন সঙ্কেত করিয়া সমবেত বন্ধুগণকে উঠিতে বলিলেন। তাহারা সকলেই আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল।

দুষ্ট রামকানাই মনোরমার হাত ধরিল। তাহার মস্তক আপনার স্কন্ধের উপর রাখিয়া বাম-বাহুর দ্বারা তাহার দেহ বেষ্টন করিল। তখন সেই নির্জ্জন নিশীথে সেই নিভৃত স্থানে দুই জনে দুই জনের পাপ অভিসন্ধির কথা ব্যক্ত করিল। জাহ্ন-বীর কলতান, আকাশের নক্ষত্র, আর সকলের উপর যাঁর চক্ষের অগোচরে মানুষের কোন কার্য্যই সাধিত হয় না, সেই সর্ব্বশক্তি-মান্ ধর্ম্ম তাহাদের পাপকার্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিল।

সুরেশচন্দ্রের সংজ্ঞাহীন দেহ সে রাত্রির মত সেই শয্যার উপর পড়িয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সকলে যেমন শুনিয়াছে যে, সুরেশচন্দ্র তাঁহার প্রতিপালক জমিদার-কন্যাকে কুলত্যাগিনী করিয়া লইয়া রামকানাই বাবুর বাগান-বাটীতে বাস করিতেছেন, সুলোচনাও সেইরূপ শুনিতে পাইলেন, তাঁহার স্বামীর কত দূর অধঃপতন হইয়াছে। এই সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন; মন সহজে এ কথা বিশ্বাস করতে চাহিল না। মনে ভাবিলেন, 'এ কথা কি মিথ্যা হয় না?' আজ দুই বৎসর তিনি স্বামীকে দেখেন নাই; দুই বৎসর পূর্ব্বের স্বামীর বিদায়ের স্মৃতি, তাঁহার তপ্ত অশ্রুজল, তাঁহার ভালবাসার মধুর আলাপ, মধুর সান্ত্বনা-বাক্য—এই সমস্ত অবলম্বন করিয়া তিনি হাসি মুখে সংসারের সমস্ত কষ্ট, বিরহের তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন। স্বামীর অকলঙ্ক চরিত্র, অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি, রমণী মনোহর রূপ-মাধুরী তাঁহার সমস্ত মনকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। বড় কাতর হইয়া সুলোচনা ননদিনী মায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরঝি, এ কথা কি সত্য?" প্রত্যুত্তরে মায়া তাঁহাকে বলিলেন, "মিথ্যাই বা বলি কেমন ক'রে? গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—এ কথা কাহারও শুনিতে বাকী নাই। বৌ, এত দিনে তোমার কপাল ভাঙ্গিল!"

সুলো। ঠাকুরঝি, জগদীশ্বরের নিকট আমি নিত্য প্রার্থনা করি, যেন তিনি নিরাপদে থাকেন, যেন তাঁর পদে কুশাঙ্কুরও না বিদ্ধ হয়। প্রথম যে দিন তিনি গৃহত্যাগ ক'রে কর্ম্মস্থান

অভিমুখে যাত্রা করেন, তাহার পূর্ব্বদিন বিদায়ের রাত্রে একটা পেচকের কর্কশ স্বরে আমার সমস্ত শরীর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। আমি বড় কাতর হয়ে তাঁকে প্রাণের কথা জানিয়েছিলেম, তিনিও তখন আমার মনস্তুষ্টির জন্য বিদেশযাত্রার জন্য নিরস্ত হ'তে চেয়েছিলেন। ঠাকুরঝি, সেই কথা এখন ভাবি, কেন তখন আমি তাঁকে যেতে দিয়েছিলেম?

মায়া। সকলই জগদীশ্বরের হাত, আর তোমার ভাগ্য। কেহ কি তার স্ত্রী ফেলে বিদেশে যায় না? সকলেই কি দেশে থেকে স্ত্রীর আঁচল ধ'রে বেড়ায়?"

সুলো। ঠাকুরঝি, এ কথা শোনার চেয়ে আমার আধপেটা খেয়েও দিন কাটানো ভাল ছিল। তাঁর সঙ্গে থেকে, তাঁর ভালবাসার অধিকারিণী হয়ে আমি উপবাস ক'রেও হাস্‌তে হাস্‌তে মর্‌তে পারি। এত দিন তাঁকে দেখিনি, তাঁর অদর্শন-ক্লেশ অম্লান-বদনে সহ্য করেছি, মনে স্থির-বিশ্বাস ছিল, তাঁর দেবোপম চরিত্র। ঠাকুরঝি, আমার এ বিশ্বাস ভঙ্গ হবার পূর্ব্বে আমার কেন মৃত্যু হ'ল না?

মায়া। কি কর্‌বে বৌ, সবই তোমার কপাল। নচেৎ দাদা যে চরিত্রভ্রষ্ট হবেন, এ স্বপ্নের অগোচর।

সুলো। রূপে বল, গুণে বল, বিদ্যায় বুদ্ধিতে বল, তাঁর সমকক্ষ লোক এ গ্রামে আর কেউ ছিল না। আমার মনের মত কর্ত্তব্য-পরায়ণ স্বামী, নারীর গর্ব্ব করিবার যা কিছু, সব গুণই ত তাঁর ছিল। বাড়ী থেকে যাবার পর যতবার তিনি আমায় পত্র দিয়েছেন, প্রত্যেক পত্রেই তাঁর গভীর ভালবাসার পরিচয় পেয়েছি। সংসার তাঁর প্রাণ ছিল, ভ্রাতৃস্নেহে হৃদয় পরিপূর্ণ,

তোমাকে কত যত্ন কর্‌তেন। এই এতদিন পরে তিনি দেশে ফিরে এলেন,কৈ ঠাকুরঝি,তোমাদেরও ত একবার দেখ্‌তে এলেন না?

মায়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন;—বলিলেন, "কি বল্‌ব, সবই আমাদের পোড়া কপালের লেখা। আমাদের কপাল মন্দ না হ'লে এমন হবে কেন? তারার বিবাহের সময় কত ক'রে চিঠি লিখ্‌লুম একবার বাড়ী আস্‌তে, বাড়ী এলেন না; লিখ্‌লেন, অনেকগুলি রুগী হাতে, ফেলে যাবার যো নেই; কিন্তু খরচপত্র সমস্ত পাঠিয়ে দিলেন। সংসার-খরচের টাকা পাঠাতে কখন দেরী করেন না,—পাছে আমাদের কোন কষ্ট হয়। জ্যোতিষের লেখাপড়ায় কোন অসুবিধা না হয়, প্রতি পত্রে সে বিষয় লিখে থাকেন। তবে কেমন ক'রে বল্‌ব, তিনি স্নেহহীন?"

সুলো। যা বল্লে ঠাকুরঝি, তাঁর কোন দোষ নেই; কেবল আমাদের পোড়া কপালের দোষ। সবই আমার কপালে ঘট্‌লো, তা নইলে তাঁর স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়?

মায়া। বৌ, তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না। ছলনাময়ী নারীর কুহকে প'ড়ে মানুষ একেবারে অপদার্থ হয়; তার বিদ্যা-বুদ্ধি সমস্ত লোপ পায়। দাদারও তাই ঘটেছে। তাঁর নিজের কোন দোষ নেই, কেবল সর্ব্বনাশীর মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে তিনি একেবারে অপদার্থ হয়েছেন।

সুলো। ঠাকুরঝি, কোন রকমে একবার তাঁকে দেখাতে পার না? একবার যদি তাঁকে দেখ্‌তে পাই, তাঁর পায়ে ধ'রে কাঁদি; জিজ্ঞাসা করি, কি দোষে আমায় তিনি পরিত্যাগ করেছেন? কি অপরাধ করেছি যে, তিনি আমাকে এমন ক'রে শাস্তি দিচ্ছেন?

মায়া। তাই কর্‌তে হবে। জ্যোতিষ স্কুল থেকে আসুক। যেমন ক'রে হোক্, তাঁকে একবার বাড়ী আন্‌তেই হবে। এ সম্বন্ধে তাঁকে বুঝিয়ে বল্লে নিশ্চয়ই তাঁর চরিত্রসংশোধন হবে।

সুলো। তাই কর ঠাকুরঝি, আমি একবার তাঁকে দেখ্‌ব। আজ কত দিন হ'ল, তাঁকে দেখ্‌তে পাইনি। তাঁকে দেখ্‌বার জন্য আমার প্রাণ কত ব্যাকুল হয়, তা আর তোমাকে কি ক'রে জানাব? আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, একবার তাঁর দেখা পেলে, তাঁকে বুঝিয়ে বল্লে নিশ্চয়ই তাঁর স্বভাবের পরিবর্ত্তন হবে। তুমি যা বল্লে, তাই ঠিক, নিশ্চয়ই তাঁকে ডাকিনীতে পেয়েছে, সে মায়াজাল বিস্তার ক'রে তাঁর মতন পুরুষ-রত্নকেও আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। ঠাকুরঝি, আমি সব সহ্য কর্‌তে পারি, তাঁর নিন্দে সহ্য কর্‌তে পারিনে। আমি সব দুঃখ সহ্য কর্‌তে পারি, আধপেটা খেয়েও প্রাণ ধারণ কর্‌তে পারি, তাঁর অদর্শন-কষ্টও সহ্য হয়, যদি শুন্‌তে পাই,যদি জান্‌তে পারি, তিনি আমায় স্মরণ করেন—দাসী ব'লেও মনের কোণে স্থান দেন। এমন কি সৌভাগ্য আমার যে, প্রতিদিন তাঁর চরণ দর্শন কর্‌তে পার্‌ব, কখন কখন মাসান্তে না হোক্, বৎসরান্তেও যদি একবার তাঁর দেখা পাই, তা হ'লেও আমি কৃতার্থ হই।

মায়া। তুমি এক কাজ কর বৌ, একখানা পত্র লিখে রাখ। জ্যোতিষকে দিয়ে কাল সকালে দাদার কাছে পাঠিয়ে দেব। দেখি, তিনি আসেন কি না।

সুলো। তুমি লেখ ঠাকুরঝি, আমি তাঁকে আর পত্র লিখ্‌তে পার্‌ব না। কি ব'লে তাঁকে পত্র লিখ্‌ব, আমি ভেবে

পাই না। তুমি লেখ ঠাকুরঝি, তোমাকে তিনি ভালবাস্‌তেন। তোমার কথায় যদি তিনি একবার বাড়ী আসেন।

মায়া। আমার কথায় কি আস্‌বেন?

সুলো। যদি আসেন ত তোমার কথাতেই আস্‌বেন। আমাকে ত্যাগ কর্‌তে পারেন, কিন্তু তুমি বিধবা ভগিনী, নিরপরাধিনী, সংসারে তোমার আর অবলম্বন নেই, তোমাকে তিনি কোন মতেই ত্যাগ করতে পার্‌বেন না, তোমার অনুরোধ কখনও উপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বেন না।

ভাবিয়া চিন্তিয়া মায়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমিই লিখ্‌বো।"

সেই দিন বৈকালে যখন গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া পানের পাত্র লইয়া সুলোচনা দাওয়ায় বসিয়া পান সাজিতেছিলেন, তখন পাড়ার স্ত্রীলোকেরা একে একে তাঁহাদের বাটীতে আসিল। প্রৌঢ়া, যুবতী, বৃদ্ধা, তরুণী সকলেই সুরেশ বাবুর অন্দর-মহাল উপস্থিত হইল। রামা, বামা, শ্যামা, ক্ষমা, ভাবিনী, যামিনী, তারিণী, কামিনী, সরলা, অবলা, বিমলা, প্রমীলা কেহ বা গম্ভীর-মুখে, কেহ বা ম্লানমুখে একে একে দুইয়ে দুইয়ে সুলোচনাকে জানাইতে আসিল যে, তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, তাঁহার আর সুখ নাই। কেহ বা তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিল, তাঁহার স্বামী ঘোর পাপী; কারণ, তিনি ব্রাহ্মণকন্যা হরণ করিয়া আনিয়াছেন। কেহ বলিল, তাঁহার স্বামীর কীর্ত্তিধ্বজা অনেক দূর উড়িয়াছে। কেহ বলিল, তাঁহার স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ হইয়াছে, এইবার তাঁহাকে জেল খাটিতে হইবে। সহানুভূতি দেখাইতে কেহ বা তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, পুরুষের মন পরিবর্ত্তন হইতে অধিক দিন লাগে না। তাঁহার স্বামী

সত্বরেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিবেন। সুলোচনা কাহারও কথার কোন উত্তর দিলেন না; নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া অবনত-বদনে গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন।

মায়া তখন পুষ্করিণীতে জল আনিতে গিয়াছিলেন। পূর্ণ-কলস কক্ষে লইয়া গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া একবার সমবেত নারী-বৃন্দের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাহাদের আগমনের কারণ কি? দাওয়ার উপর জলের কলস রাখিয়া, আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিবার অবকাশ না লইয়া, তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের আগ-মনের উদ্দেশ্য কি? তখন কেহ বা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, কেহ বা গ্রীবা বাঁকাইয়া,কেহ বা অবনত-বদনে-কেহ বা আড়নয়নে মুখের হাসি অধরে মিলাইয়া তাঁহার কথার উত্তর দিল, তাহাদের আগ-মনের কারণ সুরেশ বাবুর অধঃপতনের সংবাদ প্রদান করা এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে কি করা কর্ত্তব্য, সেই বিষয়ের সদুপদেশ দিতে তাহারা সহস্র কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের বাটীতে উপ-স্থিত হইয়াছে।

দুঃসময় বলিয়া, অন্তরের রাগ অন্তরে চাপিয়া মায়া তাহাদিগকে বলিলেন, যখন আপনাদের উপদেশ নেবার জন্য আপনাদের ডাকৃব, সেই সময় আপনারা আস্‌বেন। উপযাচক হয়ে এসে আপনাদের এ উপদেশ দেবার উপস্থিত কোন আবশ্যক নাই।' তাহার পর একবার সুলোচনার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার অন্তরের ব্যথা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। স্বামিনিন্দায় স্ত্রীলোকের প্রাণ কতদূর কাতর হয়, ভ্রাতৃজায়ার ম্লানমুখ দেখিয়া মায়া তাহা ভাল রকম বুঝিতে পারিলেন। যে সংসারের সর্ব্বা-

পেক্ষা প্রিয়জন, যে তাহার নিন্দা অপরের মুখে শুনিলে প্রাণে বড় আঘাত লাগে।

প্রতিবেশিনী রমণীগণ মাস্কার কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিল। কেহ বা নিরুত্তরে উঠিয়া গেল। মনের রাগ মনে মিলাইয়া কেহ বা বিকৃতমুখে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। স্পষ্টবাদিনী কোন কোন প্রৌঢ়া রমণী তর্জ্জনী হেলাইয়া বলিল, 'অত গুমর থাক্‌বে না। ধোবা-নাপিত বন্ধ হবে।' সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে কেহ বা দুঃখিত-ভাবে বলিল, "তোমাদের ভালর জন্যই এসেছিলাম, নইলে আমাদের অত মাথাব্যথার দরকার কি?"

যখন সকলে চলিয়া গেল, সুলোচনা তখন কাঁদিতে বসি-লেন। এ সংসারে তাঁহার গর্ব্ব করিবার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই ধূলিসাৎ হইয়াছে। মায়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। সেই দিনেই তিনি সুরেশ বাবুকে পত্র লিখিলেন। পরদিন প্রাতঃ-কালে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর জ্যোতিষকে দিয়া সেই পত্র সুরেশ বাবুর নিকট প্রেরণ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুরেশ বাবুর বাটী হইতে রামকানাই বাবুর বাগান-বাটী প্রায় দেড় ক্রোশ ব্যবধান। এই দেড় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া পঞ্চদশ-বর্ষীয় বালক জ্যোতিষচন্দ্র ভগিনীর প্রদত্ত পত্র লইয়া দাদার নিকট উপস্থিত হইল।

সুরেশবাবু সেই সময় গঙ্গাতীর সংলগ্ন সেই বাগানের সীমান্ত-বর্ত্তী একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ তলে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়াছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার আদরিণী মায়াবিনী মনোরমা। তাহার দক্ষিণ হস্তোপরি সুরেশ বাবুর বামহস্ত স্থাপিত করিয়া, তাঁহার স্কন্ধের উপর তাহার মস্তক রক্ষা করিয়া তাহার লম্বিত অলকা দাম তাহার পৃষ্ঠ দেশে এলাইয়া দিয়া বিমোহিত চিত্তে ভাগিরথীর অপুর্ব্ব লহরীলীলা দেখিতেছিলেন।

এইরূপ সময়ে সুরেশের কনিষ্ঠ সহোদর জ্যোতিষচন্দ্র ভগিনীর পত্র লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সুরেশ বাবু ভ্রাতার এই আকস্মিক উপস্থিতিতে একেবারে স্তম্ভিত হইলেন। মনোরমা সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহার পার্শ্ব হইতে একটু সরিয়া বসিল। পরিজনবর্গের পবিত্র স্মৃতি সুরেশ বাবু একরূপ বিস্মৃতি-সাগরে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন, বিলাসের সপ্ত-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া মন্মথের কুসুম-শরাঘাতে জর্জ্জরিত দেহ লইয়া তিনি এ দুনিয়ায় আর কিছু দেখিতে পাইতেন না। কেবল তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে মনোরমা আর তাহার অপরূপ রূপরাশি। বিমোহিনী ছবি যেন চিত্রকরের নিপুণ তুলিকায় সযত্নে অঙ্কিত। আজ এক

যাস হইল, তিনি দেশে আসিয়াছেন এবং সেই বাগান-বাটীতে মনোরমাকে লইয়া ধরায় নন্দনকাননের সৃষ্টি করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছেন। বিলাসের সর্ব্ব-উপকরণে সুসজ্জিত থাকিয়া, ভোগৈশ্বর্য্যের সপ্ত সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া সুরেশচন্দ্র বিন্দুমাত্রও অবসর পান নাই যে, ক্ষণেকের জন্যও মনের কোণে তাঁহার এক সময়ের প্রিয় পরিজনবর্গকে স্থান দেন। তাই আজ অকস্মাৎ তাঁহার কনিষ্ঠকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তিনি প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন এবং কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিস্তব্ধভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বালক জ্যোতিষচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আপনার পকেট হইতে পত্রখানি লইয়া দাদার হস্তে দিলেন। কম্পিত-হস্তে সুরেশচন্দ্র সে পত্র গ্রহণ করিলেন। সেই পুরাতন পরিচিত হস্তাক্ষর, অনেক দিন দেখেন নাই, তাঁহার বড় স্নেহের ছোট বোনটি, তাহার মায়া-মমতা, তাহার নির্ম্মল ভালবাসা, তাহার অকৃত্রিম স্নেহ-ভক্তি তাঁহার মনে পড়িল। মুহুর্ত্তের জন্য তখন তাঁহার মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল, তাঁহার সমস্ত শরীর যেন কাঁপিতে লাগিল। আর এক জনের কথাও সেই সময় তাঁহার মনে উদয় হইল, সে এখন কি অবস্থায় আছে? তাঁহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন শুনিয়া না জানি, তার প্রাণে কত ব্যথা বাজিয়াছে। তাঁহার ভাব-বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি করিয়া মনোরমা জ্যোতিষচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বৈঠকখানার গৃহে যাইলেন। সুরেশ বাবুও তাঁহাদের অনুগমন করিলেন।

ছলনাময়ী মনোরমা জ্যোতিষচন্দ্রকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিল। কপটতার আবরণে অঙ্গ ঢাকিয়া স্বেচ্ছাচারিণী

স্বৈরিণী উপপতির ভ্রাতাকে আপনার স্বামীর সহোদর ভ্রাতার মত মিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট করিল। তাঁহাদের বাটীর সকলের কুশল-সমাচারাদি জিজ্ঞাসা করিয়া পরিচয় দিল, সে যেন তাঁহাদের পরমহিতৈষিণী - নিকট আত্মীয়া। মনোরমার অনুরোধে এবং জ্যেষ্ঠের আগ্রহাতিশয়ে জ্যোতিষচন্দ্র সেখানে মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া সমাপণ করিতে বাধ্য হইল। অপরাহ্নে যখন জ্যোতিষচন্দ্র দাদাকে বাটীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল, তখন মনোরমা সুরেশ বাবুর হইয়া তাহাকে বলিল, 'আজ যাইতে পারিবেন না।' তাহার কারণ দেখাইল, সেদিন তাহাদের কতকগুলি অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব রাত্রে তাহাদের বাটীতে আহারাদি করিবেন। ভদ্রতার খাতিরে মনোরমা জ্যোতিষকেও থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিল। জ্যোতিষচন্দ্র অসম্মত হইলে সুরেশ বাবু ভ্রাতাকে বলিয়া দিলেন যে, পরদিন প্রাতঃকালে তিনি নিশ্চয় বাটী যাইবেন।

জ্যোতিষচন্দ্র চলিয়া গেলে মনোরমা সুরেশ বাবুকে বলিল, "তুমি বাটী যাইতে পারিবে না।" সুরেশ বাবু বিস্মিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন?" মনোরমা গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমার হুকুম।"

মনোরমার কথা শুনিয়া সুরেশ বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, বিষণ্ণ মুখে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া মনোরমা তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন করিতে তাঁহাকে বাহুলতায় বেষ্টন করিয়া তাঁহার অধরে ধীরে ধীরে চুম্বন করিল। তাঁহাকে মিষ্ট-বাক্যে বলিল, "তোমাকে ছাড়িয়া দিতে আমার ভরসা হয় না।"

সুরেশচন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল। একদৃষ্টে তিনি মনোরমার

মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই মুখ—যে মুখের শোভা দেখিয়া তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া গৃহধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। যে মুখ দেখিয়া তিনি উন্মাদ হইয়াছেন—যে মুখের মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া এক অপূর্ব্ব আশালোকোদ্ভাষিত চিত্তে তাঁহার সংসারের সমস্ত প্রিয়জনের ছবি মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছেন। সুরেশ বাবু আজ একবার ভাল করিয়া সেই মুখখানি দেখিলেন।

তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া মনোরমা বলিল, "কি ভাবছো ?"

সুরেশ। ভাববার অনেক আছে মনোরমা কিন্তু তুমি-ত ভাবতে দাও না। মুখ দেখে সব ভুলেছি, প্রিয় পরিজন, অনুগত ভার্য্যা, মায়ার পুতলী ভাই ভগিনী সব ভুলেছি মনোরমা। কি জন্য সংসারে এসেছি, কি কাজ করে যাচ্ছি কিছুই ত ভাবতে দাও না। কেবল ঐ রূপ, তোমার ঐ রূপ দেখে অন্ধ হয়েছি, তাই চক্ষে আর কিছুই দেখতে পাই না। আত্মীয় স্বজনের কাতর প্রার্থনায় যদি আমার প্রাণে বিন্দুমাত্রও সহানুভূতির উদ্রেক হয়, তাই তাদের একবার চক্ষের দেখা দেখতেও তুমি বারণ কচ্ছ।

মনো। কেন আমি তাদের জন্য না কচ্ছি কি ? প্রতিমাসে তোমার সংসার খরচের টাকা পাঠাচ্ছি। আমি ত তোমায় বলেছি, আমি সব দিতে পারি, সব দিতে পারব, কেবল তোমায় দিতে পারব না। তোমার জন্য আমি সমস্ত ছেড়ে এসেছি, তোমায় ছাড়তে পারবো না।

সুরেশ। তোমার কথাই থাকবে। আমি আর কখন তাদের নাম পর্য্যন্তও মুখে আনবো না। এখন আমার আর কোন ভাবনা নেই, কেবল ভাবি—তুমি যদি আমায় ত্যাগ কর।

মনো। এ জন্মে নয়। তোমাকে ত বলেছি,—এ জন্মে তোমাকে ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌বো না, কিন্তু তুমি ত আমায় কখন ত্যাগ ক'র্‌বে না।

সেই রাত্রে রামকানাই বাবু ও তাঁহার অনুচরবর্গ আবার সকলে উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত বীভৎস ব্যাপারের অনুষ্ঠানের বিন্দুমাত্রও ত্রুটি হইল না। সুরেশ বাবু আবার তাহাদের সহিত মদ্যপান করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ঘোরতর মাতাল হইয়া দাঁড়াইলেন। রামকানাইয়ের অভীষ্ট সিদ্ধির বিষয়ে আর কোন বাধা রহিল না। মনোরমা মনে করিল সে যখন কুলত্যাগিনী তখন তাহার পক্ষে রামকানাই আর সুরেশ বাবু সবই সমান।

মনোরমা সঙ্গে যে টাকা আনিয়াছিল, তাহা প্রায় লক্ষ টাকা হইবে। সুরেশ বাবুর পরামর্শ মত সেই সমস্ত টাকায় কোম্পানীর কাগজ খরিদ করা হইয়াছিল। প্রতিমাসে সুরেশ বাবু কলিকাতায় যাইয়া কোম্পানীর কাগজের সুদ বাহির করিয়া আনিতেন। মনোরমার নামে আশী হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ব্যাঙ্কে ক্রয় করা হইয়াছিল।

জ্যোতিষচন্দ্রকে একাকী বাটী ফিরিতে দেখিয়া মায়া ও সুলোচনা উৎসুকা সহকারে তাহাকে সুরেশ বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক জ্যোতিষচন্দ্র তাঁহাদিগকে সমস্ত কথাই বলিল এবং মনোরমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সুখ্যাতি করিল। সুরেশচন্দ্র কাল সকালে আসিবেন, ইহা তাঁহাদের বিশ্বাস হইল।

মায়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু সুলোচনা স্বামীর

আগমন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। এই সম্বন্ধে ভ্রাতৃজায়াতে ও ননদিনীতে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সকলেই সুরেশ বাবুর আগমন প্রতীক্ষা করিলেন। সুলোচনা সমস্ত দিন পথের পানে চাহিয়া রহিলেন। যখন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাঁহারা দেখিলেন, সুরেশ বাবু আসিলেন না, তখন সুলোচনা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ননদিনীকে বলিলেন, "আমি ত তখনি বলেছিলাম ঠাকুরঝি, যে তিনি আসিবেন না।"

মায়া। তাই ত বৌ, বলেছিলেন আস্‌বেন, তবে কেন এলেন না?

সুলো। ছলনা ঠাকুরঝি, কুহকিনীর কুহকে পড়েছেন, কি ক'রে আস্‌বেন? কি হবে ঠাকুরঝি, একবার কি দেখ্‌তেও পাব না?

মায়া। কি করব, আমি ত ভেবে কিছুই স্থির কর্‌তে পাচ্ছি না। ছেলেমানুষ নয় যে, ধ'রে নিয়ে আস্‌ব।

সুলো। ঠাকুরঝি, একবার কি দেখাতে পার না? শুধু একটিবার তাঁকে দেখ্‌তে চাই। একবার তাঁর দেখা পেলে তাঁর পায়ে ধ'রে জিজ্ঞাসা কর্‌ব, আমায় কি দোষে তিনি এত কষ্ট দিচ্ছেন? তাঁর চরণে আমি কি অপরাধ করেছি যে, সেই অপ-রাধের এই শাস্তি?

মায়া জ্যোতিষচন্দ্রকে বলিলেন, "হাঁ রে জ্যোতিষ, তুই এক কাজ কর্‌তে পারিস্?"

জ্যোতিষ। কি কাজ দিদি?

মায়া। তুই সন্ধান নিতে পারিস্, দাদা কি একবারও বেরোন না, কি কোথাও একা যান না?

জ্যোতিষ। তা পার্‌ব না কেন? তা যেন নিলুম, তা হলেই বা কি হবে?

মায়া। তিনি যখন একা থাক্‌বেন, তখন তাঁকে বুঝিয়ে বল্লে নিশ্চয়ই তাঁর মন নরম হবে। সে ডাকিনী মাগীর সাম্‌নে বল্লে কিছুতেই তাঁকে আস্‌তে দেবে না।

সুলোচনা। তুমিও যেমন ঠাকুরঝি, তাঁর আস্‌বার ইচ্ছা হ'লে কেউ তাঁকে ধ'রে রাখ্‌তে পারে?

মায়া। তুমি বোঝ না বৌ। সাম্‌না-সাম্‌নি দাদা কখন তার কথা ঠেল্‌তে পারেন না; কিন্তু আড়ালে বল্লে দাদা সদরে না হোক, লুকিয়েও একবার নিশ্চয়ই আস্‌বেন।

সুলো। এত দূর পর্য্যন্ত তাঁকে বশ করেছে যে, তাঁর ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বাড়ীতে একবার আস্‌তে পারেন না।

মায়া। না কর্‌বার ত কোন কারণ নেই। দাদার হাত ধ'রে সে ঘরের বার হয়েছে, দাদার জন্য সে ধর্ম্মকর্ম্ম, তার স্বামী, বাপ-মা সব ছেড়ে এসেছে। এখন দাদা তার কথা শুনতে বাধ্য। তার উপর শুনেছি, তার অগাধ টাকা; অপরিমিত ধন—ঐশ্বর্য্য।

সুলো। তা হ'লে কি এ জন্মে তাঁকে দেখ্‌তে পাব না?

মায়া। হতাশায় ভেঙে পড়ো না বৌ, সাহসে বুক বাঁধ। তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হ'লে নিশ্চয়ই দাদার মতি-গতি ফির্‌বে। সে যখন তার স্বামী ত্যাগ ক'রে এসেছে, তখন নিশ্চয় মনে জেনো, সে দাদার নিকটও অবিশ্বাসিনী হবে। তখনই তাঁর ভুল বুঝতে পার্‌বেন, তার পূর্ব্বে তাঁর চোখ ফুট্‌বে না।

সুলোচনা ননদিনীর যুক্তিই উত্তম বিবেচনা করিলেন। জ্যোতিষচন্দ্র ভগিনীর পরামর্শমত সন্ধান লইতে লাগিলেন, কখন্ সুরেশ বাবু বাটীর বাহির হন। সন্ধানে জানিলেন যে, কখন কখন তাঁহাকে মনোরমার কাজ করিতে কলিকাতায় যাইতে হয়। তখন মায়ার পরামর্শমত স্থির হইল, এবার যখন সুরেশ বাবু কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন, জ্যোতিষচন্দ্র সেই সময় রাণাঘাট ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিবেন এবং যে কোন উপায়ে হউক, দাদাকে বাটী আনিবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভগিনীর উপদেশমত জ্যোতিষচন্দ্র সন্ধানে রহিলেন, কোন্ সময়ে সুরেশ বাবু কলিকাতায় যাত্রা করেন। তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল না। ইহার এক মাস পরে সুরেশ বাবু কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে আনিবার জন্য ভগিনীর অনুমতি লইয়া জ্যোতিষচন্দ্র তাঁহার প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিয়া তিন দিবস রাণাঘাট ষ্টেশনে রাত্রিযাপন করিলেন। তিন দিবস পরে সুরেশ বাবু ট্রেণ হইতে নামিলেন। জ্যোতিষচন্দ্র ভ্রাতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সুরেশ বাবু কনিষ্ঠকে সে স্থানে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পরে যখন তাঁহার নিকট তাঁহার আগমনের কারণ জানিতে পারিলেন, তখন আর তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না।

অনেক দিনের পর অপরাধীর মত কম্পিত-হৃদয়ে সুরেশচন্দ্র সহোদর সমভিব্যাহারে বাটী প্রবেশ করিলেন। প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার চরণ কম্পিত হইতে লাগিল। সেই চির-পরিচিত আনন্দ-নিকেতনে প্রবেশ করিতে তাঁহার অন্তঃকরণ আশঙ্কায় অভিভূত হইল। এ সংসারে তাঁহার যাহা কিছু প্রিয় বস্তু সমস্তই সেই গৃহে অবস্থান করিতেছে। এমন এক দিন ছিল, বহু দিন অনুপ-স্থিতির পর বাটী প্রবেশকালে আনন্দে তাঁহার অন্তঃকরণ স্ফীত হইত, সুখোচ্ছ্বাসে বক্ষঃস্থল কম্পিত হইত। কিন্তু সে দিন আর নাই। কেন নাই?—তাঁহার নিজের দোষে।

বহু দিনের পর বাটী আসিবার সময় সুরেশ বাবু কল্পনায় মনের মধ্যে কত সুখের চিত্র অঙ্কিত করিতেন। প্রাণপ্রতিমা সহধর্ম্মিণীর নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্রমা—যে মুখ মনে ভাবিয়া সুখ, সেই মুখ চক্ষে দেখিবেন। তাঁহার সেই মৃণাল-বিনিন্দিত বাহু-বেষ্টিত আলিঙ্গন কল্পনায় ভাবিয়া সুরেশচন্দ্রের হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইত, অধীরভাবে তিনি সময়ের অপেক্ষা করিতেন, কতক্ষণে সেই কল্পনা সত্যে পরিণত হইবে? সেই সব আছে, সেই সুখ-দুঃখভাগিনী সহধর্ম্মিণী, মায়ার প্রতিমা ভগিনী, মায়া-অনুগত স্নেহপরায়ণ সহোদর সবই ত আছে, কিন্তু তাঁহার মনে সুখ নাই, চিত্তে শান্তি নাই।

সুরেশ বাবু বাটী প্রবেশ করিয়াই প্রথমে মায়াকে দেখিতে পাইলেন। 'দাদা' বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া মায়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনেক দিনের পর এই স্নেহ-সম্বোধন তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল। সুরেশচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে তিনি ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়া, ভাল আছ ত?" পাছে তিনি লজ্জিত হন, এই আশঙ্কায় মায়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না, এত দিন তিনি কি ক'রে তাঁহাদের ভুলে ছিলেন, এত দিন তিনি কেন আসেন নাই? কেবল তাঁহার উত্তরে বলিলেন, "হাঁ দাদা?"—তাহার পর পরম সমাদরে মায়া তাঁহার দাদাকে সঙ্গে লইয়া গৃহে আসন পাতিয়া দিলেন। তখন গ্রীষ্মকাল; সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। পথশ্রমে সুরেশচন্দ্রের সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত, মায়া শীঘ্র-হস্তে পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

জগদীশ্বরের সৃষ্টিতে এমন মধুর সম্পর্ক, এমন স্নিগ্ধ ভালবাসা

বুঝি আর নাই। ভ্রাতার জন্য ভগিনীর হৃদয়ে কত আগ্রহ, ভ্রাতাকে সুখী দেখিতে, তাঁহার বিন্দুমাত্র অভাব মোচন করিতে ভগিনীর হৃদয় কত ব্যাকুল হয়! ভ্রাতাকে আদর-যত্নে তাঁহার সংসারের দুঃখ ভুলাইতে স্নেহশীলা সহোদরার কত আকিঞ্চন! সব সম্পর্ক ছিন্ন হইতে পারে,কিন্তু ভ্রাতা-ভগিনীর মধুর স্নেহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার কাহারও সাধ্য নাই। বহু দিন পরে আজ সুরেশচন্দ্রকে দেখিয়া মায়ার হৃদয় কি আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, তাহা এই ক্ষুদ্র লেখনীতে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

সুলোচনা সে সময় রন্ধনশালায় ছিলেন। জ্যোতিষচন্দ্র ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন, তাঁহার দাদা আসিয়াছেন। এ সংবাদ শ্রবণমাত্রেই সুলোচনার ব্যাকুলতা যেন সহস্রগুণে বৃদ্ধি পাইল। মন সহজে বিশ্বাস করিতে চায় না, নারী-জীবনের তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু, যাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখিবার তরে তিনি সমস্ত উৎসর্গ করিতে পারেন। তাই স্তম্ভিতার মত বিস্মিত-নেত্রে দেবরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

জ্যোতিষ। আমার দিকে অমন ক'রে চেয়ে রয়েছ কেন বৌ-দিদি?

সুলো। তুমি ত ঠাট্টা কর্‌ছ না?

জ্যোতিষ। বেশ, ঠাট্টা কর্‌ছি কি না, তুমি নিজে গিয়েই দেখে এস না। পূবের ঘরে দাদা ব'সে আছেন, দিদি বাতাস কচ্ছে।

"যাব",—এই বলিয়া সুলোচনা আবার ডালে কাঠী দিতে লাগিলেন। জ্যোতিষচন্দ্র তাঁহাকে পরিহাসচ্ছলে বলিল, "বৌ-দিদি, আমাকে সন্দেশ খাওয়াও।"

সুলো। কেন?

জ্যোতিষ। কেন? তুমি ও বলেছিলে, দাদা আস্‌বেন না। আমিই ত তাঁকে নিয়ে এলুম।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দেবরকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সুলোচনা বলিলেন, "খাওয়াব বৈ কি ঠাকুরপো!"

সে দিন সুলোচনা ভাল করিয়া আর রাঁধিতে পারিলেন না। কোন ব্যঞ্জনে অতিরিক্ত লবণ দিলেন. কোন ব্যঞ্জনে একেবারেই ভুল।

দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে পাঠ্যাবস্থায় যখন অবকাশমত সুরেশচন্দ্র বাটী আসিতেন, সুলোচনার হৃদয়ে সে সময় কামনার সহস্র শতদল ফুটিয়া উঠিত, আকাঙ্ক্ষার সাগর উছলিয়া উঠিয়া তাঁহার সমস্ত হৃদয় প্লাবিত করিত। অধীর হৃদয়ে কোনমতে প্রবোধ দিতে পারিতেন না। গুরুজনের নিন্দার ভয়ে দিবাভাগে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না, কিন্তু অধীরভাবে অপেক্ষা করিতেন, কতক্ষণে দিবাবসান হইবে, কতক্ষণে তিনি প্রাণাধিক ইষ্টদেবতার দর্শনে আঁখি পরিতৃপ্ত করিবেন। কিন্তু আজ আর তাঁহার সে আনন্দ নাই। স্বামিসন্দর্শনে হৃদয়ের সে ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু আত্মার তৃপ্তিসাধনে সে আকাঙ্ক্ষা নাই। কেন নাই? আজ তাঁহার উপর সুলোচনার সে আধিপত্য নাই। যে হৃদয়ে একদিন তাঁহার চিত্র সম্পূর্ণ প্রতিফলিত ছিল, এখন সেখানে অন্যের ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। এই বিরাট পৃথিবীতে সুলোচনা এক দিন সুরেশ বাবুর একমাত্র লক্ষ্যস্থল ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কত দূরে অবস্থান করিতেছেন, সুলোচনা তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

এমন সময়ে মায়া আসিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, ডাল শুকাইয়া পুড়িয়া যাইবার মত হইয়াছে, আর সুলোচনা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দারুণ চিন্তামগ্ন। তখন শীঘ্র-হস্তে ডালের হাঁড়িতে জল ঢালিয়া দিয়া ভ্রাতৃজায়াকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "বৌ, তোমার কি সব অন্যায়? কত দিনের পর দাদা বাড়ী এসেছেন, সকাল থেকে এখনও তাঁর খাওয়া হয়নি। ডাল পুড়ে যাচ্ছে, আর তুমি মুখ ফিরিয়ে ব'সে ব'সে ভাব্‌ছ? ভাব্‌বার অনেক সময় পাবে। এখন যাতে তাঁর শীগ্‌গির খাওয়া হয়, সেই চেষ্টা কর।"

সুলোচনা লজ্জিতা হইলেন। তখন ননদিনী ও ভ্রাতৃজায়া উভয়ে মিলিয়া সত্বর রন্ধনকার্য্য শেষ করিলেন। মায়া সম্মুখে বসিয়া সুরেশ বাবুকে আহার করাইলেন। খাইতে বসিয়া সুরেশ বাবুর পূর্ব্বের কথা মনে পড়িল। যখন বাটী থাকিতেন, সুরেশ বাবুকে মায়া এইরূপ যত্ন করিয়া আহার করাইতেন, এইরূপ আদর-যত্ন তিনি অনেক দিন ভোগ করিতে পান নাই।

আহারাদি শেষ হইলে সুরেশ বাবু মায়াকে বলিলেন, "তা হ'লে আজ আমি যাই।"

মায়া। কোথায় যাবে দাদা?

সুরেশ বাবু নিরুত্তরে অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। মায়া পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, "দাদা, আমাদের উপর কি তোমার আর বিন্দুমাত্রও মায়া নাই?"

সুরেশ বাবু অবনতমুখে ভগিনীর কথার উত্তরে বলিলেন, "মায়া নেই, কিন্তু—"

মায়া। কিন্তু কি দাদা?

সুরেশ। সবই ত শুনেছিস্।

মায়া। শুনেছি, শুন্‌তে কিছু বাকী নেই। তুমি যাই কর, আমি তোমার সেই ছোট বোন্। আমার অনেক আব্দার পূরণ করেছ, আমার অনুরোধে দাদা আজকের রাত্রিটে থেকে যাও।

সুরেশ বাবু বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন, "আমি নিজের বশে নেই। কি কর্‌ব, যা হয়ে গেছে, তার আর উপায় নেই।"

মায়া। তবে ব'স, আমি একবার বৌকে ডেকে আনি। একবার তার সঙ্গে দেখা ক'রে যাও। দেখ্‌তে পাবে, ভাল ক'রে তার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে, তোমার জন্য ভেবে ভেবে তার কি চেহারা হয়েছে। তার সোনার অঙ্গে কালী পড়ে গেছে! বৌয়ের আর সে শ্রী নেই!

সুরেশ বাবু ভগিনীর অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না। মায়া দ্রুতগতিতে সুলোচনার নিকটে যাইলেন। দেখিলেন, সুলোচনা বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছেন। তাঁহার ভারী রাগ হইল। তাই একটু কর্কশ-কণ্ঠে বলিলেন, "বৌ, এ কি কাঁদ্‌বার সময়। কাঁদ্‌বার সময় ঢের পাবে।" এই বলিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিয়া, একখানি পরিষ্কার ধৌত বস্ত্র পরাইয়া, তাঁহার হস্ত ধরিয়া টানিয়া লইয়া, যে ঘরে সুরেশ বাবু বসিয়া ছিলেন, সেই ঘরে ঠেলিয়া দিলেন।

বেতসপত্রের মত সুলোচনার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি অধিকক্ষণ আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; অধোবদনে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। সুরেশ বাবুর আগমনের পূর্ব্বে সুলোচনা অনেক ভাবিয়াছিলেন,একবার তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলে তাঁহাকে যথেষ্ট অনুযোগ করিবেন; তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদি-

বেন; কি দোষে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন? আজ কিন্তু স্বামীকে দেখিয়া তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সুরেশ বাবুও তাঁহার ধর্ম্মপত্নীকে সম্মুখে দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন; তিনিও নির্ব্বাক্ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনা এক এক করিয়া তাঁহার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল। এক দিন যাহাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে তাঁহার কষ্ট বোধ হইত, যাহার দর্শনে তিনি আনন্দে অধীর হইতেন, যাহার সহ-বাসে তিনি পার্থিব জীবনে স্বর্গ-সুখভোগ করিতেন, তাঁহার সেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু তাঁহার সম্মুখে অধোবদনে বসিয়া আছেন। তাঁহার সাহস হয় না যে তাঁহার সহিত প্রীতি সম্ভাষণ করেন। তাঁহার হৃদয় কলুষিত, দেহ অপবিত্র।

অনেকক্ষণ পরে সুরেশচন্দ্র ডাকিলেন, "সুলোচনা!"

সুলোচনার হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। বহু দিনের পর জীবিতেশ্বরের এই প্রিয়-সম্বোধনে তাঁহার নির্জ্জীব প্রাণে যেন জীবনসঞ্চার হইল। কত দিন তাঁহাকে দেখেন নাই, কত দিন তাঁহার কথা শুনিতে পান নাই, প্রাণ শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। সুলোচনার চক্ষে জল আসিল।

সুরেশচন্দ্র আবার বলিলেন, "সুলোচনা! তুমি ভাল আছ ত?"

"ভাল আছ?"—এ প্রশ্নের সুলোচনা কি উত্তর দিবেন? তিনি কি তাঁহাকে ভাল রাখিয়াছেন? তাঁহার ভাল-মন্দের দায়ী কে? অথচ তিনি তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন। সুলোচনার মনের মধ্যে উত্তর যোগাইল; কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না; কেবল একবারমাত্র সাহস

করিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ সুরেশ বাবু বুঝিতে পারিলেন, সহধর্ম্মিণীর হৃদয়ের ব্যাকুলতা, প্রাণের কাতরতা, অন্তরের ব্যথা সেই দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইল। সুরেশ বাবু দেখিতে পাইলেন, সেই পদ্মপলাশলোচন জলে ভাসিতেছে, যেন তাহার ভিতর সমুদ্রের জল সঞ্চিত রহিয়াছে, কেবল অতি কঠোর ধৈর্য্যের বন্ধনে তাহা আবদ্ধ। এতক্ষণে সুরেশ বাবুর অন্তরে অনুতাপের উদয় হইল। আত্মগ্লানি তাঁহাকে যেন দংশন করিতে লাগিল। তিনি আর স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; চঞ্চল-চরণে সুলোচনার নিকট যাইয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন, আবেগভরে বক্ষে টানিলেন। সুলোচনার সমস্ত শরীর পদ্মপত্রের মত কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার চক্ষের উপর সমস্ত পৃথিবী ঘূর্ণিত হইল। তাঁহার আপাদমস্তক বসনাবৃত ছিল, স্বেদনীরে তাহা ভিজিয়া গেল। তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না; যেন সংজ্ঞাশূন্য হইয়া স্বামীর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন।

সুরেশ বাবু স্বীয় জানুর উপর সুলোচনার মস্তক রক্ষা করিলেন। তাঁহার মুখের কাপড় ভাল করিয়া খুলিয়া দিলেন; একবার ভাল করিয়া সেই মুখখানি দেখিলেন। যে মুখের শোভা দেখিয়া একদিন তিনি উন্মাদ হইয়াছিলেন, যে মুখ দেখিয়া তিনি বিশ্বসংসারের সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতেন, সংসারের দারুণ বিপ্লবে যে মুখ দেখিয়া তাঁহার অন্তরে বলসঞ্চার হইত, আজ কত দিন পরে সেই মুখ দেখিলেন। কল্পনার তুলিকায় তাঁহার হৃদয়মন্দিরে যে মুখের ছবি আঁকিয়া তিনি আত্মবিস্মৃত হইতেন, আজ কত দিন পরে সেই মুখখানি—তাঁহার

ধ্যানে আঁকা মানসী প্রতিমা! সুরেশ বাবু স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের উপর চাহিয়া রহিলেন। সুলোচনার কুঞ্চিত কেশাগ্রভাগ তাঁহার বক্ষের উপর পড়িয়াছিল, সুরেশ বাবু সযত্নে তাহা অপসারিত করিলেন। স্বহস্তে তালবৃন্ত লইয়া সুলোচনার মস্তকে বাতাস করিতে লাগিলেন; কিছুক্ষণ পরে সুলোচনা প্রকৃতিস্থ হইলেন; চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার অভীষ্ট-দেবতা স্বহস্তে তাঁহাকে বাতাস করিতেছেন। সঙ্কুচিত-ভাবে শশব্যস্তে উঠিয়া তিনি স্বামীর হস্ত হইতে পাখা লইলেন। তাঁহার বামপদের উপর সুলোচনা নিজের দক্ষিণ-হস্ত স্থাপিত করিয়া অবনতমুখে বলিলেন, "আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল, তাই পড়ে গেলুম। তোমার ভারী কষ্ট হয়েছে।"

সুরেশ। না না—আমার কষ্ট হবে কেন?

সুলোচনা। তুমি কেমন আছ?

সুরেশ। এক রকম আছি, আর কি?

সুলোচনা। কেন, সম্পূর্ণ নয়?

সুলোচনার সাহস বাড়িতে লাগিল।

সুরেশ। বুঝ্‌তে পারিনি সুলোচনা!

সুলোচনা। কত দিন তোমার কথা শুনিনি। আজ কত দিন পরে তুমি আমায় সুলোচনা ব'লে ডাক্‌লে।

সুরেশ বাবু নিরুত্তরে রহিলেন। সুলোচনার মুখ ফুটিল। তিনি আবার বলিলেন, "তোমার কথা আবার শুন্‌তে পাব ব'লে, আমার কানে এখনও তালা লাগেনি। আবার তোমাকে দেখ্‌তে পাব ব'লে এখনও আমার চক্ষু অন্ধ হয়নি। মনে ভেবে দেখ দেখি, আমায় দেখ্‌বার জন্য একদিন তোমার প্রাণ কত

ব্যাকুল হ'ত! কলেজের ছুটী হ'লে যখন তুমি বাড়ী আস্‌তে, আমাকে আদর ক'রে তোমার ভালবাসা জানাতে, কত কথাই বল্‌তে, 'সুলোচনা! তোমায় না দে'খে আর থাকতে পারিনে।' আমার সব কথা মনে আছে, সেই সব কথা মনে ক'রে প্রাণে আরও কষ্ট হয়। সেই তুমি আজ কত দিন হ'ল আমার একবার উদ্দেশ করনি।"

সুরেশ। বুঝ্‌তে পারিনি সুলোচনা, প্রলোভনে প'ড়ে আমার অধঃপতন হয়েছে।

সুলোচনা। তুমি সুলোচনা ব'লে ডাক্‌বে, এ কথা শোন্‌বার জন্যে আমার প্রাণ যে কি রকম লালায়িত হ'ত, তা কি তুমি বুঝ্‌তে পার? কত দিন তোমার কথা শুনিনি, কত দিন তোমায় দেখিনি, আমার প্রাণ যে কত কাতর হ'ত, তা তোমায় কি ক'রে জানাব? আগে আগে আমায় কত পত্র দিতে, ইদানীং আমার পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দাও না।

সুরেশ। সব সময় পত্র লিখ্‌বার অবসর হ'ত না।

সুলোচনা। এত ব্যস্ত থাক্‌তে যে, একখানা চিঠি লিখ্‌বার সময় পেতে না? যখন তুমি একজামিনের পড়া পড়্‌তে, তখনও আমায় দুই তিনখানা ক'রে চিঠি দিতে। তখন তোমার অবসর ঘট্‌তো, আর এখন অবসর পাও না? তা নয়, এখন আর তোমার সে দিন নেই।

সুরেশ বাবু নিরুত্তরে অধোবদনে রহিলেন। সুলোচনার সহিত বাক্যালাপ করিবারও তাঁহার আর অধিকার নাই। অনুগত ভার্য্যার প্রতি তিনি যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হিন্দু স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য জাতীয় কোন নারীই সহ্য করিতে পারে

না। স্বামী সহস্র দোষে দোষী হইতে পারে, স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহারে পশুরও অধম হইতে পারে, পরস্ত্রী হরণ করিয়া ব্যভিচারী উন্নত-মস্তকে সমাজের মধ্য দিয়া সদর্পে চলিবে, সমাজ তাহার শাসন করিতে পারিবে না, কারণ, সমাজের সে অধিকার নাই, কিন্তু স্ত্রীর কোন কার্য্যে স্বামীর প্রতি যদি বিন্দু-মাত্রও ভক্তিহীনতা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সে স্ত্রী সমাজে পতিতা হইবে। ক্ষণেকের জন্য মনের কোণেও যদি সে অপর পুরুষের চিন্তা করে, তাহা হইলে সে স্ত্রীলোক অধর্ম্মে পতিতা হইবে, এই আমাদের শাস্ত্রের আদেশ; কিন্তু সে অধর্ম্মের ভয় পুরুষের বিন্দুমাত্রও নাই। ব্যভিচারী—পরস্ত্রী-হরণকারী পুরুষের দণ্ডের বিধি সমাজে নাই, শাস্ত্রে নাই, কেবল অবলার উৎপীড়-নের জন্য সর্ব্বত্রই প্রশস্ত পথ।

সুলোচনা আবার বলিলেন, "লোকে আমার অদৃষ্টকে হিংসা করিত। সকলেই বল্‌ত, আমার মত সৌভাগ্যবতী সংসারে অতি কম, কেন না, আমি তোমার ভালবাসা পেয়ে-ছিলেম। যে স্ত্রীলোক স্বামীর ভালবাসা পায়, সংসারে সহস্র দুঃখের মধ্যেও সে সুখী, সংসার তার পক্ষে স্বর্গের চেয়েও সুখের স্থান। আমি কি অপরাধ করেছি যে, তোমার ভালবাসা হ'তে বঞ্চিত হলেম?

সুরেশ। কত অন্যায় কাজ করেছি, সুলোচনা, কিন্তু এখন আর আমার ফের্‌বার উপায় নেই।

সুলোচনা। আমি যে লোকের নিকট স্পর্দ্ধা ক'রে বল্‌তুম, তোমার তুল্য চরিত্র আর কারও নাই। বিদ্যায় বুদ্ধিতে সর্ব্ব-রকমে তোমার সমকক্ষ লোক এ গ্রামে কয় জন আছে?

তোমার বিষয় লোকে আলোচনা কর্‌ত, তোমার উপমা দিত। সেই তুমি এখন কি হয়ে গেছ,একবার মনে চিন্তা ক'রে দেখদেখি।

সুরেশ। চিত্তসংযম কর্‌তে. সুলোচনা, আমি অনেক চেষ্টা ক'রে দেখেছি, কিন্তু মনোরমার কি মোহিনী শক্তি, আমি কোন রকমে নিবৃত্ত হ'তে পার্‌লুম না।

সুলোচনা। কখন যদি কেউ তোমার নিন্দা কর্‌ত, আমি তার সঙ্গে বাক্যালাপ কর্‌তুম না। কথার ছলে যদি কোন রকমে তোমার চরিত্রে কেউ দোষ দিত. আমার প্রতি তোমার নির্দ্দয়তার উল্লেখ ক'রে যদি কোন সমবয়সী ব্যঙ্গচ্ছলেও আমায় তোমার সম্বন্ধে কোন কথা বল্‌ত. আমি তাও সহ্য কর্‌তে পার্‌তুম না। আর এখন এমন লোক নেই যে, তোমার নিন্দে না করে। প্রথম যে দিন শুন্‌লুম, তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যাকে হরণ ক'রে রামকানাই বাবুর বাগান-বাটীতে বাসা ক'রে আছ, প্রথমে আমার এ কথা বিশ্বাস হলো না। যে মানুষ পরস্ত্রীর দিকে কখন মুখ তুলে চায়নি, তার এত দূর অধঃপতন হবে? মন আমার কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে চায় না। তার পর যখন পাড়ার লোক এক এক ক'রে এসে আমায় তোমার চরিত্রের কথা ব'লে গেল, তখন যেন আমার চমক ভাঙ্‌ল। মনে ভাবি. এ কথা শোন্‌বার আগে আমার কেন মরণ হলো না? আকাশে কি বজ্র নেই যে, আমার মাথায় পড়ে,—সর্পের কি বিষ নেই যে, আমাকে দংশন করে?—এ জ্বালার চেয়ে বজ্রাঘাতে কি সর্পাঘাতে মরাও যে আমার পক্ষে অনেক ভাল।

সুরেশ। তখন আমি বুঝ্‌তে পারিনি সুলোচনা যে, আমার এতদূর অধঃপতন হবে।

সুলোচনা। দেখ, স্ত্রীলোক সব সহ্য কর্‌তে পারে, অম্লান-বদনে সংসারের সমস্ত অত্যাচার সহ্য কর্‌তে পারে, স্বামীর অদর্শন-যন্ত্রণা মন থেকে মুছে ফেল্‌তে পারে, কর্ত্তব্যানুরোধে স্বামীর অবমাননা, অন্যায় লাঞ্ছনা সবই সহ্য করতে পারে—যদি সে বুঝ্‌তে পারে যে, তার স্বামীর মনের মধ্যে তার স্থান আছে, যদি সে জান্‌তে পারে যে, কর্ম্মক্ষেত্রে ক্লান্তদেহে যখন তিনি শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন একবার—দিনান্তে কেবল একটিবারমাত্র তিনি তার স্ত্রীর কথা মনে ভাবেন। এমন সৌভাগ্যবতী সংসারে কয়জন আছে যে, অবিচ্ছেদে স্বামীর প্রণয় উপভোগ কর্‌তে পারে, আর সকল পুরুষই কি তার প্রণয়িনীকে সঙ্গে নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করে? সংসারের ঘোরতর দায়িত্ব যার মাথার উপরে—একটা বৃহৎ সংসারের সমস্ত প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদনের ভার যার উপরে, তার কি শোভা পায় কর্ত্তব্য-জ্ঞান অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়ে কেবল স্ত্রীর আঁচল ধ'রে বেড়ানো? স্ত্রীলোকেরও কি উচিত নয়, স্বামী যাতে সংসারের পাঁচজনকে প্রতিপালন করিতে পারেন, সে বিষয়ে সৎপরামর্শ দেওয়া? তা নয়, সব যাক্, সংসার ডুবে যাক্, ভাই-ভগিনী, পিতা-মাতা, সংসারের অবশ্য প্রতিপাল্য সমস্ত পরিজনবর্গ অন-শনে প্রাণত্যাগ করুক, আমি কেবল দাম্পত্য-প্রণয়ের মধুর সুখে বিভোর হ'য়ে থাকি? এই কি মনুষ্যত্ব? মনে পড়ে কি তোমার, যে দিন তুমি চাকরী কর্‌তে বিদেশে যাত্রা কর, তার পূর্ব্ব-রাত্রে আমায় কি বলেছিলে? বলেছিলে না কি, 'সুলোচনা, আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও থাক্‌তে পার্‌ব না?' আমি তার কি উত্তর দিয়েছিলেম? তোমার কি তা মনে আছে? হায়!

তখন যে আমি বিন্দুমাত্রও জানতে পারিনি, তোমার হৃদয় এত দুর্ব্বল।

সুরেশ। সত্যকথা বল্‌তে কি সুলোচনা! আমি যদি তোমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতুম, তুমি যদি আমার কাছে থাক্‌তে, তা হ'লে বোধ হয়, আমার এ অধঃপতন ঘট্‌তো না। যৌবন-কাল মানুষের প্রধান শত্রু, প্রলোভন পদে পদে। মানুষ যেখানে থাকুক না কেন, যদি তার কৈফিয়ৎ দেবার কোন ভয় থাকে, তা হ'লে কখনই তার অবনতি হয় না। অসামান্যা সুন্দরী মনোরমা অযাচিতভাবে আমাকে আত্মদান কর্‌লে, আমি তাকে প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পার্‌লুম না। তার রূপের আগুনে আমার সমস্ত বন্ধন ভস্মীভূত হ'ল। সুলোচনা! তুমি বিশ্বাস কর্‌বে না— আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই রিপুজয় কর্‌তে পারিনি।

সুলোচনা। আমি কি তোমার কথা কোন কালে অবিশ্বাস করেছি? তবে এখন অবিশ্বাস কর্‌বার কারণ আছে। ব্যভি-চারী পুরুষ ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ কর্‌তে অম্লান-বদনে মিথ্যাকথা বল্‌তে পারে আর ব্যভিচারিণী রমণী তার উপপতির মনস্তুষ্টির জন্য সংসারে এমন দুষ্কর্ম্ম নাই যে, তা অবহেলায় না কর্‌তে পারে। যাক্, সবই অদৃষ্টে ঘটে। সকলই আমার দুর্ভাগ্য, তোমার দোষ কি? বোধ হয়, পূর্ব্বজন্মে কোন সতী নারীকে তার স্বামী হ'তে বঞ্চিত করেছিলেম, তার অভিশাপে আমাকে এ জন্মে এই দারুণ মনস্তাপ পেতে হ'ল। তোমায় এ কথাও কি বল্‌তে পারি না, বাড়ীর এত কাছে আছ, এত দিন পরে দেশে এসেছ, একবারও কি দেখা কর্‌তে নেই? তোমাকে একবার

চোখের দেখা দেখ্‌বারও কি আমার আর কোনরূপ অধিকার নেই?

সুরেশ। সাহস্ হয়নি, সুলোচনা! তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার আমার সাহস হয়নি। রোজ রোজ মনে কর্‌তুম, একবার এসে তোমায় দেখে যাই, কিন্তু কেমন মনের মধ্যে একটা ভয় হতো, আমি কি ক'রে তোমার সাম্‌নে দাঁড়াব? মনে ভেবো না তুমি যে, আমি সুখে আছি, সর্ব্বদাই আমি যেন নিদারুণ অশান্তি ভোগ কর্‌ছি, কিন্তু তবুও মনোরমাকে ছাড়্‌তে পার্‌ছি না; সে আমাকে যেন মন্ত্রের দ্বারা বশীভূত ক'রে রেখেছে।

সুলোচনা। এ কথা আমি সমস্ত বিশ্বাস করি, সে তোমাকে জাদুমন্ত্রে বশ করেছে। আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে সর্ব্বনাশী জন্ম-গ্রহণ করেছে। শুন্‌তে পাই নাকি, তার স্বামী জীবিত আছে, স্বামী থাক্‌তে তার এমন মতিভ্রম হ'ল কেন?

সুরেশ। আমি তা বুঝ্‌তে পারিনে। মনোরমা বলে, তার স্বামী একটা জানোয়ারবিশেষ। সে নাকি দেখ্‌তে ভয়ানক খারাপ।

সুলোচনা। স্বামী যদি দেখ্‌তে খারাপ হয়, তাই ব'লে তাঁকে নিয়ে ঘর-সংসার না ক'রে, উপপতির হাত ধ'রে বেরিয়ে যেতে হবে? পোড়া কপাল তার! স্বামী কুরূপই হোক্ আর সুরূপই হোক্, সে ত স্বামী। এর ফল তাকে পেতেই হবে। আমি যদি সতী স্ত্রীলোক হই, আর যথার্থ যদি তোমার পায়ে আমার মতি থাকে, তাকে বিস্তর দুঃখ পেতে হবে।

সুরেশ বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "অনেক পয়সা নিয়ে এসেছে, অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট পাবে না।

সুলোচনা মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, "পয়সা নিয়ে এসেছে, কিন্তু পয়সা যেতে কতক্ষণ? আমি ঠিক তোমায় বল্‌ছি এই অন্ন-বস্ত্রের জন্যই তাকে ভিক্ষে কর্‌তে হবে। এ যদি না হয়, তা হ'লে ধর্ম্ম মিথ্যা আর আমি অসতী।"

সুরেশ বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সুলো। এ কথা শুনে কি তোমার কষ্ট হ'ল?

সুরেশ। না, তা নয়।

সুলো। তা হ'তে পারে। এখন সেই তোমার সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু। তার নিন্দা শুন্‌লে তোমার কষ্ট হবে, এর আর আশ্চর্য্য কি? আচ্ছা, তুমি যে এখানে এসেছ, এ কথা যদি সে শুন্‌তে পায়, তা হ'লে তার ভারী রাগ হবে। কেমন, না?

সুরেশ। শুন্‌বে কি ক'রে? আর কেই বা বল্‌তে যাবে?

সুলো। আচ্ছা, যদি কোন রকমে শোনে?

সুরেশ। শোনে যদি, তার আর কর্‌ব কি? রাগ করে যদি, না তা, আর কি হবে?

সুলো। এরি নাম অদৃষ্ট। আমি তোমার স্ত্রী, আর তুমি আমার স্বামী। তুমি দেবতা সাক্ষী ক'রে আমাকে গ্রহণ করেছ আর আমি তোমার মনস্তুষ্টির জন্য নারীদেহ ধারণ করেছি। তোমারই মুখে শুনিয়াছি যে, ব্রাহ্মণের গুরু অগ্নি, শূদ্রের গুরু ব্রাহ্মণ, স্ত্রী-লোকের একমাত্র গুরু স্বামী আর অতিথি সকলেরই গুরু। সেই আমি আর সেই তুমি; কিন্তু আজ বারবিলাসিনীর অসন্তোষের ভয়ে তুমি ধর্ম্মপত্নীর নিকটেও সঙ্কুচিত হচ্ছো। তার মনস্তুষ্টির জন্য আমার প্রাণে কত কষ্ট দিচ্ছো। দেবতা, ধর্ম্ম, অগ্নি,

সকলে সাক্ষী, তুমি চিরদিন আমার প্রতি কামনা করবে। তা দূরে থাক্, আমায় এমন অবস্থায় ফেলেছ যে, বোধ হয়, এক দিনের জন্যও জীবনে শান্তি পাবে না।

সুরেশ। আমিও যে এমন অবস্থায় পড়্ব, তাও আমি স্বপনেও ভাবিনি। কোথা থেকে কি হ'ল, কেমন ক'রে তার রূপমোহে এ চিত্ত কলুষিত হ'ল, আমি নিজেই তা বুঝ্তে পারিনি। সুলোচনা, মনে স্থির জেনো, সবই কপালে করে। বিদেশে চাকরী করতে গেলুম, চিকিৎসা আমার উপজীবিকা, চিকিৎসা করতে গিয়ে মনোরমাকে দেখ্লুম, তার ফল পেলুম কি ?—চরিত্রভ্রষ্ট নীচাশয়ের মত সংসারে সকলের চক্ষে ঘৃণিত হলেম। কেন হলেম, তা বলতে পারিনে। সুলোচনা, মনে ভেবো না, আমি বড় সুখে আছি। অগ্নি দেখে যেমন পতঙ্গ পুড়ে মরে, মনোরমার রূপ দেখে আমিও তেমনি পুড়ছি। আগুনের জ্বালায় জ্বল্‌ছি, তবুও নিবৃত্ত হ'তে পাচ্ছিনে।

সুলো। ভাগ্যই মূলাধার, আমিও তা স্বীকার করি। নইলে আমার অদৃষ্টে এরূপ ঘট্‌বে কেন ? বা রে অদৃষ্ট! যেখানে পা ফেলি, সেইখানেই অশান্তির আগুন জ্ব'লে ওঠে। তুমি যদি আমায় পরিত্যাগ ক'রে আবার বিবাহ করতে, তা হ'লে আমার এত ভাবনা হ'ত না। তোমাকে ত সুখী দেখ্তে পেতেম। এখন আমার আরও ভাবনা তোমাকে নিয়ে। যে স্ত্রী তার স্বামীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার ক'রে অন্য পুরুষকে ভজনা করতে পারে, সে যে তার উপপতির প্রতি দুর্ব্যবহার করবে না, তার আশ্চর্য্য কি ? এখন সে তোমার প্রতি কি রমক দুর্ব্যবহার করবে, সেই আমার চিন্তার কারণ। ভগবান্ তোমাকে রক্ষা করুন। বিশ্বাস-

হন্ত্রী কুলত্যাগিনী তোমার জীবন পর্য্যন্ত বিপদাপন্ন কর্‌তে পারে, তাকে কদাচ তুমি বিশ্বাস করো না। তার মনের পরিবর্ত্তন হ'তে কতক্ষণ, এ কথা তুমি মনে রেখো। তার ভালবাসা আকাশের বিদ্যুতের মত ক্ষণস্থায়ী, এ তুমি ঠিক জেনো। তোমার প্রতি সে যে বিশ্বাস রাখ্‌তে পার্‌বে, এ কখনই নয়। আমার অনুরোধ, তুমি সাবধানে থেকো।

সুরেশ। যে গঙ্গার উপরে ব'সে প্রতিজ্ঞা করেছে, আমাকে কখন ত্যাগ কর্‌বে না।

সুলো। তার প্রতিজ্ঞা তুমি বিশ্বাস ক'রে রেখেছ? নিজের স্বামীর প্রতি যে বিশ্বাস না রাখ্‌তে পারে, তার আবার প্রতিজ্ঞা? কখনও তার কথা বিশ্বাস করো না। যাক্‌, আমার আর একটা অনুরোধ। যা হবার, তা ত হয়ে গেছে। অবশ্য একদিন তোমার উপর আমার কত জোর ছিল, এখন আর সে দিন নেই, তাই তোমার কাছে প্রার্থনা কচ্ছি যে, মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্যও যেন তোমার দর্শন পাই। তুমি যাই হও না কেন, আমার প্রতি যতই নিষ্ঠুর হও না কেন, তবুও তুমি আমার উপাস্য দেবতা।

কথাবার্ত্তায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। স্ত্রীপুরুষে কেহই নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। তখন উষার রক্তিমরাগ বাতায়ন ভেদ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছে। সুরেশচন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিলেন; যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সুলোচনা ভক্তিভরে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তখন মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়। সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে মনো-মোহিনী মনোরমা শয্যার উপর তাকিয়া হেলান দিয়া অর্দ্ধ-শায়িতভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। আর তাঁহার সম্মুখে একখানি চেয়ারের উপর সুরেশ বাবু অধোবদনে বসিয়া আছেন। দুই জনেরই মুখভাব বিষণ্ণ, যেন ঝটিকা ও বৃষ্টিপাতের পূর্ব্বে আকাশমণ্ডল ঘনমেঘাচ্ছন্ন। কেহই কোন কথা বলিতেছেন না। এমন সময় রামকানাই বাবু সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া রামকানাই বাবু বুঝিতে পারিলেন যে, ঔষধ ধরিয়াছে। তবুও সম্পূর্ণ অজ্ঞের ভাব দেখাইয়া মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমন মুখভার ক'রে ব'সে রয়েছ কেন মনি?"

মনোরমা বলিলেন, "এস ভাই,—তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। তুমিই ধর্ম্মকথা বল, তুমি ত ওঁর বন্ধুলোক—আর ওঁর দেশ তাই তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, তুমিই ভাই বিচার ক'রে বল, দোষ আমার, না তোমার ঐ বন্ধুটির?"

রামকানাই সুরেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"কি হে সুরেশ, ব্যাপারখানা কি ?"

সুরেশ। ওঁর মুখেই শোন।

মনো। বল ত তোমরা। বলি—আমি কার ভরসায় বেরিয়ে এসেছি ? কার জন্যে কুলে কালী দিয়ে বাপ-মা সব ছেড়ে এসেছি ? বল ত ভাই—তোমরাই পাঁচজনে বল. আমাকে কে ভজন-ভাজন দিয়ে বাড়ীর বার ক'রে এনেছে ?

সুরেশ বাবু একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন. "আমি তোমাকে ভজন-ভাজন দিয়ে বার ক'রে আনি নি। তুমি আপনি ইচ্ছে করেই আমার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছ।"

মনোরমা গলার মাত্রা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও একটু বাড়াইয়া বলিলেন, "না হয়, আমি ইচ্ছে করেই বেরিয়ে এসেছি ; কিন্তু কার হাত ধ'রে সব ছেড়ে কুলের বার হলুম ? কার মুখ চেয়ে আমি রাজ-অট্টালিকা ছেড়ে এইখানে এত কষ্টের ভেতর আছি ? এখন আমায় কি না তাচ্ছিল্য ?"

সুরেশ। একদিনের জন্যও আমি তোমায় তাচ্ছিল্য করি নি। আর আমিও তোমার জন্য সব ত্যাগ করেছি।

মনো। কি ক'রে তুমি আমার জন্য সব ত্যাগ ক'রেছ। যখন তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ী যেতে আরম্ভ ক'রেছ. তখন কি ক'রে তুমি সব ত্যাগ ক'রেছ ?

সুরেশ। কোন দিন আমি লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ী যাই নি।

মনোরমা রামকানাই বাবুর মুখের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "শোন ভাই! তোমরা ভদ্রলোক, এ গ্রামের জমীদার, তোমরাই বিচার কর, উনি ব'লছেন বাড়ী যাই নি, আচ্ছা

যদি উনি বাড়ী না গিয়ে থাকেন, তা হ'লে ওঁর স্ত্রী গর্ভবতী হ'ল কি ক'রে।"

রাম। কি বল সুরেশ বাবু—এ কথা কি সত্য ?

মনো। যখন আমাকে নিয়ে এলেন, তখন আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করেছিলেন, এ জন্মে তুমি ছাড়া আর কেউ আমার ভালবাসা পাবে না।

সুরেশ। আমিও কি কোন দিন তোমাকে কোন রকমে অযত্ন করেছি ?

মনো। স্পষ্ট বলা কওয়া, ওঁর স্ত্রীর নিকট কখন উনি যেতে পারবেন না। আমি যেমন আমার বাপ, মা, সোয়ামী সব ছেড়ে ওঁকে নিয়ে আছি, ওঁরও তেমনি সমস্ত ছেড়ে কেবল আমাকে নিয়ে থাকৃতে হবে।

সুরেশ বাবু দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সমস্তই ত তোমার জন্য ছেড়েছি। আমি কি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি না তার কাছে যাচ্ছি। তাদের নাম পর্য্যন্তও মুখে আনিনি।"

মনো। তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে যাও নি ?

সুরেশ বাবু অধোবদনে বলিলেন, "না"।

মনো। তা হ'লে তুমি ব'লতে চাও, তোমার স্ত্রীর যদি গর্ভ হ'য়ে থাকে, তা হ'লে সে গর্ভস্থ সন্তান তোমার ঔরসজাত নয় ;—এ তোমায় ব'লতেই হবে।

সুরেশ বাবু নিরুত্তরে অধোবদনে বসিয়া রহিলেন।

মনো। এ কথা তোমায় ব'লতেই হবে। না ব'ল্লে আমি কিছুতেই ছাড়বো না। দেখ রামকানাই বাবু অন্যায় কা'র। আমি আমার কথা ঠিক রেখেছি কি না ? উনি বলেছিলেন,

ওঁর পরিবারবর্গের অন্ন-বস্ত্রের জন্য যে টাকা উনি মাসে মাসে পাঠাতেন, আমাকে তা দিতে হবে। আমি এই কয় মাস এখানে এসেছি, মাস পড়্‌তে না পড়্‌তে আগে থাক্‌তে ওঁর বাড়ীর খরচের টাকা পাঠাচ্ছি। সে তো উনি নিজের হাতেই পাঠাচ্ছেন। কেমন গো বল না, এখন যে চুপ ক'রে রৈলে।

সুরেশ। তা ত পাঠাচ্ছই, আমিও কি তা অমাস্তি যাচ্ছি ?

মনো। তবে আমার দোষ কি ?

সুরেশ। আমি কি তোমার দোষ দিচ্ছি ?

মনো। তবে তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ী যাও কি ক'রে ?

সুরেশ। আমি কোন দিন লুকিয়ে বাড়ী যাইনি।

মনো। তবে তোমার পরিবার পোয়াতী হ'ল কি ক'রে ?

সুরেশ। আমি তা বল্‌তে পারিনে।

মনো। তা হ'লে তোমার স্ত্রী অসতী।

সুরেশ বাবু আর কথা কহিতে পারিলেন না। ছলনাময়ী স্বৈরিণী তাঁহাকে পশুর অপেক্ষাও অধম করিয়াছে। তাহার ঐশ্বর্য্যে লুব্ধ, বিবেকশূন্য সুরেশচন্দ্র একেবারে এত দূর অধঃপাতে গিয়াছেন যে, তাঁর সাধ্বী স্ত্রীর নামে এই গুরুতর কলঙ্ক আরোপ করিবার সময়ে তিনি কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। মনোরমা তাঁহাকে কি মোহ-মন্ত্রে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, তিনি নিজেও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সুরেশ বাবু তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে সব বিষয়েরই সীমা আছে, পাপেরও সীমা আছে, এই পাপের বিষময় ফল অবশ্য একদিন তাঁহাকে ভুগিতে হইবেই। সাধ্বী নারীর তপ্ত-নিশ্বাসে দাবানল জ্বলিয়া উঠে, তাহার প্রতি এই অত্যাচার! আর

ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব-গর্ব্বিতা মনোরমা, তুমিও একদিন বুঝিতে পারিবে, পাপের দণ্ড কিরূপ ভয়ানক!

সুরেশচন্দ্রের মনে পড়িল, বিদায়ের কালে সেই বিষাদ-প্রতিমার অশ্রুনিষিক্ত মলিন মুখখানি, সে যেন তাঁহার বিন্দুমাত্র কৃপার প্রত্যাশায় তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইতে চায়। নিমেষের জন্য তাঁহার দর্শন-কামনায় তাহার কাতর দৃষ্টি—অশ্রুভারাবনত স্থিরদৃষ্টি তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠিল। তবুও তাঁহার সাহস হইল না যে, মনোরমার সম্মুখে তাহার হইয়া কোন কথা বলেন। তাহার সমস্ত জীবনের ভাল-মন্দের—শুভাশুভের একমাত্র দায়ী তিনি, সেই তিনি আজ বজ্রাঘাতের অপেক্ষাও কঠিন আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তাঁহার হাত আছে, পা আছে, শরীরে সামর্থ্য আছে; তাঁহার বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে; তবুও কেন যে সেই নারীকুলের ঘৃণিতা পাপিষ্ঠা কুলটার বশীভূত, তাহা তিনি নিজেও বুঝিতে পারেন নাই।

সন্ধ্যার পর আবার মজ্‌লীস বসিল। সুরেশচন্দ্র বিমর্ষ-ভাবে এক প্রান্তে বসিয়াছিলেন। রামকানাই বাবু তাঁহার চিত্তের বিষণ্ণতার কারণ বুঝিতে পারিয়া অগ্রেই তাঁহাকে মদ্য পান করাইলেন। সুরার মোহিনী শক্তিতে সুরেশচন্দ্র আবার প্রফুল্ল হইলেন।

উপযুক্ত অবসর-বিবেচনায় মনোরমা সেই সমবেত বন্ধুমণ্ডলীর সমক্ষে সুরেশ বাবুকে স্বীকার করাইলেন যে, তাঁহার স্ত্রী অসতী এবং পাপিষ্ঠা; নিজেও সেই পতিব্রতা সতীর নামে এই মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিল। তাহার রসনা কেন খসিয়া পড়িল না?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একজন স্ত্রীলোকের যদি দুই জন প্রণয়পাত্র হয়, তাহা হইলে সেই দুই জনের মধ্যে কিরূপ শত্রুতা জন্মে, তাহা গ্রন্থকার বর্ণনা করিতে অক্ষম। রামকানাই বাবু মনোরমার প্রসাদ লাভ করিবার জন্য সুরেশ বাবুর অমঙ্গলের চেষ্টায় সর্ব্বদা রত থাকিতেন। যখন তিনি মনোরমার দ্বারা সুরেশচন্দ্রের স্ত্রীর কলঙ্ক-কাহিনী লোক-সমাজে প্রচার করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন, তখন দেখিলেন, শত্রুতা-সাধনের এই একটা প্রকৃষ্ট উপায়। তখন অনন্যচেষ্টিত হইয়া তাঁহার আত্মীয়বন্ধু, এমন কি, সে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের নিকট প্রচার করিলেন যে, ডাক্তার সুরেশ বাবুর স্ত্রী অসতী, তাহার গর্ভস্থ সন্তান জারজ, এই কথা সুরেশ বাবু স্বয়ং তাঁহাদের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছেন।

ক্রমে ক্রমে কথাটা বহুদূর বিস্তৃত হইল। ক্রমে সুরেশ বাবুর গ্রামের লোকেরও শুনিতে বাকী রহিল না। হারাণী বামার নিকট গল্পচ্ছলে বলিল; মুক্তকেশী শশিমুখীর দাওয়ায় বসিয়া কমিটী করিয়া সকলের কাছে প্রকাশ করিল যে, সে ও গ্রামে তাহার ভগিনীর বাড়ী গিয়াছিল, সেখানে জমীদার-বাটীর ঝি মঙ্গলার নিকট শুনিয়া আসিয়াছে যে, সুরেশ ডাক্তারের স্ত্রী অসতী, তাহার উপপতি নিত্য তাহাদের বাটীতে রাত্রিতে আসে। সুরেশ বাবুর স্ত্রী এখন গর্ভবতী, ধর্ম্মের ঢাক আপনিই বাজে। আর মঙ্গলার কথা কিছু অবিশ্বাস করা যায় না, কারণ, মঙ্গলা এক সময়ে জমীদার রামকানাই বাবুর অনুগ্রহের পাত্রী ছিল।

শশিমুখী গৃহস্থের কুলবধূ, অল্পবয়সে বালবিধবা হইয়া তাহার দেবরের সংসারেই কালযাপন করে; কিন্তু বিশ্বনিন্দুক লোকেরা তাহার অকলঙ্ক চরিত্রে দেবর সম্বন্ধে তাহার ঘনিষ্ঠতার উল্লেখ করিয়া অনেক কুৎসা রটনা করিয়া থাকে। এখন সেই রাগের প্রতিশোধ তুলিতে নিরীহ-প্রকৃতি সুলোচনার কলঙ্ক-কাহিনী প্রচার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। রাস্তায় যুবকগণ ভ্রমণচ্ছলে সুরেশ বাবুর স্ত্রীর কলঙ্ক-কথা আন্দোলন করিতে লাগিল। পুষ্করিণীর ঘাটে রমণীগণ স্নান করিবার সময় সুলোচনার চরিত্রের গ্লানি করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল, সুরেশ বাবু যেমন উপপত্নী লইয়া বিহার করিতেছেন, তাঁহার উপযুক্ত পত্নীও সেইরূপ উপপতি লইয়া প্রতিশোধ তুলিতেছে। বালক জ্যোতিষচন্দ্র স্কুল হইতে ম্লানমুখে বাড়ী আসিলেন। মায়া তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যেমন উত্তর দিতে উদ্যত হইলেন, সূক্ষ্মদর্শিনী মায়া অমনি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে কথা কহিতে সাবধান করিলেন; কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও সুলোচনার শুনিতে বাকী রহিল না।

প্রথম যখন সুলোচনার কর্ণে এই কথা প্রবেশ করিল, তিনি তখন চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। সমস্ত পৃথিবী যেন তাঁহার মস্তকের উপর ঘুরিতে লাগিল। গয়লা-বৌ কখন কখন তাঁহাদের বাটীতে বেড়াইতে আসে। গোয়ালাদের বাটী তাঁহাদের খিড়কীর পুকুরের অপর পার্শ্বে। ঘাটে বাসন রাখিয়া সুরেশ বাবুর বাটীতে আসিয়া, সে কতক্ষণ বসিয়া গল্প করে, সুলোচনার চুল বাঁধিয়া দেয়, মায়ার মাথায় খুস্কি তুলিয়া দেয়, মায়া আবার কখন কখন তাহাকে মহাভারত পড়িয়া শোনান। এই সব

কারণে গয়লা-বৌ তাঁহাদের বড়ই বাধ্য ছিল। গয়লা-বৌ প্রথমে কথাটা শশিমুখীর নিকট শুনিতে পাইল। এত বড় গুরুতর কথা পেটে রাখিতে সে পারে না; কথাচ্ছলে সুলোচনার নিকট সে সমস্ত কথা প্রকাশ করিল। সুলোচনা প্রথমে এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার স্বামীর এতদূর অধঃপতন হইবে, এ কথা কি বিশ্বাস হয়? তাঁহার নিজের সন্তানকে চিরকালের জন্য কলঙ্ক-সাগরে ডুবাইবেন, এমন হৃদয়হীন তিনি কি করিয়া হইবেন? সুলোচনার ইহকাল-পরকাল—তাঁহার একমাত্র গতি তাঁহার স্বামী, তিনি এতদূর নীচ-প্রকৃতি হইবেন, কি করিয়া সুলোচনা এ কথা বিশ্বাস করিবেন? যে তাঁহার রক্ষক, সেই তাঁহাকে নষ্ট করিবে, ইহার অপেক্ষা আর কি গুরুতর কার্য্য সংসারে আছে? কিন্তু তাহার পর যখন পাড়ার সমস্ত লোক তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিতে লাগিল, যখন সকলের মুখেই শুনিতে পাইলেন যে, তিনি অসতী আর তাঁহার গর্ভস্থ সন্তান জারজ, তখন আর তাঁহার স্বামীর উপর বিশ্বাস রহিল না। তাঁহার স্বামী মুক্তকণ্ঠে মনোরমার বাটীতে বসিয়া সর্ব্বসমক্ষে এ কথা বলিয়াছেন, আর তাঁহার বাটীতে আগমন কেহ জানিতে পারে নাই, কারণ, তিনি রাত্রিকালেই আসিয়াছিলেন এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই প্রস্থান করেন। সুতরাং তাঁহার আগমন ও প্রস্থান অন্য কেহই জানিতে পারে নাই, তখন অপর লোকেরও সহজে বিশ্বাস হইল যে, সুলোচনা অসতী।

মায়া সুলোচনাকে অনেক বুঝাইলেন। সমদুঃখভাগিনী ননন্দিনীর মধুর সান্ত্বনায় সুলোচনার হৃদয়ের আগুন ক্ষণেকের জন্যও প্রশমিত হইল। সত্যের জয় অবশ্যই হইবে। জগদীশ্বর

আছেন, সতীর মর্য্যাদা তিনিই রক্ষা করিবেন। মায়া এ কথা তাঁহাকে ভাল রকমে বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার দাদার ভ্রম নিশ্চয়ই দূর হইবে, নিশ্চয়ই তিনি এক দিন অনুতপ্ত-চিত্তে তাঁহার নিকট এ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। ননদিনীর কথায় সুলোচনা মনকে বুঝাইলেন; কিন্তু গ্রামের লোকের অত্যাচার ক্রমেই অসহ্য হইল। সমাজ অবিচারে তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিল। গ্রামের মধ্যে এক জন বর্দ্ধিষ্ঠ লোকের বাটীতে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে সমাজের সমস্ত লোককে নিমন্ত্রণ করা হইল, কেবল তাঁহাদিগকে কেহ নিমন্ত্রণ করিল না। সমাজপতি ঘোষ মহাশয় জ্যোতিষচন্দ্রকে বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তাঁহার ভ্রাতৃজায়াকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সমাজে লইতে কাহারও আপত্তি হইবে না। জ্যোতিষচন্দ্র ভগিনীর নিকট এ কথা বলিলেন। মায়া বড় রাগ করিয়া বলিলেন, "যদি সহস্র বৎসর তাঁহাদিগকে একঘরে থাকিতে হয়, তাহাও ভাল, তথাপি এমন অন্যায় কাজ তাঁহার দ্বারা হইবে না।" কথাটা সুলোচনার কর্ণে গেল। তিনি কোন কথা বলিলেন না; সমস্ত দিবস গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অর্দ্ধচন্দ্রকরশালিনী সপ্তমী-রজনীর মধ্যযামে সুলোচনা শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। পার্শ্বে ননদিনী মায়া গাঢ়-নিদ্রায় অভিভূত। ননদিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইবার আশঙ্কায় সুলোচনা নিঃশব্দপদসঞ্চারে গৃহের অর্গল মোচন করিয়া বাহিরে আসি-লেন। তখন সমস্ত জগৎ সুষুপ্তির ক্রোড়ে শায়িত। কেবল ঝিল্লীরব যেন স্তব্ধ যামিনীর সুপ্তিভঙ্গ করিতেছে।

মুহূর্ত্তের জন্য সুলোচনা একবার দাওয়ায় বসিলেন; গললগ্নী-কৃতবাসে অভীষ্ট-দেবতাকে প্রণাম করিলেন; উদ্দেশে তাঁহার নারী-জীবনের যিনি অধিকারী, তাঁহার চরণে মস্তক নত করি-লেন; তাঁহার সহস্র দোষ সত্ত্বেও সুলোচনা তাঁহার প্রতি ভক্তি-হীনা হইতে পারেন না। আর গতজীব গুরুজনমণ্ডলীর চরণো-দ্দেশে ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলেন। তাহার পর গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আসিয়া একবার দাঁড়াইলেন। অশ্রু-সিক্ত-নয়নে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। মাথার উপর সমস্ত জগতের চক্ষুস্বরূপ অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজ করিতেছেন; ঊর্দ্ধহস্তে সুলোচনা তাঁহাকে নমস্কার করিলেন; তাহার পর বাটীর বাহির হইলেন।

এইরূপ নিশীথ-সময়ে—রাত্রিকালে একাকিনী পথে চলিতে একবার সুলোচনার প্রাণ আতঙ্কে কম্পিত হইল। তাহার পর-মুহূর্ত্তেই তিনি মনে করিলেন, যখন এ জীবনের সঙ্গে ইহজগতের সমস্ত সম্পর্ক আর ক্ষণকাল পরেই বিচ্ছিন্ন হইবে, তখন তাঁহার

আর ভয় কি? পথে চলিতে চলিতে তাঁহার কত কথাই মনে পড়িল। হৃদয়ের মধ্যে চিন্তার তরঙ্গ যেন প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। চলিতে চলিতে তাঁহার দুই তিনবার পদস্খলন হইল. শরীরেও তিনি সামান্য আঘাত পাইলেন; কিন্তু তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। তাঁহার অন্তরে যে আগুন জ্বলিতেছিল, সামান্য শারীরিক আঘাত তাহার নিকট অতি তুচ্ছ।

অনেকক্ষণ পরে সুলোচনা ভাগীরথী-তীরে উপস্থিত হইলেন। তখন সপ্তমীর চন্দ্র ধীরে ধীরে গঙ্গাবক্ষে নিমগ্ন হইতেছিল। মাথার উপর উদার অনন্ত আকাশ, যেন সুরধুনীর শিরোপরি রাজচ্ছত্রের মত শোভা পাইতেছে। অনন্ত নক্ষত্ররাজি যেন তাহার উপর বিবিধ রত্নে খচিত। বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের অপূর্ব্ব পরিচয়। তীরে ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানাবলী— সৃষ্টিকর্ত্তার কীর্ত্তি-স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। সুলোচনা সেই সোপানোপরি কিছু-ক্ষণের জন্য বসিলেন। অতীত-জীবনের সমস্ত কথা তাঁহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। তাঁহার মাত্র সপ্তদশ বৎসর বয়স। এই বয়সেই তাঁহার পার্থিব জীবনের লীলাখেলা সমস্তই ফুরাইয়া গেল! পরলোকগত পিতৃদেবের কথা তাঁহার মনে পড়িল। উর্দ্ধদিকে চাহিয়া তিনি দেখিলেন, যদি পিতা স্বর্গ হইতে তাঁহার মন্দভাগিনী কন্যাকে দেখিতে পান। তাঁহাকে তিনি বড় ভাল-বাসিতেন, আর আজ তাঁহার সেই স্নেহের পাত্রী এই জগতের নিদারুণ অত্যাচারে সন্তাপিত দেহভার-বহনে অসমর্থ—বিষম অশান্তির আগুনে নিয়ত দগ্ধ হইতেছেন। তিনি কি তাঁহার অভাগিনী কন্যাকে স্থান দিবেন না? গর্ভধারিণীর কথা সুলো-চনার মনে নাই। শৈশবে একদিন তিনি তাঁহার পিতাকে

তাঁহার মা কোথায়, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার মাতা স্বর্গে গিয়াছেন। সে কথাও তাঁহার আজ মনে পড়িল। তাই তিনি মনে মনে তাঁহার গর্ভধারিণীকে ডাকিলেন, 'মা! যদি তুমি স্বর্গে থাকো—তাহা হইলে স্বর্গ থেকে আমায় দেখ, আমি এ সংসারে কত যন্ত্রণা পাইতেছি!' সুলোচনার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িল। এ সংসারে তিনি এমন কি গুরুতর পাপ করিয়াছেন যে, সেই পাপের ফলে এরূপ মর্ম্মপীড়া পাইলেন? অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি কাঁদিলেন, অশ্রুজলে যেন হৃদয়ের আগুন কিয়ৎপরিমাণে নির্ব্বাণ হইল। তাঁহার ভাগ্যে ত সবই মিলিয়াছিল, মনের মত কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বামী—জননীর মত স্নেহশীলা শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী—জনকের মত স্নেহশীল শ্বশুর—নারীর ভাগ্যে যাহা বাঞ্ছনীয়—তাঁহার ত সমস্তই মিলিয়াছিল, কেবল অদৃষ্টবৈগুণ্যে তিনি সমস্তই হারাইলেন!

সুলোচনা উঠিয়া দাঁড়াইলেন; ধীরে ধীরে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া, গঙ্গাসলিলস্পৃষ্ট শেষ সোপানোপরি উপবেশন করিলেন; ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গাজল স্পর্শ করিলেন, মস্তকে দিলেন, চক্ষে দিলেন, বক্ষে দিলেন।

'মা সুরধুনি!—মা সর্ব্বপাপনাশিনি!—মা গো! আমার ইহজীবনে যদি কোন পাপ থাকে, তোমার পবিত্র জলস্পর্শে যেন সে পাপমোচন হয়। আমি বড় জ্বালায় জ্বলিতেছি। এ সংসারে এসে নারীর যাহার অধিক কলঙ্ক নাই, আমি সেই কলঙ্কে কলঙ্কিতা, কিন্তু মা, তুমি ত সব জানো। আমার মনের অবস্থা তুমি ত সব বুঝ্‌তে পার মা! স্বামী—যাঁর তুল্য গুরু ইহ-

জগতে স্ত্রীলোকের আর নাই, তিনিই আমাকে পায়ে ঠেলেছেন নিরপরাধিনী—তাঁহার চরণ ছাড়া আমি এ সংসারে আর কিছুই জানিনি। তিনি আমাকে মিথ্যা কলঙ্কে লোক-সমাজে কলঙ্কিত করেছেন। তবে আর কেন এ পাপপ্রাণ রাখি? কোন্ সুখের আশায়—কোন্ প্রলোভনে এ অসার দেহভার বহন করি? আমার ত সব সুখ ফুরিয়েছে! স্বামি-পরিত্যক্তা কলঙ্কিনীর সংসারে আর স্থান নেই, জুড়াইবার আর অন্য জায়গা নাই। মা গঙ্গে! তোমার কোলে শুয়ে যেন জুড়ুতে পাই মা!'

সুলোচনা গঙ্গাজলে নামিলেন। যখন আবক্ষ জলে নিমজ্জিতা হইলেন, সেই সময়ে বজ্রগম্ভীরস্বরে তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল,—"ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।"

চমকিতভাবে সুলোচনা পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিতে পাইলেন, দুই জন সন্ন্যাসী। তখন উষার অস্পষ্ট আলোক পূর্ব্বগগনের সীমান্ত-প্রদেশ হইতে প্রকটিত হইতেছিল।

সন্ন্যাসিদ্বয়ের মধ্যে অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি সুলোচনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'কে তুমি মা, একাকিনী এরূপ সময়ে আবক্ষ গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে? ওঠ, আমার কথা শোনো।'

সুলোচনা তাঁহার বাক্য অন্যথা করিতে সাহস করিলেন না; কম্পিত-অন্তরে তিনি জল হইতে উঠিলেন। সন্ন্যাসীর কথার উত্তর দিতে প্রথমে তাঁহার সাহস হইল না।

সন্ন্যাসী আবার বলিলেন, "কে তুমি? তোমার আকৃতি দেখে বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তুমি কোন গৃহস্থের কুলবধূ: কিন্তু এই অসময়ে একাকিনী গঙ্গাজলে দাঁড়িয়েছিলে, এর কারণ কি? স্পষ্ট

ক'রে আমার কথার উত্তর দেও, নিশ্চয় তোমার মনে কোন পাপ-সঙ্কল্প আছে।"

সুলোচনা সাহস করিয়া উত্তর দিলেন, "পাপ কি পুণ্য, জানি না প্রভু, আমি গঙ্গায় ডুবে মর্‌তে এসেছি।"—সুলোচনার মনে হইল, তাঁহারা দৈব-প্রেরিত।

সন্ন্যাসী। আত্মহত্যা কেন? এ গুরুতর কার্য্যের প্রধান কারণ কি?

সুলো। সে কথা লোক-সমাজে বলিবার নহে। আমার জীবনে কোন সুখ নাই বাবা!

সন্ন্যাসী। তা না থাকৃতে পারে; কিন্তু তাই ব'লে কি আত্মহত্যা ক'রে জীবলীলার অবসান কর্‌তে হবে? তার মানে কি?

সুলো। আপনি সন্ন্যাসী; সুতরাং অন্তর্যামী, আপনার অবিদিত কিছুই নাই। আমার দুঃখের কথা বল্‌বার নয়। আমি স্বামিপরিত্যক্তা

সন্ন্যাসী বুঝিতে পারিলেন, সংসারের কঠিন অত্যাচারে উৎ-পীড়িত দেহভার বহনে অসমর্থা হইয়া এই রমণী আত্মবিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছে। তাই তাহাকে মিষ্টকথায় বলিলেন, "মা! তোমার কথার ভাবে বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তুমি মানুষের অসহ্য অত্যাচারে উৎপীড়িতা হয়ে আত্মহত্যায় উদ্যত হয়েছ। আমার অনুরোধ রক্ষা কর, আগে তুমি উপরে উঠ—তার পর তোমার কথা শুনিব। মৃত্যুর ত অনেক সময় আছে, আর গঙ্গা কখন একদিনে শুকিয়ে যাবে না।"

সেই তেজঃপুঞ্জকলেবর নবীন-সন্ন্যাসীর আকৃতি দেখিয়া—

তাঁহার মাতৃসম্বোধনে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার প্রতি সুলোচনার ভক্তি জন্মিল। তিনি তাঁহার কথা অমান্য করিতে সাহস করিলেন না।

সন্ন্যাসী তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখান থেকে তোমাদের বাড়ী কত দূর মা?"

সুলো। এখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ পথেরও অধিক হইবে।

সন্ন্যাসী। তুমি বাড়ী ফিরে চল, তোমাকে আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই। না জানি, তোমার বাড়ীর লোক তোমাকে না দে'খে তোমার জন্য কত ব্যাকুল হয়েছেন!

সুলো। বাড়ী যেতে আর আমার ইচ্ছা নেই। আপনার কাছে যথার্থ কথা বল্‌তে কি, আমার জীবনে অতিশয় ঘৃণা হয়েছে।

সন্ন্যাসী। জীবনের উপর ঘৃণা হয়েছে, এমন কি দুঃখ মা? আমি তোমার সন্তানের তুল্য—আমার কাছে বল্‌তে যদি কোন বাধা না থাকে, তা হ'লে তোমার নিজের কথা তুমি স্বচ্ছন্দে বল্‌তে পার;—তোমার কথা শুনে যদি তোমার দুঃখের কোন প্রতীকার কর্‌তে পারি।

সুলো। বাবা! আমার এ দুঃখমোচন কর্‌বার ক্ষমতা কাহারও নাই, তবে আপনি দেবতা। আমি বড় অশান্তি ভোগ কর্‌ছি। একদিন আমার বড় সুখ গিয়েছে। মনের মত কর্ত্তব্যপরায়ণ স্বামী—বাবা!—আমার ভাগ্যদোষে এখন সেই স্বামী আমায় বিরূপ হয়েছেন। তাও সহ্য কর্‌তে পারি—কিন্তু যা হ'তে নারীর আর কলঙ্ক নাই, আমি বিনা দোষে আমার

স্বামী কর্তৃক সেই কলঙ্কে লোক-সমাজে কলঙ্কিত। লোকে আমাকে উপহাস ক'রে নানা কথা বল্‌ছে। স্ত্রীলোক সব সহ্য কর্‌তে পারে, কিন্তু অসতী অপবাদ তার অন্তরে বজ্রাঘাতের চেয়েও অধিক বাজে।

সন্ন্যাসী। এ সংসারে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নেই। স্বামী তাঁর ধর্ম্মপত্নীকে অসতী ব'লে লোকসমাজে প্রচার করেছেন? এরূপ হৃদয়হীন তিনি?

সুলো। তাঁর মহৎ প্রাণ, কিন্তু এক বেশ্যার প্রেমে অভিভূত হয়ে তিনি আত্মবিস্মৃত হয়েছেন। স্বামিনিন্দা মহাপাপ—আমি তাঁর সম্বন্ধে আর কোন কথা বল্‌তে পারব না। বাবা! আপনি সন্ন্যাসী—তায় আমার আত্মায় মাতৃ-সম্বোধনে পরিতৃপ্ত করেছেন, সুতরাং আপনার নিকট কোন কথা বল্‌তে বাধা নেই। আমি পাঁচ মাস গর্ভবতী। কিন্তু——

সুলোচনা আর কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িল কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল।

সন্ন্যাসী। তুমি গর্ভবতী অথচ আত্মহত্যা কর্‌তে উদ্যত হয়েছিলে। একটি নিরীহ জীবও যে তোমার সঙ্গে প্রাণ হারাত মা! কি গুরুতর কাজ কর্‌তে গিয়েছিলে তুমি। জগদীশ্বর তোমাকে এ মহাপাপ হ'তে রক্ষা করেছেন।

সুলো। অনেক ভেবে আমি আত্মহত্যায় উদ্যত হয়েছি। এই গর্ভস্থ সন্তানের যিনি জন্মদাতা, নিজে তিনি প্রচার করেছেন, এ সন্তান তাঁর নয়।

সন্ন্যাসী। সন্তানের উপর দয়া-মমতা নেই—এমন নৃশংস তিনি?

সুলো। সেই বেশ্যার কুহকে তিনি মনুষ্যত্বহীন। বাবা! এখন আপনি বলুন দেখি, এ সন্তান জন্মগ্রহণ ক'রে এ পৃথিবীতে কোথায় স্থান পাবে? যখন তার জ্ঞান হবে, বালক যখন আপনার জন্মবৃত্তান্ত শুনে আপনার অবস্থা বুঝ্‌তে পার্‌বে, আমি তখন তাকে কি ব'লে প্রবোধ দিব?

সন্ন্যাসী। মা! তোমার গর্ভস্থ সন্তান তোমার মুখোজ্জ্বল কর্‌বে। স্বামিপরায়ণা সতী তুমি—স্বামীর এত অত্যাচারেও তুমি তাঁহার প্রতি ভক্তিহীনা নও। তোমার পুণ্যে তোমার সন্তান নিশ্চয়ই পৃথিবীতে প্রতিপত্তি লাভ কর্‌তে পার্‌বে। আর তোমার অদৃষ্টে যে কাল-মেঘ সঞ্চারিত হয়েছে, অচিরেই দেখ্‌তে পাবে, সে মেঘ কেটে যাবে। বুঝ্‌তে পার্‌বে, ধর্ম্মের জয় অবশ্য আছে।

সুলো। তার পর শুনুন প্রভু আমি তাও সহ্য ক'রে ছিলুম, প্রতিবেশিনী রমণীগণের শ্লেষবাক্য সর্পাঘাতের মত আমার অন্তরে দংশন করেছে, জগদীশ্বরকে ডেকে আমি তাও সহ্য করেছি; কিন্তু শেষে দেখ্‌লুম, আমার বেঁচে থাকা আর কোন প্রকারে উচিত হয় না। যারা আমায় বড় ভালবাসে, সংসারে যারা এখন আমার একমাত্র অবলম্বন, দেখ্‌লুম, আমার জন্যই তারা সমাজে পতিত—আমার জন্যই তারা লোকের নিকট ঘৃণিত। তখন আমি সঙ্কল্প কর্‌লুম, আমার আর বেঁচে থাকা কোনমতেই উচিত হয় না।

সন্ন্যাসী। সংসারে তোমার কে কে আছেন?

সুলো। আমার এক বিধবা ননদিনী আর আমার স্বামীর সহোদর ভাই।

সন্ন্যাসী। তোমার স্বামী থাকেন কোথায়?

সুলো। পার্শ্ববর্ত্তী আর এক গ্রামে। সেই গ্রামের এক জমীদারের বাগান-বাটীতে সেই বেশ্যাকে নিয়ে বাস কচ্ছেন।

সন্ন্যাসী। তিনি কি করেন?

সুলো। কিছুই না—আগে ডাক্তারী কর্ত্তেন. এখন কিছুই করেন না।

সন্ন্যাসী। তবে তাঁর চলে কি ক'রে?

সুলো। অনেক ধনরত্ন নিয়ে সেই বেশ্যা তার পিত্রালয় ত্যাগ ক'রে এসেছে। এখন তারই অর্থে আমার স্বামী পরম সুখে তার সঙ্গে বাস কচ্ছেন।

সন্ন্যাসীর কৌতূহল বাড়িল;—বলিলেন, "আচ্ছা মা! তুমি জানো কি, সেই বেশ্যার বাড়ী কোথায়?"

সুলো। শ্যামপুরে।

সন্ন্যাসী। শ্যামপুরে?

সুলো। সে সেখানকার জমীদারের কন্যা, জাতিতে ব্রাহ্মণ, আমার স্বামী ব্রাহ্মণকন্যা হরণ করেছেন।

এমন সময়ে অপর সন্ন্যাসী উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন "পিশাচী, রাক্ষসী, সয়তানী ——"

প্রথম সন্ন্যাসী তাঁহাকে শান্তভাবে বলিলেন, "স্থির হও,— হরেন্দ্র!"

পাঠক মহাশয়! এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন, এ সন্ন্যাসিদ্বয় আর কেহ নহে, আপনাদের পূর্ব্বপরিচিত সদানন্দঠাকুর ও হরেন্দ্রকুমার। তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাক্ষেত্র শ্রীনবদ্বীপধামে গমন করিতেছিলেন। রাত্রিশেষে পথ চলিতে

চলিতে দেখিতে পাইলেন, একটি স্ত্রীলোক আবক্ষ গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া আছে। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ত্বরিত-পদে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর সুলোচনার অবস্থা ও পরিচয় পাইয়া তাঁহার দুঃখের প্রতীকার করিতে দৃঢ় সংকল্প করিলেন।

হরেন্দ্রকুমার তাঁহার গুরুতুল্য সদানন্দঠাকুরের কথায় স্থির হইলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর স্থির হইল না।

সদা। চল মা! তোমাদের বাড়ীতে চল। তোমাকে সেখানে রেখে, আমরা তোমার স্বামীর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে, যদি তাঁর চরিত্র-সংশোধন করতে পারি, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করব।

সুলো। আপনারা দেবতা তুল্য। আপনাদের অসাধ্য কিছুই নাই।

তখন তিন জনেই সুরেশ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে মাত্র, সুতরাং সুলোচনার অনুপস্থিতিতে কোন প্রকার গোলযোগ ঘটে নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সদানন্দঠাকুর হরেন্দ্রকুমারকে সঙ্গে লইয়া, বারাণসীধাম পরিত্যাগ করিয়া, প্রথমে একবার তাঁহাদের শ্বশুরালয়ে আগমন করিলেন। সহৃদয় সুহৃদ্ সদানন্দঠাকুরের কথামত হরেন্দ্রকুমার আর একবার শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করিলেন। এবার তাঁহার শ্বশুরমহাশয় তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন এবং গতকার্য্যের জন্য অনুতাপ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে সহধর্ম্মিণীর আচরণের কথা তাঁহার শ্বশুরের নিকট শ্রবণ করিয়া, হরেন্দ্রকুমার প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন। স্ত্রীর স্বভাব তিনি জানিতেন, তাই দাম্পত্যপ্রণয়-সুখের আকাঙ্ক্ষা ইহ-জীবনের মত অনেক দিন ত্যাগ করিয়াছিলেন। তবে মনে একমাত্র প্রবোধ ছিল, তাঁহার স্ত্রী ব্যভিচারিণী না হইয়া, তাহার পিতৃগৃহে বাস করিতেছে। এখন কুলকলঙ্কিনী মনোরমার চরিত্রের কথা শুনিয়া তিনি প্রাণে আরও ব্যথা পাইলেন, কিন্তু কি করিবেন, সুখ-দুঃখ কর্ম্মানুযায়ী, মনুষ্যভাগ্যে বিধির নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত, এখন আর কেহ তাহা মুছিতে পারে না।

বিদায়ের কালে হরেন্দ্রকুমার তাঁহার শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। আজ সেই দাম্ভিক ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে অহঙ্কারী সীতানাথ রায় জামাতার হস্ত ধরিয়া বালকের মত রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই কাতর ক্রন্দনে হরেন্দ্রকুমার তাঁহার পূর্ব্বাচরণের কথা একেবারে বিস্মৃত হইলেন।

হরেন্দ্রকুমার বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার শ্বশুরের প্রাণের যাতনা কত গভীর। তাঁহার একমাত্র কন্যা—অতি আদরে যাহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, সেই কন্যা তাঁহার মায়া-মমতা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার অকলঙ্ক কুলে কালি ঢালিয়া, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তাঁহাকে স্নেহ-সম্বোধনে সম্বোধিত করিবার আর কেহ নাই। হরেন্দ্রকুমার লক্ষ্য করিলেন এই অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁহার শ্বশুর একেবারে বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

হায়! ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ—আত্ম-গৌরবে দীপ্তচক্ষু সীতানাথ বাবু! আজ তোমার সে দম্ভ গেল কোথায়? কালচক্র অবিশ্রাম ঘুরিতেছে, মনুষ্যের ভাগ্য-বিপর্যায় ঘটিতে কতক্ষণ?

হরেন্দ্রকুমার শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া সদানন্দঠাকুরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মনোবেদনায় কাতর তাঁহার পরম সুহৃদ্ সদানন্দঠাকুরের নিকট অকপটে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ব্যভিচার ও কুলত্যাগের পরিচয় প্রদান করিয়া যেন তাঁহার হৃদয়বেদনা কিঞ্চিৎ লাঘব হইল। হরেন্দ্রের কথা শুনিয়া সদানন্দ প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলেন। মনোরমাকে তিনি অনেক দিন হইতেই দেখিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর শৈশব-সঙ্গিনী—তাঁহার অন্নদাতার একমাত্র দুহিতা। আজ তাঁহার মনে অতীতের সমস্ত কথাই জাগিয়া উঠিল। আজ যদি সুখদা থাকিতেন, তাহা হইলে না জানি, তিনি মনোরমার কথা শুনিয়া কত কষ্ট বোধ করিতেন।

সদানন্দ হরেন্দ্রকুমারকে বলিলেন, "ভাই হরেন্দ্র! ভগবানের ইচ্ছায় আমরা উভয়েই সমদশাপন্ন। সুখদাকে ভাগী-

রথী-গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়েছি। আমি এক রকম সংসারের ভাবনা থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছি। কিন্তু তোমার এই নবীন বয়স, তুমি সংসারের কোন সুখেই সুখী হও নাই। আমার অনুরোধ, তুমি বিয়ে ক'রে আবার সংসারী হও।"

হরেন্দ্র। দাদা! ও কথা আমায় আর বল্‌বেন না। আপনার সঙ্গ আমি আর কখনও পরিত্যাগ কর্‌বে না।

সদা। তাই কি হয়? তোমার বয়স অল্প, এই বয়স থেকে তোমার উদাসীনভাবে কাল কাটান কোনক্রমেই উচিত হয় না। স্ত্রীবিয়োগ হ'লে লোকে পুনরায় দারপরিগ্রহ ক'রে সংসার করে। তুমি মনে কর, তোমার স্ত্রী জীবিত নাই, মনোরমা ম'রে গেছে।

হরেন্দ্র। মলে ত দাদা এত কষ্ট হ'ত না। সে যদি মর্‌ত, তা হ'লে আমি সুখী হ'তে পার্‌তাম।

সদা। যথার্থই তাই। তার মরণই মঙ্গল। কিন্তু কি কর্‌বে বল। সুখ-দুঃখ বিধাতার ইচ্ছা। তোমার জীবনে তুমি কষ্ট পাবে, তোমার অদৃষ্টে লেখা। আর এ জন্য আক্ষেপ করো না।

হরেন্দ্র। আক্ষেপ আর কিছুই নয়। স্ত্রী নিয়ে কখন সুখী হইনি, আর সে যদি তার পিতৃগৃহে থাকৃত, তা হ'লেও তাকে নিয়ে যে কখন সুখী হতেম, সে সম্ভাবনাও ছিল না। তবে এই আক্ষেপ, সর্ব্বনাশী আমাদের এই নিষ্কলঙ্ক কুলে কালি ঢেলে দিলে।

সদা। তা আর ভেবে কি কর্‌বে? এখন তোমার কর্ত্তব্য কি, তাই স্থির কর। আমার মতে তোমার আবার বিবাহ করা উচিত।

হরেন্দ্র। না দাদা, ও অনুরোধ আর করো না। আর বিয়ের নাম করো না। তোমার মত সঙ্গী পেলে আমি সারা-জীবন পরম সুখে কাটাতে পার্‌ব। আমাকে তুমি কখন ত্যাগ করো না।

সদা। তুমি আমার সহোদরের অধিক. আমার কনিষ্ঠ নেই. তোমাকে দিয়ে ভগবান্ আমার সে অভাব পূরণ করে-ছেন। তবে তোমার অবস্থা দেখ্‌লে আমার প্রাণে বড়ই কষ্ট হয়।

তখন দুই বন্ধুতে মিলিয়া এই স্থির করিলেন যে, পরিব্রাজক বেশে দেশে দেশে পর্য্যটন করিবেন এবং অনাথ-আতুর লোককে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ সুখে কাটাইবেন।

সদানন্দ তাহার পর শ্বশুরালয়ের অস্থাবর স্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিলেন। আর জন্মের মত সেই আনন্দ-নিকেতন, যেখানে সুখদাকে লইয়া তিনি একদিন ধরাতলে নন্দনকানন সৃজন করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেশপর্য্যটন করিতে বাহির হইলেন। হরেন্দ্রকুমারও তাঁহার অনুগমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সদানন্দ ও হরেন্দ্রকুমার দুই বন্ধুতে যাত্রা করিলেন। গৈরিক-বসনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত, মস্তকের কেশ রুক্ষ, হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব সন্ন্যাসীর বেশে তাঁহারা পথ চলিতে লাগিলেন। এই নবীনবয়স্ক সন্ন্যাসিদ্বয়ের আকৃতি দেখিয়া পথের লোক বিস্মিত হইল; কেহ কেহ বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহারা অল্প কথায় প্রশ্ন-কারীকে উত্তর দিয়া আপন মনে আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রথমে তাঁহারা তারকেশ্বরে পরম যোগকুলধন বাবা তারক-নাথকে দর্শন করিয়া যথারীতি পূজার্চ্চনা করিলেন। তাহার পর তাঁহারা সে স্থান হইতে কালীঘাটের উদ্দেশে যাত্রা করি-লেন। সেখানে মাতৃমন্দিরে প্রবেশ করিয়া মাতার চরণপদ্মে ভক্তিপূর্ব্বক অঞ্জলি প্রদান করিলেন। তাহার পর গঙ্গাতীরের পথ ধরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাক্ষেত্র শ্রীনবদ্বীপধাম-দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন।

রাত্রিশেষে গাত্রোত্থান করিয়া, ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, তাহারা পথপর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। মধ্যাহ্নে কোন পান্থশালায় উপস্থিত হইয়া, স্নানাহ্নিক শেষ করিয়া, সাত্ত্বিকভাবে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন, কখন বা ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া দিনযাপন করিতেন।

শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিবার পর হইতে সদানন্দ হরেন্দ্রকুমারের প্রতি বরাবরই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার সেই সহাস্য শান্তমূর্ত্তি এক বিরাট গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইয়াছিল। বৈশাখের দিনান্তে নবঘনে আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত হইলে পৃথিবী যেরূপ নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করে, সদানন্দ চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার সহযাত্রীর অন্তরেও সেইরূপ একখণ্ড কাল-মেঘ ঢাকিয়া তাঁহাকে স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছে। দেশভ্রমণে মনের আবর্জ্জনা দূর হইয়া চিত্তের প্রফুল্লতা জন্মে। সদানন্দ আশা করিয়াছিলেন যে, নানা দেশ ভ্রমণ করিলে হরেন্দ্রকুমারের চিত্তের অপ্রসন্নভাবও দূর হইবে; কিন্তু যখন দেখিলেন, কার্য্যতঃ তাহা হইল না, তখন একদিন তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই হরেন তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব।"

হরেন্দ্র। কি আশ্চর্য্য দাদা, আপনি আমাকে কুণ্ঠিতভাবে এ কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন কেন? আপনি যা বল্‌বেন, বলুন, আমি তার উত্তর দিতে বাধ্য।

সদা। তোমাকে ইদানীং যেন কিছু বেশী বেশী চিন্তাযুক্ত দেখ্‌ছি। শ্যামপুর পরিত্যাগ কর্‌বার পর থেকে আমি সর্ব্বদাই লক্ষ্য কর্‌ছি যেন, একটা ভয়ানক অপ্রসন্নতা তোমাকে ঘিরে আছে। তার পূর্ব্বে তোমার এমন ভাব ত কখন দেখিনি।

হরেন্দ্রকুমার নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। সদানন্দ পুনরায় বলিলেন, "কেন হরেন, তুমি এত বিমর্ষ কেন?"

হরেন্দ্রকুমারের চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িল। তাঁহার এই নবীন বয়স, এই বয়সে তিনি সংসারের সমস্ত সুখ থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। এ পৃথিবীতে তাঁহার এমন কোন ভালবাসার পাত্র

নাই, যাহার মুখ দেখিয়া তাঁহার অশান্তিময় জীবনে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ হয়। রাহুগ্রস্ত দিবাকরের মত তাঁহার জীবনের সমস্ত আলোকরাশি এক বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার অদৃষ্ট-আকাশে কখনও শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার উদয় হইল না, ক্ষণেকের জন্যও জ্যোৎস্নার আভা কখন পতিত হয় নাই।

সদানন্দ তাঁহার অন্তরের কথা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার বেদনা বুঝিয়া নিজের প্রাণেও বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন; তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিলেন,"দেখ ভাই, মনে ক্ষোভ করো না। জগদীশ্বরের কার্য্যে দোষ দিও না। তোমাকে আমি কত দিন বুঝিয়েছি যে, মানুষ কৃতকর্ম্মফলে সুখ দুঃখ-ভোগ করে। দেখ, সংসারে এসে কোন লোকই সম্পূর্ণ সুখী নয়। অভাব মানুষ-মাত্রেরই আছে। তুমিও জানো, ভগবান্ বলেছেন,—

"কর্ম্মণা জায়তে জন্তুকর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।"

কর্ম্ম অনুসারে মানুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করে। দুঃখ ত্যাগ কর, মনের অপ্রসন্নতা দূর কর। জগদীশ্বর যে ভাবে রেখেছেন, সেই ভাবেই সন্তুষ্ট থাকো। কারণ, সন্তোষই সুখের কারণ। ভগবান্ নিজে বলেছেন,—

"সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥"

হরেন্দ্র। দাদা, বুঝ্‌তে পারি সব, তবুও মন স্থির কর্‌তে পারি না। চারিদিকে চেয়ে দেখি, সংসারে আমার আপনার বল্‌তে কেউ নেই, আমার এই উদাস প্রাণের আকুলতা তখন আরও বেড়ে যায়। ভগবান্ কি দোষে আমাকে এত দুঃখ দিলেন?

সদানন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন, "হায়, যদি মহা পুরুষের আবার একবার দেখা পাই, তা হ'লে তিনি আমাকে এ বিষয়ে ভাল রকম ক'রে বুঝিয়ে দিতে পারবেন। সুখদাকে হারিয়ে যে দিন সেই নিস্তব্ধ নদীতীর কম্পিত ক'রে ভগবানের নামে সংস্র দোষারোপ করেছিলেম, সেই সময়ে তাঁর চরণদর্শন পাই। কি জ্ঞানগর্ভ মধুর উপদেশ তাঁর—শুনেই আমার প্রাণ বিগলিত হ'ল। বলেন, এ সংসারে কিছুই স্থায়ী নয় কেবল-মাত্র কর্ম্মফল স্থায়ী। আপনার বলতে মানুষের কেউ নেই, কেউ তোমার সঙ্গে যাবে না; অথচ তুমি যাকে আপনার করবে, সেই তোমার আপনার হবে; আমার সঙ্গে দিন কতক থাকলে এ কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারবে।"

হরেন্দ্রকুমার সদানন্দের এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। পরে তাঁহাকে বলিলেন, "আর আমার অন্য কোন চিন্তা নাই, এখন আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়ে দেখি, যদি কোন প্রকারে মনে শান্তি লাভ করতে পারি।"

তাহার পরদিন রাত্রিশেষে তাঁহারা নবদ্বীপ উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথে চলিতে চলিতে সুলোচনার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ নয়। গঙ্গাতীরের পথ ধরিয়া যাইতে যাইতে সদানন্দ দেখিতে পাইলেন কোন স্ত্রীলোক আকণ্ঠ গঙ্গাজলে নিমজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিল, তাহা পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যে দিন সুরেশচন্দ্র তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীর নামে এইরূপ গুরুতর কলঙ্ক আরোপ করিলেন সেই দিন হইতেই তিনি চিরকালের মত তাঁহার মনের শান্তি হারাইয়া ফেলিলেন। নেশার ঘোর কাটিয়া গেলে যখন চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, কি ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন; কিন্তু যাহা হইয়াছে, আর তাহার উপায় নাই। সহস্র বিষধর-সর্প-দংশনে লোকে যেমন যাতনায় অধীর হয়, সুরেশচন্দ্রও মনের মধ্যে সেইরূপ যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। তাহার কি কোন প্রতীকার নাই? কি করিলে তিনি মনের শান্তি ফিরিয়া পান? সুরেশ বাবু অনেক ভাবিলেন, কিন্তু ভাবনার কূল পাইলেন না।

হায়, সুরেশচন্দ্র তখনও যদি তুমি তোমার অনুগত পত্নীর নিকট ফিরিয়া যাইতে এবং তোমার সাধ্বী স্ত্রীর নিকট স্বীয় দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিতে, তাহা হইলেও তুমি ভবিষ্যতে সুখী হইতে পারিতে। হিন্দু স্ত্রীলোক স্বামীর মুখ দেখিয়া তাহার সমস্ত দুষ্কর্ম্মের কথা ভুলিয়া যায়, সহস্র নির্য্যাতনেও তাহার মনের মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না; একবারমাত্র স্বামীর আদর পাইলে, তাঁহার সহস্র অত্যাচারের কথা মন হইতে মুছিয়া ফেলে; একমাত্র হিন্দু-স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য কোন জাতিতে এরূপ ক্ষমাগুণ নাই। কিন্তু সুরেশ বাবুর সাহস হইল না, কি করিয়া তিনি সুলোচনার সম্মুখে উপস্থিত হইবেন? কি বলিয়া তাঁহার

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন? তাঁহার নিকট তিনি যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন, সে অপরাধের ক্ষমা নাই।

রূপমুগ্ধ যুবক! কামাতুরা রাক্ষসীর-প্রণয় লোভে চৈতন্য হারিয়েছিলে, তখন তুমি একবারও মনে ভাবিতে পার নাই যে, মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন,সর্ব্বশক্তিমান্ নারায়ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণে বসিয়া সকলেরই কার্য্যের বিচার করিতেছেন। ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিত কর্ত্তব্যবিমুখ সুরেশচন্দ্র তখন একবারও ভাবেন নাই, সব কার্য্যেরই সীমা আছে, যৌবন ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্য জলবুদ্বুদের মত ক্ষণেকের জন্য, কেবল সৎকার্য্যই মনুষ্য-জীবনের কীর্ত্তিস্বরূপ চিরস্থায়ী। অমরত্ব লইয়া সেই জন্ম গ্রহণ করে না, আপন কাজ করিয়া গেলে ঈশ্বরের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হয় না।

সুরেশবাবু সর্ব্বদাই ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! কি করিলাম, কি করিলে আবার যেমন ছিলাম তেমনি হইতে পারি? নর হত্যা করিয়া রাজদণ্ডের ভয়ে লোকে যেমন সর্ব্বদাই সন্ত্রস্তভাবে অশান্তি ভোগ করে, তিনিও সেইরূপ সন্ত্রস্ত চিত্তে দিবারাত্র দারুণ অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন।

সুরেশের স্বভাবপরিবর্ত্তন দেখিয়া মনোরমা ও রামকানাই বাবু তাঁহাকে অতিরিক্ত মদ্যপান করাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনিও কোনরূপ আপত্তি না করিয়া অম্লান-বদনে সেই তীব্র হলাহল দিবারাত্রি আকণ্ঠ পান করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ নেশা থাকে, ততক্ষণ তিনি চিন্তার হাত থেকে পরিত্রাণ পান কিন্তু নেশার ঘোর কাটিয়া গেলে তিনি বিষম যন্ত্রণায় অধীর হন। এখন হইতে তিনি উপযাচক হইয়া মনোরমার নিকট মদ্যপানার্থে

অর্থ চাহিতে লাগিলেন। এত দূর তাঁহার অধঃপতন ঘটিল যে, স্বয়ং শৌণ্ডিকালয়ে যাইয়া মদ্যপান করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপ দিবারাত্রি মদ্যপান হেতু এবং নিদারুণ মানসিক চিন্তায় সুরেশের দেহ শুষ্ক হইতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি উৎকট ক্ষয়-রোগে আক্রান্ত হইলেন। প্রথম প্রথম তাঁহার অল্প অল্প জ্বর হইতে লাগিল। শরীরের অবস্থা দেখিয়া তিনি মনোরমাকে তাহা জানাইলেন; মনোরমা তাচ্ছিল্য করিয়া তাঁহার অসুখের কোন প্রতীকার করিল না। সুরেশ বাবু নিজে ডাক্তার, তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ব্যাধি সামান্য নয়; তাই আবার মনোরমাকে বলিলেন, মনোরম বিরক্ত হইয়া উত্তর করিল, "সামান্য জ্বর, ভাল হয়ে যাবে, তার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন?" সুরেশ বাবু আর কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার জীবনে ঘৃণা জন্মিয়াছিল, সুতরাং মৃত্যুকে ততটা ভয় নাই।

এক মাসের মধ্যে সুরেশ বাবু শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার উত্থানশক্তি রহিত হইল। রোগ-যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তিনি আত্মীয়স্বজনের অভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার মনে হইল, স্নেহশীলা ভগিনীকে যদি কোন প্রকারে সংবাদ দিতে পারিতেন, সুলোচনা যদি কোন রকমে সংবাদ পাইত, তাহা হইলে তাহারা কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন? কিন্তু কে তাঁহাদিগকে সংবাদ দিবে? মনোরমার নিকট এ কথা বলিতে তাঁহার সাহস হইল না, আর মনোরমাও তাঁহার কোন কথা গ্রাহ্য করিত না। রোগ-যন্ত্রণার উপর দারুণ অনুতাপানলে তিনি অহর্নিশ দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, এত দিনে তাঁহার পাপের শাস্তি আরম্ভ হইল।

সাধ্বী স্ত্রীর নিদারুণ মনস্তাপ, তাহার ফলে তাঁহার ভাগ্যে জীবন্তে নরকভোগ!

মলমূত্র ত্যাগ করিবার জন্য সুরেশ বাবু আর উঠিতে পারিলেন না। মনোরমা তাঁহাকে বাহিরের দালানে একটা পরিত্যক্ত শয্যা রচনা করিয়া তাহাতে শয়ন করাইয়া রাখিল। সেখানে সুরেশ দিবারাত্রির অধিকাংশ ভাগই একা পড়িয়া থাকিতেন। উৎকট ব্যাধির দুঃসহ যাতনায় অধীর হইয়া তিনি কেবল জগদীশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। একদিন পিপাসায় অধীর হইয়া তিনি মনোরমাকে ডাকিলেন। একবার ডাকিলেন, কোন উত্তর পাইলেন না; দুইবার ডাকিলেন, তাহাতেও কোন উত্তর নাই; তখন পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার অধিক জোরে কথা কহিবারও সামর্থ্য ছিল না। মনোরমা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহার নিকট আসিল, তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া বলিল, "কেন একশবার ডাক? তুমি ত বড় জ্বালাতন আরম্ভ কল্লে!" মনোরমা চাকরকে ডাকিয়া জল দিতে বলিল।

আজ সুরেশ বাবুর বড় রাগ হইল; ক্ষীণকণ্ঠে সেই হৃদয়হীনা স্বৈরিণীকে বলিলেন, "রাক্ষসি! তো হতেই আজ আমার এই দুর্দ্দশা, আর ভুলেও তুই আমায় একবার চোখ দিয়েও দেখিস্ না?"

মনোরমাও সেইরূপ রাগভরে তাঁহাকে বলিল, "পোড়ারমুখো মিন্‌ষে,—অত মদ গিলে ম'লে কেন? রামকানাই বাবু বল্লেন, অতিরিক্ত মদ গিলেই ত এই অসুখ হলো।"

আজ আর মনোরমা সুরেশ বাবুর সেই প্রেমবিহ্বলা কণ্ঠলগ্না প্রণয়িনী নয়। পৈশাচিক উপাদানে তাহার চিত্ত গঠিত, বাহিত

লক্ষণ দ্বারা কেবল কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সে সুরেশ বাবুর আরাধনা করিয়াছিল, উচ্ছৃঙ্খল যৌবনে কেবলমাত্র রিপুর পরবশ হইয়া সুরেশও তাহাকে কণ্ঠহার করিয়াছিলেন। লালসাগ্নিতে পূর্ণাহুতি প্রদান করিতে পাপীয়সী যে দিন অন্য লোক পাইল, সেই দিন হইতেই সুরেশ বাবুকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল। এখন সেই ঘৃণা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইল।

সুরেশ বাবু মনোরমার কথা শুনিয়া বিকৃতমুখে বলিলেন, "খেতে শিখেছি, তোর জন্যে। কে আমায় মদ খাবার জন্যে উত্তেজিত করেছিল? পাপীয়সি, তুই! তোর মনস্তুষ্টির জন্যই আমি মাতাল হয়েছিলাম। তুই-ই আমার যত অনিষ্টের মূল।"

মনো। ফের যদি আমাকে কোন কথা বল্‌বি, আমি তোকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেব। আমারই খাবে, আর আমাকেই যাচ্ছে-তাই বল্‌বে! মরতে বসেছে, তবু গুমর ছাড়্‌বে না।

মনোরমার এই কথা শুনিয়া সুরেশ বাবুর বড় ভয় হইল। এত দিনে তিনি বুঝিতে পারিলেন, মনোরমার অসাধ্য কর্ম্ম এ পৃথিবীতে কিছুই নাই। যদি প্রকৃতই তাহাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দেয়, তখন কোথায় আশ্রয় পাইবেন? জীবনের শেষ-মুহূর্ত্তে রাস্তায় পড়িয়া প্রাণ হারাইবেন? সুরেশ বাবু আবার ভাবিলেন, তাহাই উচিত। এরূপ গুরুতর শাস্তিই তাঁহার উপযুক্ত। আত্মগ্লানি তাঁহাকে বিষধর সর্পের মত দংশন করিতে লাগিল। কি করিলাম, কেন এমন করিলাম? এ কথার উত্তর দিতে কেহ নাই। পতিপরায়ণা সতী-লক্ষ্মীর মস্তকের উপর বিনা দোষে কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়াছেন।

তাঁহার মনস্তাপ ভগবানের চরণে পৌঁছিয়াছে। সুরেশের সে পাপের অতি ভয়ানক পরিণাম। তাঁহাকে রক্ষা করিতে কেহ নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে সুরেশ বাবু সকলই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই।

এ সংসারে সহস্র দিকে সহস্র প্রলোভন। চিত্তবৃত্তি নিরোধ করাই পুরুষত্ব। প্রবৃত্তির অধোগতি হ'তে পারে, কিন্তু সেই প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করাই পুরুষত্ব। সুরেশ বাবু এ কথা পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই; বুঝিলে তাঁহার আজ এমন দশা কখনই হ'ত না।

ব্যভিচারিণীর অসাধ্য কর্ম্ম এ জগতে কিছুই নাই। তাই সুরেশ বাবু মনোরমাকে কাতরভাবে বলিলেন, "মনোরমা! আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে? এ কথা বল্‌তে তোমার একটুও লজ্জা হলো না? তোমার জন্য কি না করেছি? অনুগত স্ত্রী—সে আমা বই আর জানে না, তাকে ত্যাগ করেছি, তোমার কুহকে অসতী অপবাদে বিনা কারণে তার কলঙ্ক-রটনা করেছি; স্নেহের ভাই-বোন, একবার তাদের তত্ত্ব নিই না। সোনার সংসার ভাসিয়ে দিয়েছি। আজ আমি শয্যাগত হয়ে পড়েছি, তুমি একবার চোখ দিয়েও দেখ না। —দেখা দূরে থাক্, এত অশ্রদ্ধা কর যে, মানুষে মানুষের প্রতি এরূপ কর্‌'তে পারে না। মনে ক'রে দেখ, একদিন তুমি আমার কত আরাধনা করেছ, এখন তার পরিবর্ত্তে তুমি কি দুর্ব্ব্যবহারই না কচ্চ! মনোরমা! মনে স্থির জেনো, তোমারও একদিন আস্‌বে; পাপের শাস্তি অবশ্য ভোগ কর্‌তে হবে।"

মনো। তুমি আমাকে শাপ দিচ্ছো?

সুরেশ। শাপ দিতে হয় না। আমার কর্ম্মফল আমি ভুগ্‌ছি,

তোমার কর্ম্মফল তোমাকে অবশ্যই ভুগ্‌তে হবে। আমার এই শেষদশা। কারণ, আর বেশীদিন আমায় বাঁচ্‌তে হবে না। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে যায়, একটু জল দেও না। আজ পাঁচ ছয় দিন হ'ল, আমি আর উঠ্‌তে পারি না, তোমার বামুন ঠাকুর আমায় কেবল একটু ক'রে জলসাবু ক'রে দিয়ে যায়, নুণ দিয়ে দিয়ে আমি তাই খাই। একটু দুধ কি এক পয়সার মিছরি পর্য্যন্তও আমাকে কিনে দেও না। মনোরমা! আমি আর বেশী দিন বাঁচ্‌বো না। আমায় একটু পরিষ্কার ক'রে দেও, একটু যত্ন কর! এ বিছানায় আর আমি থাক্‌তে পারি না। আগে ব'সে ব'সে বাইরে গিয়ে নর্দ্দামার কাছে মলমূত্র ত্যাগ কত্তেম; কাল থেকে আর উঠ্‌তেও পাচ্ছি না। তোমায় নিজেকে পরিষ্কার কর্‌তে হবে না, কাউকে কিছু পয়সা দিয়ে আমার বিছানাটা পরিষ্কার ক'রে দেও। আমি আর এমন অবস্থায় থাক্‌তে পারিনে।"

সুরেশ বাবুর একেবারে গলা শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে মনোরমাকে বলিলেন, "কৈ, তোমার চাকর জল নিয়ে এলো না? আমার গলা যে একেবারে শুকিয়ে গেছে, আর ত আমি কথা কইতে পাচ্ছিনে।"

মনোরমা অনুগ্রহ করিয়া আর একবার চাকরকে ডাকিল। কিছুক্ষণ পরে চাকর জল লইয়া আসিল। সুরেশ বাবু জলপান করিয়া, একটু সুস্থ হইয়া, মনোরমাকে পুনরায় বলিলেন, "আমার কথা শুনেছ মনোরমা?"

মনো। শুন্‌লে হবে কি? কে তোমার ঐ গু মুত কাচ্‌বে বল দেখি?

সুরেশ। কেউ নাই? আমার এই অসময়ে কেউ নাই? তবে কি এই ভাবেই আমার মৃত্যু হবে? বেশী দিন নাই,—মনোরমা! আর বেশী দিন নাই। দোহাই তোমার,—আমাকে একটু পরিষ্কার ক'রে দাও। তুমিই না হয় দেও না,—তোমার জন্য আমি অনেক করেছি,আমার এই শেষ-কাল,—আমার একটু কাজ কর।

মনোরমা নাসিকায় কাপড় দিয়া বলিল, "তোমার গু-মুত ঘাঁট্‌বো আমি? নিজের ভাতারের হ'লেও কর্‌তুম না।"

সুরেশ। উঃ!—এমন লোকও পৃথিবীতে থাকে! তুমি না একদিন আমার গলা ধ'রে বলেছিলে তোমায় আমি বড় ভালবাসি, তোমার জন্য মর্‌তে পারি? সেই তুমি—মনোরমা, তুমি কি সেই?

মনো। না—আমি আর একজন। কি আশ্চর্য্য! আমাকে তোমার গু ঘাঁট্‌তে হবে?

এমন সময় রামকানাই বাবু সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। পকেট হইতে সুগন্ধি রুমাল বাহির করিয়া, নাসিকাগ্রে স্পর্শ করিয়া, বিকৃত-মুখে বলিলেন, "কি দুর্গন্ধই বেরিয়েছে এ দুর্গন্ধে কি ঘরে টেঁকা যায়?"

মনো। ওগো! আস্পর্দ্ধার কথা শুনেছ? আমাকে বল্‌ছে ওর গু ঘাঁট্‌তে।

রাম। এ দুর্গন্ধের কাছে বেশীক্ষণ থাক্‌লে কি এখানে অনেকখার এলে তোমার ব্যায়রাম হবে মনি!

মনো। কি করি বল দেখি, বড় মুস্কিলে পড়্‌লুম।

রাম। এর সাম্‌নেই তোমার শোবার ঘর। তোমার নিজের কোন অসুখ না হ'লে বাঁচি।

মনো। তাই ত ভাই, কি করা যায়? সত্যিই ত, এ দুর্গন্ধে আর টেঁকা যায় না।

রামকানাই বাবু বলিলেন, "আমার মতে ঐ সিঁড়ির ঘরের পাশে ঐ কোণের ঘরটায় সুরেশের একটা বিছানা ক'রে দেও, ও দিকে বড় একটা কেউ যায় না।"

মনোরমাও সেই যুক্তির অনুমোদন করিল। কিন্তু কে সুরেশচন্দ্রকে তুলিয়া লইয়া যায়? তিনি নিজে ত আর উঠিতে পারেন না। মনোরমার তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও ঘৃণা হয়, তখন দুই জন চাকরকে ডাকা হইল।

সুরেশ বাবু ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। এইবার বুঝি টানা-টানিতে তাঁহার প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। তাই মনোরমাকে বড় কাতর হইয়া বলিলেন, "মনোরমা! আমাকে তুলো না। টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেলে আমার প্রাণটা একেবারে বেরিয়ে যাবে। দোহাই তোমার—আমাকে তুলো না।"

মনোরমা রামকানাই বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি করা যায়?"

রাম। কি করবে? এ রকম দুর্গন্ধে থাকলে সকলেরই অসুখ হবে।

সুরেশ। রামকানাই,—তুমি না আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড? তোমার ব্যবহার আমি অনেক দিন বুঝতে পেরেছি। আমি এ যাবৎ অন্ধকারে ছিলুম, তুমি আমার প্রতি এতটা নির্দ্দয় হয়ো না।

সুরেশ বাবুর কাতরতায় কেহই কর্ণপাত করিল না। দুই জন ভৃত্য আসিল, একজন সুরেশের মাথা ধরিল আর

একজন তাঁহার পা ধরিয়া তুলিল। যন্ত্রণায় তিনি পরিত্রাহি চীৎকার করিলেন; কিন্তু পাষাণহৃদয় মনোরমা কিংবা পিশাচ-প্রকৃতি রামকানাই সে কাতরতায় কর্ণপাত করিল না।

যখন ভৃত্যদ্বয় সুরেশকে নির্দ্দিষ্ট গৃহে লইয়া উপস্থিত হইল, তখন তিনি একেবারে নির্জীব হইয়া পড়িলেন। ভৃত্যদের অন্তঃ-করণেও দয়া আছে; তাহারা একটু জল লইয়া তাঁহার মুখে দিল, একজন পাখা লইয়া একটু বাতাস করিল। কতক্ষণ পরে সুরেশ একটু সুস্থ হইলেন। ভৃত্যেরা আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না। মনোরমার ডাক পড়িয়াছে।

মনোরমা রামকানাই বাবুর হাত ধরিয়া, নিজের গৃহে লইয়া গেল। সেখানে শয্যার উপর দুই জনে পাশাপাশি বসিল। মনোরমা একটু বিমর্ষভাবে রামকানাইকে বলিল, "বড় মুস্কিলে পড়লুম ত কানাই!"

রাম। মুস্কিল আর কি?

মনো। মুস্কিল নয়? সমস্তটা দিন কেবল চেঁচাচ্ছে আর আমায় ডাকছে। কাঁহাতক্ ওর খেজমৎ খাটা যায় বল দেখি? তুমি ত এখানে সমস্ত দিন থাকো না, একদণ্ড এসেছ, তাই দেখ, আমার কি জ্বালা। আপদ্ এখন শীগ্গির শীগ্গির গেলেই বাঁচি, আপনিও ভুগছে আর আমাকেও ভোগাচ্ছে।

রাম। তা সত্যি—তোমাকে বড়ই ভোগালে।

মনো। একটু সোয়াস্তি নেই। দুপুরবেলা শুলুম, আর ডাকতে আরম্ভ কল্লে। একটু চোখ বোজ্‌বারও যো নেই।

রাম। যে ক'দিন ভোগ—আর কি ক'র্‌বে বল। তবে আর বেশী দিন নয়। ক্ষয়কাস রোগ, ভাল ত কিছুতেই হবে না।

মনো। থাক্ গে ভাই, আর ও সব কথায় কাজ নেই। বোতলটা নিয়ে এসো, একটু খাই; আজ আমার মনটা বড়ই খারাপ।

রামকানাই বাবু গেলাস পূর্ণ করিয়া মনোরমার হস্তে দিলেন। মনোরমা তাহা তৃপ্তির সহিত পান করিল। সুরার মাদকতা-শক্তির সহিত তাঁহাদের মনের আনন্দ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। মনোরমা রামকানাই বাবুর গলদেশ দুই হস্তে বেষ্টন করিয়া বলিল, "কানু! তুমি ত আমায় ভালবাস?"

রামকানাই মনোরমার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "তোমার মত সুন্দরীকে কে না ভালবাসে? কিন্তু সুরেশ তোমার উপযুক্ত নয়, এ কথা আমি তোমায় অনেক দিন আগে বলেছি। এ যেন বানরের গলায় মুক্তার হার প'ড়েছিল।

মনো। ভুল ক'রেছিলাম কানু,—আমি গোড়ায় অত বুঝ্‌তে পারিনি যে, রাস্কেল অতি অরসিক। কিন্তু তাও বলি, ওর সঙ্গে যদি বেরিয়ে না আস্‌তুম্, তা হ'লে ত আমি তোমায় পেতুম না।

উভয়ে সুকোমল শয্যার উপর অঙ্গ ঢালিয়া, সুখের সপ্তসমুদ্রে ভাসমান হইয়া বিভোর —আর ও দিকে সুরেশ বাবু একাকী একটা শুষ্ক মাদুরের উপর পড়িয়া, রোগের যন্ত্রণায় পরিত্রাহি ডাকিতে লাগিলেন। হায় বিধাতা! তোমার কি বিচার নাই?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতঃকালে সদানন্দ ও হরেন্দ্রকুমার বিদায় লইবার জন্য গৃহস্থের অনুমতি চাহিলেন; কিন্তু মায়ার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সে দিন সেখানে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইলেন।

কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া এই নবীন সন্ন্যাসিদ্বয়কে দেখিতে গ্রামের অনেক লোকই আসিল। অনেকেই তাঁহাদিগকে সে গ্রামে, বিশেষতঃ সুরেশ বাবুর বাটীতে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহারা উত্তরে মাত্র তাহাদিগকে বলিলেন, কোন কারণ বশতঃ তাঁহারা সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। সুরেশ বাবুর বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র, আর কোন কারণ নাই। কেহ কেহ সে উত্তরে পরিতৃপ্ত হইল, কেহ বা তাঁহাদিগকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল।

মধ্যাহ্নে আহারাদি শেষ করিয়া দুই বন্ধুতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং শাস্ত্রালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে ভজহরি সেখানে উপস্থিত হইল। ভজহরি জ্যোতিষচন্দ্রকে ডাকিয়া সুরেশ বাবুর বর্ত্তমান অবস্থার কথা, তাঁহার প্রতি মনোরমার ব্যবহার সমস্ত জানাইল; আরও বলিল, যদি তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ের প্রতীকার না করেন, তাহা হইলে সুরেশকে আর অধিক দিন সংসারে থাকিতে হইবে না। ভজহরিকে বোধ হয় পাঠকগণের মনে আছে, যেরূপ সময়ে সে আপনাদের নিকট

পরিচিত হইয়াছে, তাহাতে সজ্জন লোকে কখন তাহার কথা ভুলিতে পারেন না। ভজহরি কোন কর্ম্ম উপলক্ষে দিন কতকের জন্য বিদেশে গিয়াছিল; বাটী আসিয়া সুরেশ বাবুর অসুখের সংবাদ ও তাঁহার প্রতি মনোরমার ব্যবহার নিজের পরিবারবর্গের মুখে শুনিতে পাইয়া উপযাচক হইয়া স্বয়ং একবার সুরেশ বাবুকে দেখিতে যায়; গিয়া তাঁহাকে যে অবস্থায় দেখিতে পাই, তাহাতে তাহার পরদুঃখকাতর অন্তরে বড় ব্যথা বাজিল। সে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া সুরেশ বাবুর বাটীতে সংবাদ দিতে আসিল। ভজহরির কথা শুনিয়া জ্যোতিষচন্দ্রের প্রাণটা আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। কি করা উচিত? বাটীর মধ্যে এ কথা প্রচার করিলে সকলে কাঁদিয়া আকুল হইবে। কিন্তু সংবাদ না দিয়াই বা কি করিবেন? এত বড় গুরুতর কথা কিছুতেই গোপন করিতে পারেন না। তিনি বালক, তাঁহার ভগিনীকে না বলিয়া এ সম্বন্ধে কোনরূপ প্রতীকার করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; সুতরাং জ্যোতিষচন্দ্র বাটীর মধ্যে যাইয়া ভগিনীকে নিভৃতে ডাকিয়া তাঁহার নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধিমতী মায়া জ্যোতিষকে সুলোচনার নিকট এ কথা এখন প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া সদানন্দঠাকুরকে একবার বাটীর মধ্যে ডাকিয়া দিতে বলিলেন। ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া জ্যোতিষ বাটীর মধ্যে আসিলেন। মায়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি বড় বিপদে পড়েছি, আপনি দৈব-প্রেরিত হয়ে এখানে এসেছেন। আপনি এ বিপদ্ থেকে আমাকে উদ্ধার করুন।"

মায়ার সমস্ত কথা শুনিয়া, সদানন্দ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া

বলিলেন, "মা, তুমি চিন্তা করো না। আমার দ্বারা যত দূর সম্ভব, তাহা হইবে। তাঁহাকে এখানে পাল্কী ক'রে নিয়ে আসাই সঙ্গত। কারণ, সেখানে তোমরা গিয়ে ত তাঁর সেবা ও শুশ্রূষা করতে পারবে না।"

মায়া। তাই আনুন বাবা! তাঁকে এখানে আন্‌তে পার্‌লে আমরা তাঁকে বাঁচাতে পারব। রাক্ষসীর হাত থেকে একবার উদ্ধার করতে পারলে তাঁকে রক্ষা করতে পারবো। বাবা, আমাদের সমস্ত সংসারের প্রাণ তিনি, আপনাকে আর অধিক কি বলব।"

সদানন্দ আর কালবিলম্ব করিলেন না। হরেন্দ্রকুমারকে সঙ্গে লইয়া তিনি একেবারে একখানা পাল্কী সঙ্গে করিয়া মনোরমার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মনোরমা সে সময় তাহার খাস-কামরায় বসিয়া তাহার দ্বিতীয় প্রণয়পাত্র রামকানাই বাবুর সহিত রহস্যালাপে নিযুক্ত ছিল। সদানন্দ কাহারও অনুমতি না লইয়া এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া একেবারে দ্বিতলোপরি মনোরমার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। হরেন্দ্রকুমার ও অন্য লোক সকল বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সদানন্দ মনোরমার সম্মুখে দাঁড়াইলে মনোরমা তাঁহার সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। সদানন্দ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোরমা, চিনিতে পার কি?"

মনোরমা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইয়াছিল; এতক্ষণে তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিল। তাঁহাকে দেখিয়া তাহার প্রাণের মধ্যে একটু ভয় হইল। তাঁহার

মনোরমাকে নিরুত্তর দেখিয়া সদানন্দ পুনরায় তাহাকে বলিলেন, "মনোরমা, আমাকে কি তুমি চিন্‌তে পার্‌লে না? আমি সদানন্দ, তোমার পিতার সভাপণ্ডিত ছিলাম।"

মনোরমা তখন তাঁহাকে বসিতে বলিলেন এবং তাঁহার বসিবার জন্য আসন আনিবার জন্য চাকরকে ডাকিলেন। সদানন্দ বাধা দিয়া বলিলেন, "তোমার এখানে বস্‌তে আসিনি। যে কাজের জন্য এসেছি, তাই তোমায় বল্‌ছি। সুরেশ ডাক্তার কোথায়?"

মনো। তাঁর বড় ব্যায়রাম।

সদা। তা আমি জানি। এখন তিনি কোথায় আছেন, আমাকে দেখিয়ে দাও।

মনো। তাঁর সঙ্গে আপনার কি কাজ?

সদা। সে কথা পরে বল্‌ব। এখন তিনি কোথায় আছেন, তাই বল।

মনোরমা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যেখানে সুরেশ বাবু আছেন, সেইখানে লইয়া গেল। সুরেশ বাবুর অবস্থা দেখিয়া সদানন্দের প্রাণে বড়ই কষ্ট হইল। তাই মনোরমাকে বলিলেন, "মনোরমা, এক সময়ে এই ব্যক্তি তোমার সকল অপেক্ষা প্রিয়-বস্তু ছিল, তাই একে এইরূপ যত্নে রেখেছ। ছি, তুমি কি মানুষ!"

সেই এক 'ছি'তে মনোরমার সেই কঠোর হৃদয় যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। সে তাঁর কথায় আর কোন উত্তর করিতে পারিল না।

সদানন্দ সুরেশ বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার ভগিনী আপনার অসুখের সংবাদ পেয়ে আপনাকে বাটী নিয়ে

যাবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন। আমাকে সেই জন্যই পাঠিয়েছেন, আপনার যেতে ত কোন আপত্তি নাই?"

সুরেশ বাবুর চক্ষু দিয়া জল পড়িল। কাতরস্বরে তিনি বলিলেন, "আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি।"

সদা। তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি।

সুরেশ। আমি তাদের কাছে বড় অপরাধ করেছি। আমার মুখ দেখাতে লজ্জা হয়।

সদা। সেটা আপনার বিষম ভ্রম। আপনি সহস্র দোষে দোষী হইতে পারেন, তবুও আপনার ভগিনীর স্নেহ হ'তে বঞ্চিত হবেন না। আর আপনার স্ত্রীর ভালবাসা আপনার উপর সমভাবেই আছে। আপনি বাটী চলুন, এখানে থাক্‌লে আপনি আরোগ্যলাভ কত্তে পার্‌বেন না।

সুরেশ। আমি উঠ্‌তে পারিনি, যাব কি ক'রে?

সদা। সে বন্দোবস্ত আমি করেছি, আপনার কোন কষ্ট হবে না।

সুরেশ। তবে আমাকে নিয়ে চলুন।

সদানন্দ বাহিরে গেলেন; অল্পক্ষণের মধ্যেই হরেন্দ্রকুমারকে সঙ্গে লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। মনোরমাকে দেখিয়া হরেন্দ্রের রাগে আপাদ-মস্তক কাঁপিতে লাগিল। সদানন্দ তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বলিলেন "এ সময় তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া শোভা পায় না হরেন। এখনকার যা কাজ, তাই কর।"

হরেন্দ্র। কি কর্‌ব, বলুন।

সদা। ইনি যে অবস্থায় আছেন, এ অবস্থায় পাল্কীতে তোলা উচিত হয় না। আগে এঁকে পরিষ্কার ক'রে দেও।

তখন দুই বন্ধুতে মিলিয়া সুরেশ বাবুর মল-মূত্র অবিকৃত-চিত্তে পরিষ্কার করিলেন। সদানন্দ মনোরমার নিকট একখানি পরিষ্কার কাপড় চাহিলেন। মনোরমা বাধ্য হইয়া একখানি ধৌত বস্ত্র বাহির করিয়া দিল। সদানন্দ সুরেশ বাবুকে সেই বস্ত্র পরাইয়া দিলেন। তাহার পর সকলে মিলিয়া সন্তর্পণে ধীরে ধীরে তাঁহাকে নীচে নামাইলেন এবং পাল্কীতে তুলিলেন।

পাল্কী চলিয়া গেলে হরেন্দ্রকুমার সদানন্দকে বলিলেন, "দাদা, আপনি আগে যান, আমার একটু দেরী হবে।"

সদা। লাভ কি হরেন? মনোরমাকে অনুযোগ ক'রে এখন আর ফল কি? তার শাস্তি বিধাতা দিবেন।

হরেন্দ্র। তা হোক্। আমি তাকে দু একটা কথা ব'লে আস্‌ব।

হরেন্দ্রকুমার আর কথা না কহিয়া একেবারে মনোরমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে পুনরায় আসিতে দেখিয়া মনোরমার বড়ই ভয় হইল। তাই সে চাকরকে ডাকিতে লাগিল।

হরেন্দ্র তাহার ভাব দেখিয়া বলিলেন, "ভয় নেই মনোরমা, আমি তোমাকে মার্‌ব না। আমি মার্‌বার কেউ নই। তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী, আমি তোমার স্বামী। তোমাকে কেবল আদর কর্‌তেই জানি। তাই আজ সেই আদর দেখাতে এসেছি, মনোরমা, তুমি সুখে আছ ত?"

মনো। এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রে তোমার লাভ কি?

হরেন্দ্র। লাভ আছে। তোমার সবতাতেই আমার লাভ আছে। তুমি যখন আমার ধর্ম্ম-পত্নী হয়ে আমার কুলে কালি

দিয়ে এসেছ, তাতে আমার লাভ আছে, আর তুমি সুখে আছ দেখ্‌লে লাভ হবে না? মনোরমা, তোমার সবতাতেই আমার লাভ আছে। এখন বল দেখি, তুমি সুখে আছ ত?

মনো। আমি তা বল্‌তে পারি না।

হরেন্দ্র। বল্‌বে—বল্‌বে। আর বেশী দিন নয়। সত্বরই বল্‌বে। সত্বরেই দেখ্‌তে পাবে—কেমন সুখ। আমি এ কথা তোমায় ঠিক বল্লুম। যদি আমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ-সন্তান হই, আর আমার শরীরে ব্রাহ্মণের রক্ত থাকে, তা হ'লে আমি বল্‌ছি, তুমি অতি শীঘ্রই দেখ্‌তে পাবে, কেমন সুখ। দেখ্‌তে পাবে না?—ঠিক দেখ্‌তে পাবে। এখনও চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় হয়, দিনের পর রাত্রি হয় পূর্ণিমার পর অমাবস্যা আসে। নিশ্চয়ই দেখ্‌তে পাবে। তোমার পিতা তোমার স্নেহে অন্ধ হয়ে কর্ত্তব্যজ্ঞান-রহিত হয়েছিলেন, তোমার জন্য আজ তাঁর চক্ষু দিয়ে সহস্র ধারা পড়্‌ছে, তাঁর উন্নত মস্তক অবনত হয়েছে, গর্ব্বিত হৃদয় একেবারে ভেঙ্গে গেছে। তোমার পিসীমা তোমাকে মার মত যত্ন ক'রে মানুষ করেছিলেন। তিনি তোমার অনেক গু-মূত ঘেঁটেছেন, এখন তার কেমন প্রতিফল দিলে! আর তুমি দেখ্‌তে পাবে না—কেমন সুখ? ঠিক দেখ্‌তে পাবে মনোরমা, তুমি ঠিক দেখ্‌তে পাবে। বেশী দিন নেই আর, খুব সত্বরেই দেখ্‌তে পাবে। যে দিন থেকে অগ্নিস্পর্শ ক'রে ব্রাহ্মণ-সন্তান তোমাকে ধর্ম্মপত্নী ব'লে স্বীকার করেছে, সেই দিন থেকে এখন পর্য্যন্ত সে তোমার প্রতি কামনা ক'রে আস্‌ছে, আর তোমার দুর্ব্যবহারে অভিশপ্ত জীবের মত প্রাণের যাতনায় সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তুমি দেখ্‌তে পাবে না? কেমন সুখ—ঠিক দেখ্‌তে পাবে!

মনোরমার সর্ব্বশরীর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। প্রাণের মধ্যে সে কেমন একটা আকুলতা অনুভব করিল। সে অস্থির হইয়া বসিয়া পড়িল।

হরেন্দ্র। মনোরমা, ব'সে পড়্লে যে? দেখ দেখ—চেয়ে দেখ, আমার মুখের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখ। বড় কুৎসিত—না? বড় কুৎসিত? ঐ একজন—এই মাত্র যাকে পাল্কী ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'ল—এক দিন সে বড় সুন্দর ছিল। কেমন না—বড় সুন্দর ছিল? তার চক্ষু সুন্দর, মুখ সুন্দর, কথা সুন্দর, সব সুন্দর ছিল। এখন আর সে সুন্দর নাই—কেমন, না? তাই তাকে শুক্নো ফুলের মালার মত টেনে ফেলে দিলে—যেমন উৎসব ফুরিয়ে গেলে লোকে ফেলে দেয়! তাই আবার যাকে সুন্দর দেখ্ছ, তাকে তোমার গলার হার করেছ!

মনো। আমি ত তোমাকে এ সব কথা বল্বার জন্য ডাকিনি।

হরেন্দ্র। ডাকনি, তা জানি। আমিই না হয় উপযাচক হয়ে এসেছি। বড় সখ হ'ল, তাই একবার দেখ্তে এলুম—তোমার কীর্ত্তিধ্বজা কতদূর পর্য্যন্ত উড়্ছে। আমার বাবা টুকটুকে মেয়ে দেখে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন, সেই টুকটুকে মেয়েটি এখন মস্ত বড় হয়েছে, তাই তার কীর্ত্তিধ্বজা আকাশ পর্য্যন্ত উড়্ছে; কেন না, সমস্ত পৃথিবীর লোক দেখ্তে পাবে। মনোরমা, মনে ঠিক জেনো, এ নিশেন যতদূর পর্য্যন্ত উড়্ছে, ততদূর পর্য্যন্ত তোমাকে নাম্তে হবে। বড় মজা, মদ খাচ্ছো, হারমোনিয়ামে গান হচ্ছে, ওস্তাদজী এসে রসাল টপ্পা শিখিয়ে যাচ্ছে, পাশে ব'সে ছোকরা বঁধু গলা ধ'রে বাহবা দিচ্ছে; বড় মজা, কেমন মনোরমা, বড় মজা!

মনো। তোমার কি? আমি আমার বাপের টাকায় কচ্ছি।

হরেন্দ্র। না না, আমার কি? -আমার কি? আমার কিছুই নয়। আমি কেবল দেখ্‌তে এসেছি। মজা দেখ্‌তে এসেছি। আরো মজা দেখ্‌বো—অতি শীগ্‌গিরই দেখ্‌তে পাব। আমার মনে হয়, দু এক বছরের মধ্যেই দেখ্‌তে পাব। তখন এ মেজাজ থাক্‌বে না। সে মজা আর এক রকম বোধ হবে। রাস্তার দাঁড়িয়ে পেটের দায়ে লোকের কাছে হাত পাত্‌তে কেমন মজা, তখন জান্‌তে পার্‌বে।

মনো। অদৃষ্টে যদি তাই থাকে ত হবে।

হরেন্দ্র। এর বেলা অদৃষ্ট মানো? আর যখন তপ্ত-বক্ষের জ্বালা মেটাতে একজন পরপুরুষকে জড়িয়ে ধর, তখন অদৃষ্ট মানো না?

মনো। যা হয় হবে, তোমার তাতে কি?

হরেন্দ্র। আমার তাতে কি, বুঝ্‌তে পার্‌বে। যাক্, আমি আর তোমায় কিছু বল্‌তে চাই না। আমার যা বল্‌বার ছিল, তোমায় বলেছি। তবে আমার শেষ কথা এই শোনো মনোরমা, তুমি মন দিয়ে শোনো। এক দিন যাকে তুমি ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করেছ, যার নাম শুনে তুমি ঘৃণায় কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেছ, তোমার এমন একদিন আস্‌বে—যে দিন তুমি তার চরণ পাবার জন্য লালায়িত হবে। এ কথা ঠিক জেনো মনোরমা। আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, আর মাথার উপর জগদীশ্বর আছেন, এ কথা কখন নিষ্ফল হবে না।

হরেন্দ্রকুমার মনোরমার উত্তর শুনিবার জন্য আর অপেক্ষা করিলেন না। মনোরমার মনের মধ্যে কেমন একটা সন্ত্রাস জন্মিল, সহস্র চেষ্টাতেও তাহা দূর করিতে পারিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সুরেশ বাবুকে আনিতে পাঠাইবার পর মায়া বড় উৎকণ্ঠিত রহিলেন। তাঁহার মনে মনে বড়ই ভয় হইল, যদি মনোরমা তাঁহাকে আসিতে না দেয়। কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুরদের কার্য্য-তৎপরতার উপর তাঁহার একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছিল; কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, মনোরমা তাঁহাদের পরিচিতা এবং হরেন্দ্র-কুমারের বিবাহিতা স্ত্রী।

ননদিনীর বিষণ্ণ মুখ ও জ্যোতিষচন্দ্রের অস্থিরতা দেখিয়া সুলোচনার প্রাণে বড় ভয় হইল। তিনি মায়াকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মায়া তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া, বলিলেন, "বিশেষ কিছুই হয় নাই।" সে সময় তাঁহার নিকট কোন কথা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার এই উত্তর শুনিয়া সুলোচনার মনে হইল, একটা বিষম বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। বিপদ্ নিশ্চয়ই তাঁহার স্বামীকে লইয়া। তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রাণ বড়ই আকুল হইল, প্রাণের মধ্যে কেমন একটা অস্থিরতা আসিল। তিনি কেবল জগদী-শ্বরকে ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে ডাকিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই সুরেশবাবুর পাল্কী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। মায়া 'দাদা' বলিয়া ছুটিয়া পাল্কীর নিকট গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি হৃদয়ের অস্থিরতা গোপন করিতে পারিলেন না। সুলোচনা বাতায়ন-পার্শ্বে স্তব্ধভাবে

দাঁড়াইয়া রহিলেন। ননদিনীর মত পাল্‌কীর নিকট ছুটিয়া যাইতে তাঁহার সাহস হইল না। না জানি, স্বামীকে তিনি কি অবস্থায় দেখিবেন। হে জগদীশ্বর! তুমি রক্ষা কর। তাঁহার প্রাণের মধ্যে আকুল ক্রন্দন উঠিল। হে নারায়ণ, হে বিপদ্ ভঞ্জন মধুসূদন, আমার স্বামীকে রক্ষা কর।

সুরেশ বাবু কিছুক্ষণ পাল্কীর মধ্যেই রহিলেন। তাঁহাকে হঠাৎ পাল্কী হইতে বাহির করিতে কেহ সাহস করিলেন না। মায়া শীঘ্র-হস্তে গৃহমধ্যে তাঁহার জন্য সুকোমল শয্যা প্রস্তুত করিল। অল্পক্ষণ পরেই সদানন্দ ও হরেন্দ্রকুমার সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন সকলে মিলিয়া অতি সন্তর্পণে সুরেশ বাবুকে পাল্কী হইতে বাহির করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। এত সাবধান সত্ত্বেও সুরেশ বাবুর মোহ হইল। সকলে শশব্যস্ত হইয়া অনেক চেষ্টাতে ও যত্নে তাঁহাকে সচেতন করিলেন।

এতক্ষণ পরে সুলোচনা স্বামীর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন; কিন্তু কি দেখিলেন? সে রূপ আর নাই, সে সৌন্দর্য্যের কণামাত্রও শরীরে নাই। যে রূপে মুগ্ধ হইয়া মনোরমা কুলত্যাগিনী হইয়াছে, এখন আর সে রূপের চিহ্নমাত্রও নাই। কঠিন রোগের আক্রমণে এখন সেই নশ্বর দেহ কঙ্কালমাত্রে অবশিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার সেই আয়ত নেত্রের উজ্জ্বল প্রভা আর নাই, এখন তাহা কোটরগত ও নিষ্প্রভ, নেত্রপ্রান্ত কালিমামণ্ডিত। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সুলোচনার প্রাণ শুকাইয়া গেল। তিনি স্বামীর নিকট যাইতে পারিলেন না, কারণ, সেখানে অনেক লোক ছিল; পার্শ্বের গৃহ হইতে স্বামীকে দেখিতে লাগি-

লেন আর তাঁহার অজ্ঞাতসারে চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল।

মায়া জ্যোতিষচন্দ্রকে সে গ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসককে অতি শীঘ্র ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। বলিতে কি, এক এক করিয়া সে দেশের সমস্ত চিকিৎসককে তাঁহারা ডাকিয়া আনিলেন। সুরেশবাবু ইদানীং খরচ দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, কারণ, মনোরমা তাঁহাকে দিতে দিত না। মায়া নিজের ও সুলোচনার অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া সুরেশের চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। মায়ার সহোদর যে তাঁহার প্রাণেরও অধিক, সংসারে আর তাঁহার কে আছে? তিনি মনে করিলেন, সর্ব্বস্ব যাক্, তাতে কোন ক্ষতি নাই, তাঁহার দাদা আরোগ্যলাভ করুন। সুলোচনা মনে করিলেন, তাঁহার প্রাণের বিনিময়ে কি তাঁহার স্বামী রোগমুক্ত হইতে পারেন না?

চিকিৎসার ও শুশ্রূষার কিছুমাত্র ক্রটি হইল না। মায়া সর্ব্বস্ব-বিনিময়ে জেলা হইতে সাহেব ডাক্তার আনাইলেন। পরোপকারী উদার মহৎপ্রাণ সদানন্দ ও হরেন্দ্রকুমার দিবারাত্রি অনন্যকর্ম্মা হইয়া সুরেশের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সুলোচনা অবিকৃত-চিত্তে স্বামীর মলমূত্র পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। আর মায়া পাগলিনীর মত চিকিৎসকের পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন,—"আমার দাদাকে বাঁচাইয়া দিন।"

এক দিন দুই দিন করিয়া প্রায় পনর দিন কাটিয়া গেল। সুরেশচন্দ্রের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। চিকিৎসকে তখন স্পষ্টই বলিলেন, আর ঔষধ খাওয়াইয়া কোন ফল হইবে না। সুরেশ বাবুও নিজে

বুঝিতে পারিলেন, আর অধিক দিন সময় নাই। দুরন্ত ক্ষয়রোগ—এ রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তখন তিনি সমস্ত লোককে ডাকিয়া বলিলেন, "আর আমার অধিক সময় নাই।" সদানন্দ ঠাকুরকে ডাকিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন। তিনি জীবনে যে পাপকার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার যেন সে পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়। আর উদার-হৃদয় হরেন্দ্রকুমারকে বলিলেন, "আপনার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবারও আমার অধিকার নাই। আপনার প্রতি আমি যে দুর্ব্যবহার করিয়াছি, তাহার ক্ষমা নাই। কিন্তু আপনার অতি মহৎ অন্তঃকরণ, সেই জন্য ভরসা করিয়া বলিতেছি, আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আপনি যদি প্রসন্ন-অন্তঃকরণে আমায় ক্ষমা করেন, তাহা হইলে আমার অন্তরের ভার অনেকটা লাঘব হয়। জগদীশ্বরের কৃপায় আমার এই অন্তকালে আপনি আমার নিকট উপস্থিত, আপনার চরণধূলি দিন, আর আমার মার্জ্জনা করুন।" হরেন্দ্রকুমার কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার পরদুঃখকাতর অন্তরে সুরেশচন্দ্রের এই কাতরোক্তিতে বড় ব্যথা বাজিল। যে তাঁহার স্ত্রীর উপপতি, যাহার জন্য তাঁহার সহধর্ম্মিণী কুলত্যাগিনী, তাহার প্রতি তিনি যে ব্যবহার করিলেন, তাহাতে গৌরবের সহিত বলা যায় তাঁহার তুল্য উচ্চহৃদয় মনুষ্য সংসারে বিরল। রক্তমাংসগঠিত প্রত্যেক লোকই তাহার স্ত্রীর উপপতিকে সম্মুখে দেখিলে ধৈর্য্যচ্যুত হয়, কিন্তু হরেন্দ্রকুমার সুরেশচন্দ্রের মল-মূত্র পর্য্যন্তও অবিকৃত-চিত্তে পরিষ্কার করিয়াছেন। এ সংসারে অনেকেই প্রতিহিংসাপরায়ণ; কিন্তু ক্ষমা

কয়জনের আছে? হরেন্দ্রকুমার সুরেশচন্দ্রকে সরল-হৃদয়ে ক্ষমা করিলেন।

মায়া চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। চিকিৎসকগণের হতাশ্বাসে এবং ভ্রাতার কাতর-উক্তিতে তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল, দুর্ভর নিরাশায় তাঁহার অন্তর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার যে দাদা বলিবার আর কেউ নাই! বালবিধবার সংসারে অবলম্বন মাত্র দুইটি ভাই। তাঁহারা সংসারের সারবস্তু—তাঁহার সর্ব্বস্বধন। তিনি কি করিবেন, কি করিলে তাঁহার ভ্রাতার জীবনরক্ষা হয়? যখন সাহেব ডাক্তার চলিয়া যাইলেন, সেই সময় উন্মাদিনীর মত মায়া ডাক্তার সাহেবের পায়ে ধরিলেন, তাঁহার চরণে উষ্ণ অশ্রুজল পতিত হইল। ডাক্তার সাহেবও সেই দৃশ্য দেখিয়া চক্ষে রুমাল দিলেন।

আর সুলোচনা, কোথায় তিনি? সেই গৃহের একপ্রান্তে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন। যে দিন তিনি স্বামীর কঙ্কালসার দেহ চক্ষে দেখিয়াছেন, সেই দিনেই যেন সহস্র বজ্রাঘাতে তাঁহার হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। তিনি মনে করিলেন, সাবিত্রী যেমন সত্যবানকে ধর্ম্মের হাত থেকে ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, তিনি কি তাহা পাইবেন। সীতার পুণ্যে রঘুকুলচূড়ামণি রামচন্দ্র যেমন রাক্ষসগণের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহার পুণ্যে তাঁহার স্বামী কি রোগমুক্ত হইতে পারেন না? কিন্তু তাঁহার সে পুণ্য কোথায়? একদিনের জন্যও তিনি মনে মনে স্বামীকে অশ্রদ্ধা করিয়াছিলেন, স্বামীর অত্যাচার স্মরণ করিয়া, তিনি গঙ্গায় আত্মবিসর্জ্জন করিতে গিয়াছিলেন। আজ সেই কথা তাঁহার মনে পড়িল, তাঁহার প্রাণে আরও ব্যথা জন্মিল।

ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই গৃহের বাহিরে যাইলেন। কেবল মায়া আর সুলোচনা সেই গৃহে রহিলেন। সুরেশ বাবু সুলোচনাকে একবার তাঁহার নিকটে বসিতে বলিলেন। মায়া একবার বাহিরে যাইলেন।

সুলোচনাকে সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া সুরেশ বাবুর চক্ষে জল পড়িল। কিছুক্ষণ তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "সুলোচনা, আমার এই শেষ সময়, আমায় কি তুমি ক্ষমা করিবে? তোমার প্রতি আমি বড় অত্যাচার করেছি; কিন্তু তোমার পুণ্যে যেন আমি পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি। তুমি আমায় মার্জ্জনা কর।"

সুলোচনার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি স্বামীর চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি কথা কহিতে পারিলেন না, হৃদয়ের আকুলতায় তাঁহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল।

সুরেশ বাবু আবার বলিলেন,"সুলোচনা,সংসার কোন কালেই কর্‌তে পার্‌লুম না। এখন তাই ভাবি,মরণকালে তাই ভাব্‌ছি।" তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। সুলোচনা দেখিতে পাইলেন, তাঁহার হৃদয়ের অস্থি সকল যেন স্থানভ্রষ্ট হইয়া গেল।

সুলোচনা বুঝিতে পারিলেন, ইহ-জীবনের সহিত তাঁহার স্বামীর সকল সম্বন্ধ ফুরাইয়া যায়। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। আকুল-ক্রন্দনে স্বামীর চরণতল সিক্ত করিলেন। এই পৃথিবীতে আসিয়া তাঁহার কোন সাধই পূর্ণ হয় নাই। অতি অল্পবয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, বিবাহের পর হইতে স্বামী ভিন্ন তিনি আর কিছুই জানিতেন না। তাঁহার অপরিমিত ভালবাসা, অগাধ প্রেম, তাহা সমুদ্রের মত গম্ভীর—পর্ব্বতের মত মহান্।

সমস্তই তাঁহার হৃদয়ে সঞ্চিত রহিয়াছে, দুর্ভাগ্য সুরেশচন্দ্র তাহা ভোগ করিতে পারিলেন না। সুলোচনার হৃদয়ের তৃপ্তি, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা,চক্ষের জ্যোতি, অঙ্গের লাবণ্য—সমস্তই তাঁহার স্বামী। যেখানে যে দেবতা দেখিয়াছেন, যে ব্রত-পূজা করিয়াছেন, সমস্তই তাঁহার স্বামীর কল্যাণ-কামনায়। তাঁহার বুকভরা আশা, কল্পনা বহুদূর-বিস্তৃত, সমস্তই যে শূন্যমার্গে বিলীন হইয়া যায়!

সুরেশ বাবু সান্ত্বনাবাক্যে সুলোচনাকে বলিলেন, "কেঁদো না সুলোচনা! আর একটু এগিয়ে এসো, আমি তোমাকে একবার ভাল ক'রে দেখি। অনেক দিন তোমার মুখখানি দেখ্‌তে পাইনি, এখন একবার ভাল ক'রে দেখি। একদিন আমার কত যত্নের ধন ছিলে তুমি, আর ইদানীং তোমায় কি অযত্নই না করেছি! সুলোচনা! আমার বুক্‌টায় একটু হাত বুলিয়ে দাও।"

সুলোচনা স্বামীর বক্ষে হাত বুলাইতে লাগিলেন। সুরেশ বাবু বলিলেন, "আঃ! কি তৃপ্তি! বুকটা যেন আমার জুড়িয়ে গেল। বড় জ্বালা সুলোচনা,—অগ্নিদগ্ধ হ'লেও লোকে এত জ্বালা ভোগ করে না। একাকী প'ড়ে থাক্‌তুম, রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ কর্‌তুম, কেউ একবার চোখ দিয়েও দেখ্‌তো না। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে যেত, মনোরমাকে ডাক্‌তুম, হয় তো আস্‌তো—না হয় আস্‌তো না, এমনি পাষাণহৃদয় তার। সুলোচনা! আমি কি ভুলই করেছি! কুহকিনী—তার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে, তোমার মত অনুগত পত্নীকে অসতী অপবাদে কলঙ্কিত করেছি। আমি এমনি অপদার্থ হয়েছিলুম যে, এ কথা উচ্চারণ কর্‌তে একটুও সঙ্কুচিত হইনি। যেন তার হাতের পুতুল,—আমাকে যে ভাবে ফেরাত, আমি সেই ভাবে চল্‌তুম।

সে সব পাপের শাস্তি হবে না? সুলোচনা! আমার এই অকালমৃত্যু সেই সব পাপের ফল।"

সুলোচনা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তোমার পায়ে পড়ি, ও সব কথা আমায় আর ব'লো না। তুমি ভাল হয়ে ওঠ,—আমি তোমার দাসী,—আমার প্রতি তোমার সবই শোভা পায়।"

সুরেশ। আর ভাল হয়ে উঠ্‌ব! আর বেশী দেরী নাই। আমি নিজে ডাক্তার, আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আর বেশী সময় নাই। মর্‌তে কাতর নই,—সুলোচনা! তবে দুঃখ এই—কিছুই ভোগ করতে পার্‌লুম না! আমার এই তেইশ বৎসর মাত্র বয়স—এই বয়সেই সব শেষ হ'ল! তোমার মত স্ত্রী, মায়ার মত বোন, জ্যোতিষের মত ভাই, কার ভাগ্যে ঘটে? কিন্তু ভোগ কর্‌তে পার্‌লেম না! সবই নিজের দোষে। কি কুক্ষণেই ডাক্তারী কর্‌তে সীতানাথ বাবুর বাটীতে গেছ্‌লুম? কি কুক্ষণেই মনোরমার সঙ্গে আমার দেখা হয়! যদি তার সঙ্গে আমার দেখা না হ'ত, তা হ'লে আজ আমার এই পরিণাম ঘট্‌ত না। আমার সোনার সংসার,—আমি কিছুই ভোগ কর্‌তে পার্‌লুম না!

সুরেশ বাবু একটু নিস্তব্ধ হইলেন; সুলোচনার নিকট একটু জল চাহিলেন; তাহার পর আবার বলিলেন; "আচ্ছা, তারার সঙ্গে ত আমার দেখা হ'লো না। তাকে শ্বশুরবাড়ী থেকে আনতে কি লোক গেছে?"

সুলো। ঠাকুরঝি অনেক চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু লোক পাওয়া যায়নি। তবে কা'ল একজন যাবে ব'লেছে।"

সুরেশ। তা হ'লে তার সঙ্গে আমার দেখা হ'লো না। ছোট বোনটি আমার। দেড় বছরের রেখে মা মারা যান। কত কোলে পিঠে ক'রে তাকে মানুষ করেছি। তার বিয়ের সময় পর্য্যন্ত আস্‌তে পারিনি, সে সময় মনোরমার অসুখ ছিল, তার চিকিৎসক ছিলেম কেবল আমি। তারা যখন এসে শুন্‌বে, তার দাদা নেই, তখন সে কেঁদে আকুল হবে।

সুলো। তুমি ভাল হয়ে উঠ্‌বে। কেন এ সব অমঙ্গলের কথা বল্‌ছ?

সুরেশ। এ রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় নাই। এ যে শিবের অসাধ্য রোগ। আমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে বলে, রোগের প্রথম অবস্থায় ভাল রকম চেষ্টা কর্‌লে কিছু দিনের জন্য স্থগিত থাকে, কিন্তু একেবারে সারে না। প্রথম অবস্থায় যদি বাড়ীতে থাকৃতুম, তা হ'লে চেষ্টা কর্‌লে ফল হ'তো। এখন আর কোন উপায় নেই।

সুলো। তাই কেন এলে না? তোমার বাড়ী, তোমার ঘর, কেন তুমি এলে না?

সুরেশ। কি ক'রে আস্‌ব? কতবার ইচ্ছা হ'ল আসি, কিন্তু কি ক'রে মুখ দেখাব? বিনা অপরাধে তোমার গুরুতর অপবাদ দিয়েছি, আমার নিজের সন্তানকে সন্তান ব'লে স্বীকার করিনি। মহাপাপ, সুলোচনা,—আমি মহাপাপ করেছি, কিন্তু আশীর্ব্বাদ করি, কায়মনোবাক্যে সর্ব্বান্তঃকরণে তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, স্বামী হ'তে সুখী হ'লে না, কিন্তু যেন সন্তান হ'তে সুখী হও।

এমন সময়ে মায়া সেই গৃহে পুনরায় প্রবেশ করিলেন।

সুরেশ বাবু ভগিনীকে বলিলেন, "মায়া! বাইরের সমস্ত লোককে একবার আমার কাছে ডাকো, আমার একটা কথা আছে।"

মায়া সকলকে সেই গৃহে ডাকিয়া আনিলেন। সুরেশ বাবু সকলকে সম্বোধন করিয় বলিলেন, "আপনাদের নিকট আমি কোন কথা বলিব। আমার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই। শুনুন, আমি মহাপাপী,—জীবনে আমি যে পাপ করেছি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনন্ত নরকভোগ। আপনারা জানেন, আমি এক ব্রাহ্মণকন্যাকে কুলত্যাগিনী করেছি। তার রূপমোহে অন্ধ হয়ে, আমার ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করেছিলাম। কিন্তু আমার ভগিনীর কৌশলে আমাকে একদিনের জন্য আমার স্ত্রীর পুণ্যবলে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে আসে। তার ফলে আমার স্ত্রী গর্ভবতী। কিন্তু সেই বেশ্যার কুহকে আর তার মনস্তুষ্টির জন্য আমার পতিব্রতা স্ত্রীকে অসতী অপবাদে লোকসমাজে কলঙ্কিত করেছি। আমি এই মৃত্যুকালে সকলের সম্মুখে স্বীকার কচ্ছি, তার গর্ভস্থ সন্তান আমার ঔরসজাত। সমাজ তাহাকে পরিত্যাগ করেছেন, এই জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, যেন আর আমার পরিবারবর্গকে কোন পীড়ন না করেন।"

সকলে সম্মত হইয়া বাহিরে গেল। সুলোচনা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "তুমি যদি বেঁচে থাকো, তবেই আমার সুখ, তা নইলে আমার সুখ-শান্তি এই পর্য্যন্ত। ওগো! তুমি জানো না, আমি যে দিবারাত্রি ভগবানের নিকট তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করি। আমার সব তুমি। তুমি যেখানে থাকো না, যাই কর না, তুমি ভাল আছ শুনেই আমি সুখী।"

সে রাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার পরদিন প্রাতঃকালে সুরেশ বাবুর একবার রক্তস্রাব হইল। তাহাতেই নাড়ী ছাড়িয়া গেল। আসন্ন সময় বুঝিয়া সকলে তাঁহাকে গৃহের বাহিরে আনিল। মায়া 'দাদা গো' বলিয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহার চরণ-তলে পড়িল। সুলোচনা কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গেলেন। তাহাতেই তাঁহার চৈতন্য লোপ পাইল। সদানন্দ হরেন্দ্র-কুমারকে মুমূর্ষুকে ভগবানের নাম শোনাইবার জন্য বলিয়া, নিজে স্ত্রীলোকদিগের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি প্রথমে সুলোচনার চোখে মুখে জল দিলেন, পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। সুলোচনার জ্ঞান হইল। তিনি সদানন্দের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বাবা! আমাকে ওঁর সঙ্গে যেতে দাও। আমি ত মর্‌তে গেছ্‌লুম, আমাকে কেন বাঁচালেন বাবা? মলে ত আমায় এ সব আর দেখ্‌তে হ'ত না। আমার যে আর কেউ নেই বাবা!" এই শোচনীয় দৃশ্যে সদানন্দের অন্তরও ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি আর তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিবেন কি, তিনি নিজেই বালকের মত রোদন করিতে লাগিলেন।

মায়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, "দাদা—দাদা!—এত দিন পরে বাড়ী এসেছ দাদা, দুদিন থেকে যাও দাদা। ও দাদা—আমাদের যে আর কেউ নেই দাদা,—আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াব দাদা? আমাদের যে আর দাদা বল্‌তে কেউ নেই দাদা। দাদা—আমাদের এমন ক'রে ছেড়ে যেও না দাদা।—" জ্যোতিষচন্দ্র জ্যেষ্ঠের শিরোদেশে বসিয়া কাঁদিতে-ছিলেন এবং তাঁহার মুখে গঙ্গাজল দিতেছিলেন।

যখন সব শেষ হইল, তখন মৃতের সৎকার করিবার জন্য জ্যোতিষচন্দ্র পাড়ার লোকদিগকে ডাকিলেন। পল্লীগ্রামের শ্মশানে যাওয়া বিশেষ কষ্টকর বলিয়া, সকলেই ইতিমধ্যে আপন আপন বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছিল। জ্যোতিষচন্দ্র তাঁহাদিগকে অনেক করিয়া বলিল, কিন্তু কেহই শ্মশানে যাইতে স্বীকার করিল না। পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত মূর্খলোকদিগের এই নৃশংস ব্যবহার দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। মানুষের এই চরম বিপদ্—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিপদে সাহায্য করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য; কিন্তু সে কর্ত্তব্যজ্ঞান তাহাদের নাই। তাহারা শ্রাদ্ধে লুচি খাইয়া বিপন্ন গৃহস্থের উপকার করিতে জানে, আর কোন প্রকার উপকার তাহাদের দ্বারা পাওয়া যায় না।

জ্যোতিষচন্দ্র বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলে, সদানন্দ তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কাতর হইও না, আমরা তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শেষকার্য্য সম্পন্ন করব।"—তখন দুই বন্ধুতে মিলিয়া সুরেশচন্দ্রের মৃতদেহ উঠাইয়া লইলেন। সে সময়ের দৃশ্যে পাষাণ-হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। উন্মাদিনীর মত বিভ্রান্তবেশে সুলোচনা ছুটিয়া গিয়া প্রাঙ্গণে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। 'ওগো,—আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও, আমার যে আর কেউ নেই।' কাঁদিয়া কাঁদিয়া মায়ার গলা ভাঙ্গিয়া গেল। সদানন্দ অগত্যা জ্যোতিষচন্দ্রকে বলিলেন, 'তোমরা দুই জনে বাড়ীর বাহিরে গিয়ে আমার জন্য একটু অপেক্ষা কর। আমি এঁদের একটু সান্ত্বনা ক'রে যাই। কি জানি, শোকে চৈতন্য হারিয়ে শেষে না কোন অনর্থ ঘটান।"

সদানন্দ তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু সে সময় কি মন প্রবোধ মানে? তাঁহাদের যে সংসারের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু চলিয়া গেল! তাঁহাদের আরও কষ্টের কারণ—সময়মত সুরেশের চিকিৎসা করাইতে পারেন নাই। কি কুক্ষণেই সুরেশ চাকরী করিতে বাটীর বাহির হন। কি কুক্ষণেই তিনি মনোরমা-কালসাপিনীকে চিকিৎসা করিতে যান। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে তাঁহার এই অকালমৃত্যু ঘটিত না।

বিবাহের পর হইতে সুলোচনার এক এক করিয়া সমস্ত ঘটনা মনে পড়িতে লাগিল। স্বামীর আদর-অনাদর, প্রীতি-অপ্রীতি যে দিন যাহা ঘটিয়াছিল,একে একে তাঁহার মনের মধ্যে উদয় হইতে লাগিল। তাঁহার প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আর ত এ জন্মে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না। সহস্র নির্য্যাতনেও স্বামী তাঁহার আরাধ্য দেবতা। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার সে নির্য্যাতনভোগ করাও ত সুখের ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যে সমস্ত কথা বলিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্ত কথা মনে করিয়া সুলোচনা আরও ব্যথা পাইলেন। হায়, প্রাণ দিয়াও কি তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারেন না?

যখন সুরেশ বাবুর সৎকার করিয়া সকলে গৃহে ফিরিলেন, মায়া ছুটিয়া গিয়া সদানন্দের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সদানন্দ ঠাকুরও কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে বলিলেন, "কি করবে মা, জগদীশ্বরের নিয়ম এই। তাঁর কার্য্যে বাধা দেওয়া ত মানুষের সাধ্য নয়। কাল পূর্ণ হইলে সকলেই চলিয়া যায়, কেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। আদরের সমস্ত সূত্র দিয়াও বাঁধিয়া রাখা যায় না। ভালবাসার কঠিন বন্ধনও

কালের কুঠারাঘাতে ছিন্ন হয়।”—মায়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “দাদা ত চলিয়া গেলেন. এই শোকের উপর আমার আরও চিন্তা সংসার লইয়া। আজ ছয় মাস তিনি খরচ দেননি। সংসার চালিয়ে অবশিষ্ট যা কিছু ছিল, সবই তাঁর ব্যায়রামে খরচ হয়েছে। কাল যে আমরা কি খাব, সে সঙ্গতি আমাদের নেই। কি উপায় হবে বাবা আমি ত ভেবে কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছি না।”

সদানন্দ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, “ভগবান্‌ই উপায় করবেন মা. সে জন্য তুমি অত ভেবো না। যিনি জীব দিয়েছেন, তিনিই তার আহারের ব্যবস্থা করেছেন।”

রাত্রে যখন সকলে নিদ্রিত হইল, তখন সদানন্দ মায়াকে নিজের কাছে ডাকিলেন। মায়া আসিলে তাঁহাকে বলিলেন, “মা! এই থলেটি নাও। ইহার মধ্যে চারি হাজার টাকা আছে। বুঝিয়া চলতে পারলে যত দিন না জ্যোতিষচন্দ্র উপার্জ্জনক্ষম হয়, এই অর্থ দ্বারা তোমাদের তত দিন পর্য্যন্ত বেশ চ'লে যাবে। কিন্তু এ টাকার বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।” পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে. সদানন্দ শ্বশুরালয়ের ও পিত্রালয়ের সমস্ত বিষয় বিক্রয় করিয়া এই অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

মায়া স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, “তা হবে না বাবা, আপনার টাকা আমরা কি ক'রে নেব? আপনি আমাদের যে উপকার করেছেন, প্রাণ দিলেও আপনার ঋণ শোধ হইবে না।”

সদানন্দ মায়াকে বুঝাইয়া বলিলেন, “এ টাকা পরের উপকারের জন্যই আমাকে খরচ করিতে হইবে। আর সেই জন্যই

আমি সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছি। তুমি আমার কন্যার মত, আমার দান গ্রহণ করায় তোমার কোন দোষ নাই। আজ যদি তোমার জন্য খরচ না করি, তাহা হইলেও একজন না একজনের জন্য আমাকে খরচ করিতে হইবে। তার পর টাকা না নিয়েই বা করবে কি মা? তোমাদের উপস্থিত কোন আয়ের সম্ভাবনা নাই। সংসারে আর্থিক অশান্তির মত কষ্টকর আর কিছুই নাই এ সব কথা তুমি ভাল ক'রে বুঝে দেখ।"

মায়া অনেক ভাবিয়া বলিলেন, "আপনি আমাদের যে উপকার করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। আপনি না থাকিলে আমাদের কি উপায় হইত, তাহা বলিতে পারি না। তাহার উপর আবার আপনার টাকা নেব?"

সদা। তুমি আমার কাছে ধার নাও। যখন জ্যোতিষচন্দ্র উপার্জ্জন করিতে শিখিবে, তাহাকে বলিও, এই অর্থ যেন তখন শোধ করে। যার প্রকৃত অভাব দেখবে, এইরূপ লোকের অভাবমোচন এই অর্থের দ্বারা করিতে পারিলেই আমার ঋণ শোধ করা হইবে। তার পর টাকা না নিয়েই বা করবে কি? তোমাদের উপস্থিত আর কোন আয়ের সম্ভাবনা নাই। সংসারে আর্থিক অস্বচ্ছলতার মত কষ্টকর আর কিছুই নেই। তুমি বেশ ক'রে বুঝে দেখ মা!

মায়া অনেক ভাবিয়া সদানন্দের প্রদত্ত সেই অর্থ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নিকট উহা না লইলে সংসার প্রতিপালন করিবার আর অন্য উপায় নাই। গ্রামের লোকের নিকট ভিক্ষা ছাড়া তাঁহাদের অন্য অবলম্বন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাহার অপেক্ষা এ দান গ্রহণ করাই ভাল। মায়া আরও

ভাবিলেন, সদানন্দ ঠাকুর নিশ্চয়ই ঈশ্বর-প্রেরিত, এ দুর্দ্দিনে যদি তিনি না থাকিতেন, তাহা হইলে কে তাঁহাদিগকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিত?

শ্রাদ্ধাদি শেষ হইলে সদানন্দ মায়ার নিকট বিদায় চাহিলেন। মায়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে নিতান্ত কষ্ট বোধ করিলেন। অনেক দিন হইয়া গিয়াছে, আর তিনি থাকিতে পারেন না। তাই তিনি মায়াকে বলিলেন "মা, অনেক দিন হইয়াছে, তোমাদের বাটীতে অনেক দিন আছি, আর ত থাকৃতে পারি না; আমার মন নবদ্বীপ দর্শন করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। যখন পুনরায় এ পথে আসব তোমার সঙ্গে দেখা না ক'রে যাব না।"

মায়া তাঁহার চরণ ধরিয়া বলিলেন, "বাবা আপনার ঋণ ইহজন্মে কখনও শোধ করতে পারব না। যত দিন বাঁচ্বো, আপনার কথা কখনও ভুলতে পার্বো না।"

সুলোচনা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সদানন্দ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "পুণ্যবতি! আশীর্ব্বাদ করি, সুসন্তান লাভ কর এবং সেই সন্তান হ'তে যেন সুখী হও"

নীরবে সুলোচনার চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রুজল তাঁহার চরণে পতিত হইল। সদানন্দ তাঁহাকে বলিলেন, "কেঁদো না মা! এখন জগদীশ্বরের নিকট কামনা কর, যেন তোমার পুণ্যে সুরেশচন্দ্র স্বর্গ লাভ করেন।"

তাহার পর দুই বন্ধুতে শ্রীনবদ্বীপ উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। চিরদিনের জন্য উভয়ের পুণ্যের ছবি এই পরিবারবর্গের প্রত্যেকের মনে অঙ্কিত রহিল।

উপসংহার।

ইহার পর পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা এই উপসংহারে প্রকাশ করিয়া এই গ্রন্থ শেষ করিব।

সদানন্দ ও হরেন্দ্রকুমার দুই বন্ধুতে ভারতের নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এই-রূপে বহুদেশভ্রমণে এবং বহুলোকের সহিত ব্যবহারে তাঁহাদের চিত্তের যাহা কিছু মলিনত্ব ছিল, সমস্তই দূর হইল। তখন নির্ব্বি-কার-চিত্তে নির্ম্মুক্ত মহাপুরুষের মত তাঁহারা সমস্ত সংসারের সমস্ত লোককেই আপনার বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পারি-বারিক দারুণ বিপ্লবের স্মৃতি যদিও কখন কখন তাঁহাদের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিত, তাহা হইলেও তাহার কার্য্যকরী শক্তি একেবারে লোপ পাইয়াছিল। তখন —

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥"

তখন তাঁহারা যাহা কিছু করিতেন, লক্ষ্য ছিল একদিকে। তখন সদানন্দের গুরুবাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া বোধ হইল।

বদরিকায় উপস্থিত হইয়াই তাঁহারা জ্ঞানানন্দ সরস্বতীর দর্শনলাভ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই হর্ষে সদানন্দের সর্ব্ব-

শরীর রোমাঞ্চিত হইল। আনন্দে আত্মহারা হইয়া তিনি সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন; তাঁহার চরণধূল লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিলেন। হরেন্দ্রকুমারও তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। সরস্বতী ঠাকুর সদানন্দকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বৎস! তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হউক।"

জ্ঞানানন্দ সরস্বতী সদানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ পাঁচ বৎসর হইল, সেই নদীতীরে গভীর রাত্রে মাত্র একবার আমার দর্শনলাভ করিয়াছিলে, আর আজ এত দিন পরে তুমি আমাকে চিনিলেই বা কিরূপে?"

সদানন্দ বক্ষে হাত দিয়া বলিলেন, "প্রভু! এ হৃদয়ে আর কিছুই নাই, কেবল আপনার মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। যে দিন প্রথম আপনার দর্শনলাভ করি, সেই দিন হইতে আমি ঐকান্তিকচিত্তে কেবল আপনার দর্শন-কামনা করিতেছি।"

জ্ঞানানন্দ। আমি ত তোমায় ব'লেছিলাম, বৎস! যে, উপযুক্ত সময়ে আমার দর্শন পাবে। এখন সেই সময় উপস্থিত। এখন চল, ঐ আমার আশ্রম দেখা যাইতেছে, সেইখানে বিশ্রাম করিবে। তাহার পর যাহা করিতে হইবে, তাহা তোমাদিগকে বলিব।

তখন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহারা দুই বন্ধুতে তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পার্ব্বতীয়া প্রকৃতির চারুচিত্রে তাঁহাদের মন মুগ্ধ হইল। দূরে নগাধিপতির অত্যুচ্চ কিরীট আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে।

এক সপ্তাহ অতীত হইলে, সরস্বতী ঠাকুর তাঁহাদের উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এইবার তোমাদিগকে বঙ্গদেশে

ফিরিয়া যাইতে হইবে। উপস্থিত সেখানে অনেক কার্য্য রহিয়াছে। এইবার আমিও তোমাদের সঙ্গে যাইব।"

তাঁহারা তিন জনে পুনরায় বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন ঠাকুরের আদেশমত বন্ধুদ্বয় প্রথমে শ্যামপুরে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন, জমীদার সীতানাথ রায় পক্ষাঘাত-রোগাক্রান্ত হইয়া, বহুদিন রোগভোগ করিয়া, সম্প্রতি লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। মরিবার সময় তাঁহার অর্দ্ধেক সম্পত্তি দেবসেবার্থে দান করিয়াছেন, অপর অর্দ্ধেক তাঁহার জামাতা হরেন্দ্রকুমারের নামে উইল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জামাতার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত-হৃদয়ে এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী সম্পত্তির আয় হইতে জীবিতকাল পর্য্যন্ত মাসে একশত টাকা মাত্র বৃত্তি পাইবেন, আর কোন বিষয়ে তাঁহার অধিকার ছিল না।

হরেন্দ্রকুমার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া, কি ব্যবস্থা করা উচিত, সেই সম্বন্ধে সদানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সদানন্দ সরস্বতী ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উপস্থিত কিছু না করিয়া, তাঁহাদিগকে লইয়া কালীঘাট উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। মায়ের মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, পূজার্চ্চনা শেষ করিয়া, তাঁহারা নকুলেশ্বর দর্শন করিতে যাত্রা করিলেন। অর্দ্ধপথে গিয়াছেন, এমন সময় এক গলিত-কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিখারিণী আসিয়া হরেন্দ্রকুমারের পা জড়াইয়া ধরিল। তাঁহারা তিন জনেই তাহার কার্য্য দেখিয়া বিস্মিতভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?"

ভিখারিণী কোন কথা না বলিয়া কেবল হরেন্দ্রকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা তিন জনেই তাহার মুখ দেখিয়া চমকিত হইলেন। সদানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এ যে মনোরমা!"

সরস্বতী ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "জমীদার সীতানাথ রায়ের কন্যা কুষ্ঠরোগাক্রান্তা হয়ে প্রকাশ্যে রাজপথে ভিক্ষা করিতেছে। ইহাই পাপের উপযুক্ত পরিণাম!"

হরেন্দ্রকুমার মনোরমাকে বলিলেন, "মনোরমা! আমার পা ছেড়ে দাও।"

মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আপনি বলুন,—আমায় ক্ষমা করিলেন? আমি এত দিন গঙ্গায় গিয়ে ডুবে মর্‌তুম, কিন্তু তা পার্‌লুম না। আপনার চরণ স্পর্শ না ক'রে মর্‌লে আমার পাপের মোচন হবে না। আপনি বলুন,—ক্ষমা কর্‌লেন? না ব'ল্লে আপনার পা ছেড়ে দিব না। আপনি যদি বলেন, আমায় মার্জ্জনা করেন, তা হ'লে আমার মর্‌তে ভয় হবে না, আমি গঙ্গায় গিয়ে ডুবে মর্‌তে পার্‌বো। আমি এত দিন কেবল আপনার অপেক্ষায় এই কঠিন যন্ত্রণা সহ্য কচ্ছি। আমার মনে দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল, এ পুণ্যতীর্থে কখন না কখন আপনার দর্শন পাব। এখন আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, পাপ ক'ল্লে তাকে কি শাস্তি পেতে হয়! আপনার কথা যে কত দূর সত্য, আমার চেহারা দেখেই সকলে বুঝ্‌তে পার্‌বে। আমি অজ্ঞান অন্ধ ছিলুম, তাই আপনাকে বুঝ্‌তে পারিনি; তাই আপনাকে চিন্‌তে পারিনি।"

সরস্বতী ঠাকুর সদানন্দকে বলিলেন, "বাবা! আজ আর

নকুলেশ্বর দর্শন ক'রে কাজ নেই। তুমি একখানা পাল্কী ডেকে আনো। মনোরমাকে বাসায় নিয়ে যেতে হবে।"

সদানন্দ গুরুদেবের কথা অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া পাল্কী ডাকিতে গমন করিলেন ও সত্বর একখানা পাল্কী আনিলেন। তাঁহারা কয়জনে ধরাধরি করিয়া মনোরমাকে পাল্কীতে তুলিলেন। রাস্তার লোক বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল। কেহ কেহ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ ভিখারিণী কে?"

পাছে হরেন্দ্রকুমার লজ্জিত হন, এই জন্য সরস্বতী ঠাকুর সকলের কাছে বলিলেন, "আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা।"

মনোরমাকে লইয়া বাসায় উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোরমা! তোমার এমন অধঃপতন হবার কারণ কি? তোমার এত অর্থ কি ক'রে নষ্ট হ'ল?"

মনোরমার কথা।

যে দিন আমার স্বামী আমাকে বলেন, "তুমি শীঘ্রই এ পাপের ফল দেখ্‌তে পাবে," সেই দিন হতেই আমার প্রাণের মধ্যে কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল। আমি সর্ব্বদাই সশঙ্কিত রইলুম। মনের মধ্যে পর্ব্বত-প্রমাণ অশান্তির বোঝা বইতে লাগলুম, আমি সহস্র চেষ্টা করেও মনের শান্তি ফিরে পেলুম না। স্বামীর কথা শুনে আমার মনের মধ্যে যেন একটা কালির দাগ প'ড়ে গেল, আমি কিছুতেই সে দাগ মুছ্‌তে পার্‌লুম না।

সুরেশ বাবুর ব্যায়রাম হওয়ার পর হইতে আমি রাম-কানাইকে খুব ভালবাস্‌তে লাগ্‌লুম। তার পর সুরেশ বাবুকে আপনারা নিয়ে গেলেন, তখন থেকে আমার উপর রামকানাই-য়ের অত্যাচার সহস্রগুণে বেড়ে উঠ্‌ল। দিন নেই,—রাত্রি নেই,—সময় নেই,—অসময় নেই, সর্ব্বদাই তার সঙ্গে মদ খেতে আরম্ভ কর্‌লুম। তখনও পর্য্যন্ত আমার প্রকৃতির পরি-বর্ত্তন হয় নাই। আমি মনকে প্রফুল্ল রাখ্‌বার জন্য দিবারাত্রি মদ্যপান কর্‌তুম। অহোরাত্র দুই জনে মুখামুখী হয়ে ব'সে থাক্‌তুম। রামকানাই প্রথমে আমাকে যেন তার কণ্ঠহার করেছিল। যখনই আমার স্বামীর সেই কঠোর অভিসম্পাতের কথা মনে হ'ত, আমি মদ খেতুম। রামকানাই আমাকে বলেছিল, মদের মত মনকে প্রফুল্ল রাখ্‌বার আর অন্য জিনিস নেই। বাস্তবিকই তাই। যতক্ষণ নেশা থাক্‌ত, আমার মনে

কোনরূপ অশান্তি হ'ত না; আমি সব ভুলে যেতুম। মনের তৃপ্তিসাধন করতে আমি একবারও ভবিষ্যতের দিকে ফিরে চাইতেম না। সর্ব্বদাই আমি বিলাস-সাগরে নিমগ্ন থাকতেম। সাবান, এসেন্স, আতর গোলাপ আমার ঘরে কত নষ্ট হ'ত। সুরেশ বাবুর বাবুয়ানা ছিল না, অকারণ পয়সা খরচ করতে তিনি ভালবাসতেন না। আমি যদি কোন অন্যায় খরচ করতুম, তা হ'লেও তিনি আমায় ব'কতেন। তাঁর আমলে আমাকে তিনি অনেক সৎকর্ম্মও করাতেন, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে দু-পয়সা হাত তুলে দিতুম, কাঙ্গালী-ভিখারীকে মাঝে মাঝে খাওয়াতুম, আরও অনেক সৎকার্য্য করাতেন। রামকানাইয়ের আমলে সে সব একেবারে উঠে গেল। দেউড়ীতে দরোয়ান ব'সলো, বাজে লোক কেউ ঢুকতে পে'ত না। কেবল মদের শ্রাদ্ধ হ'তে লাগল; কালিয়া, পোলাও, কতক খাওয়া হ'ত, কতক ফেলা যেত। দিনরাত্রি কেবল গাওনা, বাজনা, মদ, মাংস, আমোদ, স্ফূর্ত্তি। টাকা জলের মত খরচ হ'তে লাগল। সুরেশ বাবুর আমলে আসল টাকা একেবারেই খরচ হ'ত না, কেবল কোম্পানীর কাগজের সুদ থেকে চ'লত; কিন্তু রামকানাইয়ের আমলে আসলে হাত প'ড়ল। ক্রমে ক্রমে সে সমস্তই নিজের হাতে নিলে। আমাকে আর কিছুই দেখতে দিত না, আমিও রাত-দিন মদের নেশাতে একেবারে বেহুঁস হয়ে কিছুই দেখতে পারতুম না।

এই রকমে তিন বৎসর কেটে গেল। তার পর জ্বরবিকারে রামকানাইয়ের মৃত্যু হ'ল। যখন তার মৃত্যুসংবাদ পেলুম, তখন দেখতে পেলুম, আমার আর কিছুই নেই। মনে বড় ভয় হ'ল;

এইবারে আমার স্বামীর অভিসম্পাত পূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছে, প্রথমে সুখী ঝি আমার কতক টাকা চুরি ক'রে নিয়ে গেল, তার পর অনবরত এই রকম অন্যায় খরচ। রাজার ভাণ্ডার ফুরিয়ে যায়, তা আমার ঐশ্বর্য্য!

তার পরে শুনুন। রামকানাই মর্‌বার তিন চার দিন পরে একদিন সকালবেলা সবে ঘুম থেকে উঠেছি, এমন সময় একজন দরোয়ান এসে বল্লে, "রামকানাইয়ের ভাইপো বাহিরে এসে দাঁড়িয়ে আছে, সেই এখন বাগানের মালেক, আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চায়।"

আমি তাঁকে নিয়ে আস্‌তে বল্লুম। তিনি এসে আমাকে ব'ল্লেন, "কাকা বাবু মারা গিয়েছেন, এখন আমিই তাঁর এষ্টেটের মালেক, সুতরাং এ বাগানও আমার। আপনি যদি এই বাগানে বাস কর্‌তে চান, তা হ'লে আপনাকে সম্ভবমত ভাড়া দিতে হবে।" আমি তাঁকে ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্লেন, মাসিক পঞ্চাশ টাকার কমে এত বড় বাগানবাটীর ভাড়া হ'তে পারে না। আমি বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লেম যে, পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দেওয়া আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোম্পানীর কাগজ ত সবই গেছে। গায়ের গহনা কতক সুখী চুরি ক'রে নিয়ে গেছে, যা আছে—বেচ্‌লে বড় জোর দু-তিন হাজার টাকা হ'তে পারে। আর ঘরের জিনিসপত্র সমস্ত যদি বিক্রী করি, তাতেও না হয় হাজার টাকা হবে। সুতরাং এত বড় বাড়ী আমি কি ক'রে রাখ্‌ব? কিন্তু উপস্থিত এখন যাই কোথায়? সহর-জায়গা নয় যে, ছোটখাট একখানা বাড়ী ভাড়া ক'রে থাকব? কাজেই রামকানাইয়ের ভাইপোকে বল্লুম, আমায়

পনের দিনের সময় দিতে। সেই পনের দিনের মধ্যে আমাকে বাড়ী দেখে নিতে হবে। তিনি আর কোন কথা না ব'লে চ'লে গেলেন।

রামকানাইয়ের ভাইপো চ'লে গেলে, আমি সমস্ত দিনই ভাব্‌তে লাগ্‌লুম, কি কর্‌বো? কোথায় যাব? ভেবে ত কিছুই স্থির কর্‌তে পার্‌লুম না।

সেই দিন বৈকালে নীলরতন বাবু ব'লে একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এলেন। রামকানাই বেঁচে থাক্‌তে এই নীলরতন বাবু কখন কখন তাঁর সঙ্গে আমার এই বাগান-বাটীতে আস্‌তেন, একটু আধটু মদও খেতেন, গান-বাজনাও কর্‌তেন। সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমার পূর্ব্বে থেকেই আলাপ ছিল। তিনি এলে তাঁকে বস্‌তে দিলুম এবং তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লুম। তিনি বল্লেন, অনেক দিন আসেন নাই, তাই আমাকে একবার দেখ্‌তে এসেছেন। শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা কর্‌বার পর তিনি কথায় কথায় আমাকে বল্লেন, "মনোরমা! রামকানাই বাবু ত এখন বেঁচে নাই, তুমি এখন কি ক'র্‌বে, এই বাড়ীতেই কি থাক্‌বে?"

আমি তাঁহাকে তখন সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিলাম। আমি যে নিরাশ্রয় হইয়াছি এবং নিরুপায়ে পড়িয়া অকূল চিন্তাসাগরে ভাসিতেছি, এ কথাও তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না। রামকানাইয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট মাত্র পনের দিন সময় লইয়াছি, এই পনর দিনের পর আমি যে কোথায় যাইব, তাহার কোন স্থিরতা নাই।

নীলরতন বাবু আমার কথা শুনিয়া, কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া,

আমাকে বলিলেন, "মনোরমা! তুমি যদি কিছু মনে না কর, তা হ'লে আমি তোমাকে একটা কথা বলি।"

আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি স্বচ্ছন্দে বলিতে পারেন।"

নীলরতন বাবু তখন বলিলেন, "দেখ মনোরমা! তোমার যে অবস্থা, এ অবস্থায় একজন অভিভাবক থাকা বিশেষ দরকার। তুমি স্ত্রীলোক,—তোমার পক্ষে একাকিনী বাস করা কোনমতেই উচিত নয়। মানুষের জীবনে সুখ-অসুখ আছে, বিপদ্-সম্পদ্ আছে, কখন্ কি অবস্থায় পড়িবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।"

আমি বলিলাম, "কি করিব,—আমার আর কে আছে?"

নীলরতন বাবু বলিলেন, "তোমার যদি অভিরুচি হয়, আমি তোমায় পরম যত্নের সহিত রাখ্‌তে পারি। কিন্তু তোমার এ গ্রামে থাকা চল্‌বে না। কারণ, আমার বাড়ী এখানে, এখানকার লোকে শুন্‌লে একটা নিন্দে হবে এবং আমার বাড়ীর লোকেই বা কি বল্‌বে?"

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় যেতে হবে?"

নীল। আমি যেখানে কাজ করি।

আমি বলিলাম, "কৃষ্ণনগরে? সেইখানেই ত আপনি কাজ করেন?"

নীল। হাঁ,—সেইখানেই।

আমি বলিলাম, "সেইখানেই আপনি মোক্তারী করেন, তা আমি জানি।"

নীল। আমি সেখানে একা থাকি। তুমি যদি যাও, আমি

সেখানে একখানা ছোট-খাট বাড়ী ভাড়া ক'রে, দুজনে স্ত্রী-পুরুষের মত বাস করতে পারি। কেউ জানতে পারবে না, কেউ কিছু বলতে পারবে না। অথচ আমরা বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারব।

নীলরতন বাবুর কথা শুনিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলাম আমার আর অন্য উপায় নাই। স্বাধীনভাবে গ্রাসাচ্ছাদনের ক্ষমতা আমার আর নাই। অগত্যা পরমুখাপেক্ষী হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিশ্চয়ই কাটাইতে হইবে। কিন্তু কি ভাবে যে কাটিবে, তাহা জগদীশ্বরই জানেন। জীবনের মধ্যে প্রথমে ঐ সময় আমার মনের মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা উদয় হইল। ইহার পূর্ব্বে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কখন জগদীশ্বর আছেন, এ কথা ভাবি নাই।

আমাকে চিন্তিত দেখিয়া নীলরতন বাবু বলিলেন, "মনোরমা,—কি ভাব্‌ছ? আমার সঙ্গে যাওয়া কি তোমার অভিপ্রায় নয়?"

আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমার আর অন্য অভিপ্রায় কি হইতে পারে? যাহারই হউক, একজনের আশ্রয়ে আমাকে নিশ্চয়ই থাকতে হবে। কিন্তু——"

নীল। কিন্তু কি? তুমি ভাব্‌ছ, আমি তোমাকে অযত্ন কর্‌বো? দেখ, মনোরমা! আমার সাধ্যমত আমি তোমাকে সুখে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌বো। দেখ, মনোরমা! রামকানাইয়ের সঙ্গে প্রথম যে দিন তোমার ঘরে আসি, সত্যকথা বলতে কি, তোমার রূপ দেখে আমি স্তম্ভিত হই। স্ত্রীলোকের ভিতর এমন সুন্দরী আছে, এ আমার ধারণা ছিল না; এমন রূপ আমি আর কখন দেখিনি। সেই দিন থেকে তোমার ছবি আমি

মনের মধ্যে এঁকে রেখেছি, কিন্তু তখন আমার সাহস হয়নি যে, তোমাকে আমি মনের কথা বলি। আর বল্‌বই বা কি ক'রে? কারণ, তখন তুমি সুরেশ ডাক্তারের রক্ষিতা।

আমি নীলরতন বাবুর কথা শুনে বল্‌লুম, "আমাকে যদি তুমি একটু যত্ন কর, তা হ'লে চিরদিনই আমি তোমার আশ্রয়ে থাক্‌বো। সুরেশ ডাক্তার বল, রামকানাই বল, আমি কাহারও কখন অধীন হইনি, কারণ, তখন আমার পয়সা ছিল। কিন্তু এখন আমার পয়সা নেই, কাজেই এখন আমাকে তোমার অধীন হয়ে থাক্‌তে হবে।"

নীল। ছি!—ছি!—সে কথা তুমি একবারও মনে ভেবো না। তুমি আমার প্রাণ,—আমার কত আদরের, তা বলতে পারি না। রামকানাই বল, সুরেশ ডাক্তার বল, তারা তোমায় যত্ন করত, তোমার টাকার খাতিরে; তারা তোমাকে ভাল-বাসেনি, কিন্তু যথার্থ বল্‌তে কি—মনোরম! আমি তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসি। তোমার ভালবাসা লাভ কর্‌তে আমি সমস্ত সংসার ত্যাগ কর্‌তে পারি। স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব তোমার তুলনায় অতি তুচ্ছ। যে অবধি আমি তোমায় দেখেছি, তোমায় পাবার জন্য আমি একেবারে উন্মাদ হয়ে আছি।

আমি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম কি না, তাহা ঠিক করিতে পারি না; কিন্তু তখন আমার আর অন্য গতি কি হইতে পারে? আমি ভিখারিণী ছিলাম, তাহার পর এক এক করিয়া দুই জন পুরুষ আমার রূপ সক্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। আমাকে এইবার তৃতীয় পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

ক্ষণেকের জন্য মনের মধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। আমি একবার মনে ভাবিলাম, একবারমাত্র আমার মনে হইল, যদি আমার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় থাকিত, তাহা হইলে আমি এ পথ পরিত্যাগ করিয়া কাশী চলিয়া যাইতাম। তখনও আমার মনে ধারণা জন্মে নাই যে, সৎপথে থাকিলে জগদীশ্বর তাহার জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দেন। তখনও আমার রূপ ছিল, যৌবন ছিল, আয়ত লোচনে বিলোল কটাক্ষে পুরুষের মন চুরি করিতে তখনও আমার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। তখনও আমার মনোবৃত্তি কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই। তাহাতেই আমি তখনও গণিকাবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারি নাই।

নীলরতন বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা সমস্ত ঠিক হইল। স্থির হইল, তাঁহার ছুটী ফুরাইতে আর তিন দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহার পর তিনি বাটী চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে পরদিন সন্ধ্যার পর আসিবার জন্য অনুরোধ করিলাম।

পরদিন সন্ধ্যার পরই নীলরতন বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি এত দিন ধরিয়া তাঁহাকে দেখিয়াছি; কিন্তু সে দিন তাঁহার যে রূপ দেখিয়াছিলাম, সে রকম রূপ আর কখন দেখিতে পাই নাই। আমার অধঃপতনের সর্ব্বনিম্নসোপানের পথপ্রদর্শক বলিয়াই বোধ হয়, সে দিন আমার চক্ষে তাঁহাকে অত সুন্দর দেখাইয়াছিল।

নীলরতন বাবু আসিয়াই আমাকে বলিলেন, "মনোরমা! আজ আমার কি সুখের দিন! আমার বহুকালের আশা পূর্ণ হ'ল! তুমি যে আমাকে এতটা অনুগ্রহ করবে, আমি যে কখন তোমার ভালবাসা পাব, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। এত দিন

ধ'রে আমি কেবল মনের মধ্যে তোমার ছবি এঁকে তোমাকে ধ্যান করতুম। ভেবেছিলুম, আমার সারা জীবনটা তোমার ধ্যানেই কাটবে। আমি কখন ভাবতে পারিনি যে, তোমার সজীব প্রতিমার সঙ্গসুখ ভোগ করতে পারবো।"

আমি তাঁহার কথা শুনিয়া একটু হাসিলাম। সকল পুরুষেই এইরূপ বলিয়া থাকে। আমার রূপের কি একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল, যে শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া আমার রূপাসক্ত পুরুষ একেবারে কাণ্ডজ্ঞানরহিত হইত।

নীলরতন বাবু সঙ্গে এক বোতল মদ্য আনিয়াছিলেন। রামকানাইয়ের মৃত্যুর পর হইতে আমি তখনও পর্য্যন্ত মদ্য স্পর্শ করি নাই। নীলরতন বাবুর অনুরোধে আবার সেই দিন হইতে মদ্য পান করতে আরম্ভ করিলাম। রামকানাইয়ের মৃত্যুর পর হইতে আমার মনের প্রফুল্লতা যেন একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সর্ব্বদাই মনের মধ্যে ভাবনা হইত, আমার ভবিষ্যৎ-জীবন কি ভাবে কাটবে? স্বামীর সেই বজ্রনির্ঘোষ তুল্য কঠোর অভিসম্পাত, তাঁহার যাইবার সময় সেই তেজঃপূর্ণ গর্ব্ববাক্য স্মরণ করিয়া আমার সর্ব্বশরীর আতঙ্কে কম্পিত হইত। তাই নীলরতনের প্রদত্ত সেই সুধা কিংবা গরল আমি তৃপ্তির সহিত আকণ্ঠ পান করিলাম। কিছুক্ষণের জন্য চিত্তের অপ্রসন্নতা দূর হইয়া স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির বিকাশ হইল। আবার যৌবনের লালসাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কামানলশিখা সমস্ত শরীরে ফুটিয়া উঠিয়া আমাকে দাহন করিতে লাগিল। আমি যেন অযাচিতভাবেই নীলরতন বাবুকে আত্মদান করিলাম। সেই দিন হইতেই তাঁহার রক্ষিতা বেশ্যার মত আমি তাঁহার অনুগ্রহভিখারিণী হইয়া জীবন কাটা-

হইতে আরম্ভ করিলাম। যে কয় দিন তাঁহার ছুটী ছিল, তাহা ফুরাইয়া গেল। তিনি আমাকে তাঁহার সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। আমার অর্থের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, সমস্ত সঙ্গে লইয়া যথাসময়ে তাঁহার সহিত কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলাম।

আমাকে লইয়া নীলরতন বাবু কৃষ্ণনগরে এক ভদ্রপল্লীতে একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করিলেন। গ্রামের অধিবাসী লোকদিগের নিকট এই পরিচয় দিলেন যে, আমি তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রী। তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থিতিকালে তিনি আমাকে বিবাহ করেন। এই কৈফিয়ৎ দিয়া নীলরতন বাবু আমাকে লইয়া সমাজে চলিতে লাগিলেন। কেহ কোন সন্দেহ করিল না। কিন্তু আমাকে তাঁহার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিলেও তিনি আমাকে কোথাও যাইতে দিতেন না। মনে ভয় ছিল, যদি কোন রকমে গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাঁহাকে শাস্তি পাইতে হইবে।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, নীলরতন বাবু কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সহবাসে কিছু দিন বেশ সুখে কাটাইলাম। কিন্তু আমার কৃতকার্য্যের ফলভোগ আমাকে অবশ্যই করিতে হইবে আর আমার স্বামীর অভিসম্পাতও নিশ্চয় পূর্ণ হইবে। কিছু দিন পরে আমি দুরন্ত-বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলাম। একে উৎকট ব্যাধির ভীষণ আক্রমণের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা, তাহার উপর শুশ্রূষা করে, এমত কেহ নাই। রোগ সংক্রামক, কাজেই নীল-রতন বাবু বিশেষ শঙ্কিত হইলেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া আমাকে তিনি দাতব্য-চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

মুখে বলিলেন, "মনোরমা! তুমি অসন্তুষ্ট হইও না, এখানে তোমাকে দেখিবার কেহ নাই। তুমি একটু ভাল হইলেই তোমাকে লইয়া আসিব।" আমি তখন হইতেই বুঝিতে লাগিলাম, পাপের ফল অবশ্যই হইবে। দাতব্য-চিকিৎসালয়ে অশ্রদ্ধার সহিত অনাত্মীয়ের সেবা আর আমার পিত্রালয়ে রোগ শয্যায় শায়িত হইলে আমাগত-প্রাণ আমার আত্মীয়বর্গের শুশ্রূষা, সেই সময় আমার মনের মধ্যে উদয় হইল। অনুতাপে আমার অন্তর ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

নির্জ্জন গৃহে জীর্ণ মলিন শয্যায় সমস্ত দিন-রাত্রি একা পড়িয়া থাকিতাম। কথা কহিবার একজন লোক নাই। কে কাহাকে দেখে? তখন আমার প্রাণের মধ্যে কি বিষম যন্ত্রণা হইতে লাগিল, তাহা বলিতে পারি না। কেন এমন কাজ করিলাম? আমার ত সবই ছিল, কিছুরই অভাব ছিল না। আমি নিজের দোষে সমস্তই হারাইয়াছি!

প্রায় এক মাস কাল হাঁসপাতালে থাকিলাম। তখনও আমার সামর্থ্য ফিরিয়া আইসে নাই। সেখানে অবস্থিতিকালে নীলরতন বাবুকে হাঁসপাতালের লোক দ্বারা খবর পাঠাইলাম। যেন আমাকে একবার দেখিয়া যান। প্রথম প্রথম দুই একবার তিনি আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তার পর আর আসেন নাই—আমি সংবাদ দিলেও আসেন নাই। আমি তাঁহাকে অনেক কাতরতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমার সে কাতরতায় কর্ণপাত করেন নাই। তখন আমি আরও ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম যে, রূপের নেশায় পুরুষ ঘুরিয়া বেড়ায়, সে নেশার ঘোর কাটিয়া গেলে একবার তাহারা ফিরিয়াও দেখে না

'আমার সম্পূর্ণ সামর্থ্য ফিরিয়া পাইবার পূর্ব্বেই হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে আর থাকিতে দিলেন না। আমার ছুটী হইল। আমি একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া পূর্ব্বে যে বাসায় আমরা থাকিতাম, সেইখানে উপস্থিত হইলাম; কিন্তু সেখানে গিয়া কি দেখিলাম?—দেখিলাম, সে বাড়ীর দরজায় তালা বন্ধ। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, যে নীলরতন বাবু বাটী ভাড়া বন্ধ করিয়া পূর্ব্বে যে ভাবে পাঁচ জনের সহিত মেশে থাকিতেন, এখনও সেই ভাবে থাকেন। আমি অনুসন্ধান করিয়া সেখানেও উপস্থিত হইলাম। তাঁহার বাটীতে প্রবেশ করা যুক্তিসিদ্ধ নয় বলিয়া লোক দ্বারা তাঁহাকে সংবাদ দিলাম. অনেকক্ষণ পরে তিনি আসিলেন, আমাকে দেখিয়াই যেন তিনি বিরক্ত হইলেন। আমি তাঁহাকে বাসায় যাইবার জন্য বলিলাম। তিনি আমার কোন কথাই কানে তুলিলেন না। অনেক বলাতে তিনি স্পষ্টই বলিলেন যে. আমার সহবাসে থাকা আর তাঁহার অভিপ্রায় নহে, তখন আমাকে তিনি সোজা রাস্তা দেখাইয়া দিলেন;— বলিলেন, 'আমি ত তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রী নই যে, তাঁহার উপর আমার আধিপত্য খাটিবে?' তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি তাঁহার নিকট আমার অলঙ্কারাদি ও গৃহসজ্জা, আসবাবপত্রের কথা বলিলাম। যখন অসুস্থ অবস্থায় হাঁসপাতালে গিয়াছিলাম, যাইবার পূর্ব্বে আমার সমস্ত গহনা তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। এখন তাঁহাকে সেই সমস্ত অলঙ্কার আমাকে ফিরাইয়া দিতে বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া তিনি বিস্মিতভাবে বলিলেন, 'আমি কি তাঁহাকে পরিহাস করিতেছি, তাঁহার নিকট আমার কোন অলঙ্কারই ত আমি

রাখি নাই।' তাঁহার উত্তর শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম, এত ক্ষণে দুনিয়া কেমন, তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম। আমি কাঁদিতে লাগিলাম, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে অনেক করিয়া বলিলাম, আমাকে পথের ভিখারিণী করিও না। আমার আর দাঁড়াইবার উপায় নাই, আমার কোন সম্বল নাই। কিন্তু নির্দ্দয়-হৃদয় লম্পট পুরুষের অন্তরে দয়া কোথায়? আমার কাতরতায় দুঃখ প্রকাশ করা দূরে থাক, তিনি আমায় কদর্য্য ভাষায় পরিহাস করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমি তাঁহার নিকট ভিক্ষাস্বরূপ কিছু চাহিলাম। আমি যে গাড়ীতে আসিয়াছি, তাহার ভাড়া দিবারও সঙ্গতি আমার নাই। আমার অনেক কাতরতায় নীলরতন বাবু অনিচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে মাত্র দশটি টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিলেন। আমার দুই তিন হাজার টাকার অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে তিনি আমাকে দশটি টাকা দিলেন, আমি সেই দশ টাকা সম্বল করিয়া কলিকাতায় আসিলাম। কৃষ্ণনগরে থাকিতে আমার আর প্রবৃত্তি হইল না। পথে আসিতে আসিতে মনে ভাবিলাম, কলিকাতায় গিয়া কি করিব, কোথায় বা আশ্রয় পাইব, আর কি করিয়া অন্ন-বস্ত্রের সংকুলান করিব? পথে আসিতে আসিতে আমার চারি টাকা খরচ হইয়া গেল, আমার সম্বল মাত্র ছয়টি টাকা রহিল। এইবার আমার স্বামীর অভিসম্পাত সফল হইবে, আর আমার ভিক্ষা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কিন্তু রেলে আসিতে আসিতে একটি স্ত্রীলোকের সহিত আমার আলাপ হইল। কথায় কথায় আমি তাঁহাকে আমার দুঃখের বিষয়ে অনেকটা পরিচয় দিলাম। আমার সঙ্গিনী সেই স্ত্রীলোকটি আমাকে

আশ্বাস দিয়া বলিল, 'আমাকে আপাততঃ তাহার বাটীতে স্থান দিতে পারে।' শিয়ালদহ ষ্টেশনে নামিয়া আমি তাহার সহিত তাহার বাটীতে যাইলাম। রামবাগানে তাহার একটি খোলার বাটী ছিল। তাহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, সব ঘরগুলিতেই এক একজন স্ত্রীলোক ভাড়াটিয়া। তাহাদের ভিতর অনেকেই দিবসে গৃহস্থের বাটীতে দাসীবৃত্তি করে এবং রাত্রিকালে উপপতির সহবাসে রাত্রিযাপন করে। বাড়ীওয়ালী—আমার সেই সঙ্গিনী—আমাকেও সেই উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিল। সেই দিন আমার মনে হইল, আমি জমীদার সীতানাথ রায়ের একমাত্র আদরের কন্যা, এখনও আমার পিতার বৃহৎ অট্টালিকা কলিকাতায় বর্ত্তমান। এক সময়ে ভোগৈশ্বর্য্যের সমুদ্রমধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াও আমার তৃপ্তি হইত না, আর আজ সেই আমি সামান্য অন্নবস্ত্রের জন্য অপরের বাটীতে দাসীবৃত্তি করিতে যাইতেছি, ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া শূদ্রের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে আমাকে বাধ্য হইতে হইতেছে। কি করিব, আমি নিজের দোষে আমার ইহকাল পরকাল সবই নষ্ট করিয়াছি। এইরূপ ভাবে আমার কিছু দিন কাটিয়া গেল। সেই অবস্থাতেও আমার একজন উপপতি জুটিল। বলিতে লজ্জা হয়, তখনও আমার কামপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে শিথিল হয় নাই, দর্পণে আমার চেহারা দেখিয়া আমি আপনাকে চিনিতে পারিতাম না। কাল বসন্তরোগে আমার কি পরিবর্ত্তনই হইয়াছে। তবুও উপপতির ক্রোড়ে রাত্রিযাপন করিতে আমার মনে উল্লাস হইত। রামবাগানে সেই বাড়ীর পার্শ্বেই অপর একজন বেশ্যার সহিত আমার খুব প্রণয় হইল। গল্পচ্ছলে আমি একদিন

তাহাকে বলিলাম, দাসীবৃত্তি করা আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়াছে। আমি আর এত পরিশ্রম করিতে পারি না, অথচ না করিলেও চলে না। যে মানুষটি আমার ঘরে আসে সে কোন মাসে চারি টাকা, কোন মাসে তিন টাকা মাত্র আমাকে দেয়। আর সে দেবেই বা কোথা হ'তে, সে রাঁধুনী বামুন, তার মাইনে সবে মাত্র পাঁচ টাকা। চারি পাঁচ টাকায় কলিকাতা সহরে কি হইবে? একজনের খেতে পরতে আর ঘরভাড়া দিয়ে থাকতে মাসে দশ টাকার উপর খরচ, এত সে কোথায় পাবে? কাজে কাজেই আমার দাসীবৃত্তি করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কিন্তু আর আমি পারি না। সেই বেশ্যা আমাকে পরামর্শ দিল যে, আমি যদি তাহার কথামত চলিতে পারি, তাহা হইলে আমাকে আর দাসীর কাজ করিতে হইবে না। সে আমাকে বলিল, সন্ধ্যার পর সাজসজ্জা করিয়া, মুখে রং মাখিয়া, ঠোঁটে আল্‌তা দিয়া যদি রাস্তায় দাঁড়াতে পারি, তাহা হইলে আমার প্রতিদিন দুই তিন টাকা উপার্জ্জন হইতে পারে। তাহাতে আবার আমার অলঙ্কারাদিও হইতে পারে। তাহারই কথামতে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর রাস্তার ধারে উপপতির উদ্দেশে দাঁড়াইতে আরম্ভ করিলাম। কোন দিন দুই জন, কোন দিন তিন জন, কোন দিন তাহারও অধিক পুরুষমানুষ আমার গৃহে আসিতে আরম্ভ করিল। আমারও বেশ রোজগার হইতে লাগিল। অল্পদিন এই ভাবে কাটাইয়া আমার শরীরভঙ্গ হইতে লাগিল। তখন আমার কামপ্রবৃত্তি একেবারে শিথিল হইয়া গিয়াছে। দেহের উপর এত অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু কি করি, অর্থের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না, কারণ, তখন

অর্থের উপর আমার বিলক্ষণ মায়া জন্মিয়াছিল। আমার সেই পরামর্শদাত্রীকে বলিলে বলিত, কিছু দিন পরে সবই সহ্য হইয়া যাইবে। এখন রোজগারের সময়, কিছু টাকা রোজগার করিতে পারিলে পরে বেশ সুখে চলিতে পারে। আমিও তাহার কথাই যুক্তিসিদ্ধ স্থির করিয়া সেই ভাবেই চলিতে লাগিলাম; কিন্তু জগদীশ্বর আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত অসম্পূর্ণ রাখিলেন না। দুষ্টলোকের সহবাসে আমি কঠিন উপদংশরোগে আক্রান্ত হইলাম। সে রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে আমাকে আবার হাঁসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইল না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে আমার সমস্ত শরীরে ক্ষত হইল। তাহারই পরিণাম এই কুষ্ঠরোগ। হাঁসপাতালের ডাক্তারেরা আমাকে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত দেখিয়া হাঁসপাতাল হইতে বিতাড়িত করিল। তখন কি করি, উদরান্নের আর অন্য উপায় নাই, এ দিকে চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছি; কাজে কাজেই এই কালীঘাটে আসিয়া রাস্তায় বসিয়া ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার স্বামীর অভিসম্পাত সম্পূর্ণরূপে সফল হইল, আমার পাপের শাস্তি সম্পূর্ণ হইল। আর আমার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই, কেবল স্বামীর চরণ দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব, এই জন্য এ পাপপ্রাণ এতদিন রাখিয়াছি, নচেৎ আমি গঙ্গায় গিয়া ডুবিয়া মরিতাম।

মনোরমার কথা শুনিয়া সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। হরেন্দ্রকুমারের অভিশাপ বর্ণে বর্ণে সত্য হইল। পাপিষ্ঠা মনোরমা তাহার স্বেচ্ছাকৃত পাপের যে এতদূর দণ্ড পাইবে, তাহা

কেহই ভাবে নাই; তবে যে তাহাকে অনুতাপে দগ্ধ হইতে হইবে, তাহার কৃতকর্ম্মের ফল ইহজন্মে না হউক, পরজন্মেও ভোগ করিতে হইবে, এ কথা সকলেই স্থির করিয়াছিলেন। মনোরমার অত্যাচারে হরেন্দ্রকুমারের অন্তরে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা তিনি নীরবে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণের নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন, তিনি অপক্ষপাত বিচারে মনোরমার উপযুক্ত শাস্তি দিয়া জগতের সমস্ত স্ত্রীলোককে সাবধান করিয়া দিলেন। মনুষ্য-জীবনে হরেন্দ্রকুমারের কোন সাধই পূর্ণ হয় নাই,—সে কেবল মনোরমাকে বিবাহ করিয়া। দাম্পত্য-প্রণয় পার্থিব জীবনে সর্ব্বসুখের আকর। বাল্যকালে বালক-বালিকা মৃত্তিকার পুতুল লইয়া ক্রীড়া করে, কালে তাহাদের সেই খেলা সত্যে পরিণত হয়। জীবনে পুতুল খেলিয়াই হরেন্দ্রকুমারের সমস্ত সাধ মিটিয়া গেল। তবুও আজ মনোরমার এই অবস্থা দেখিয়া তিনি অন্তরে ব্যথা পাইলেন। সে ত তাহার পরিণীতা ভার্য্যা। যদি সে সৎপথে থাকিত, তাঁহাকে শ্রদ্ধা-যত্ন করিত, তাহা হইলে তাহাকে লইয়া আজ তিনি সংসারে কত সুখী হইতেন।

সদানন্দঠাকুর মনোরমার অবস্থা দেখিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়া প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইলেন। হায়, অভাগিনী না বুঝিয়া যে কার্য্য করিয়াছে, সে কার্য্যের কি ভয়ানক পরিণাম! তাহার কৃতকার্য্যের যে এইরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটিবে, ইহা কেহই ভাবেন নাই। আজ যদি সুখদা উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার বাল্যকালের ক্রীড়া-সঙ্গিনীকে এই অবস্থায় দেখিয়া না জানি, প্রাণে কতই ব্যথা পাইতেন। সুখদা এক সময়ে মনো-

রমার ভবিষ্যৎ ভাগ্যের বিষয় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাকে সৎপরামর্শ দিয়া তাহার মন ফিরাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তখন মনোরমা ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে সঙ্গিনীর সেই সব মধুর উপদেশে কর্ণপাত করে নাই। তাই আজ তাহার ভাগ্যের এত বিপর্য্যয়।

মনোরমার কথা শেষ হইলে সন্ন্যাসী ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি মনোরমার সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া সদানন্দ ও হরেন্দ্রকুমারকে বলিলেন, "তোমরা কিছুক্ষণ এই স্থানে অপেক্ষা কর, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ কোথাও যাইও না।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর চলিয়া গেলে সদানন্দ বলিলেন, "আমাদের প্রতি ঠাকুরের এত অনুগ্রহের কারণ কি? আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আমাদের হিতার্থে তাঁহার কেন এত আকিঞ্চন!"

হরেন্দ্র। তিনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, পরোপকারই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহার মহৎ প্রাণ পরদুঃখে সদাই কাতর।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দুইবন্ধুতে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর সন্ন্যাসী ঠাকুর ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই জন অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক ও একজন পরিণতবয়স্ক ভদ্রলোক। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে, গৃহে মৃণ্ময় প্রদীপের ক্ষীণালোকে সদানন্দ কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না।

সন্ন্যাসী ঠাকুর অগ্রবর্ত্তিনী স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা! অগ্রে তোমার স্বামীকে প্রণাম কর। ইঁহার হৃদয় আমা অপেক্ষাও উচ্চ, আর সেই জন্য আজ ইনি সর্ব্বাপেক্ষা সুখী।"

সুখদা তখন স্বামীর পদতলে মস্তক নত করিলেন। বেতস-পত্রের মত তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল, চক্ষের জলে গণ্ডস্থল প্লাবিত। এক অপার্থিব উজ্জ্বল আলোকে তাঁহার সমস্ত হৃদয় উদ্ভাসিত। স্বামীবিয়োগবিধুরার যে চক্ষের জল এক দিন সহস্র ধারায় বিগলিত হইয়াছিল, আজ সেই চক্ষের জল আবার স্রোতের মত তাঁহাকে কোন স্বর্গরাজ্যে লইয়া ভাসাইয়া দিল। কিন্তু সে কি দিন আর আজ কি দিন!

সদানন্দ ঠাকুর চমকিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। আনন্দে বিহ্বল হইয়া তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি অনিমেষনেত্রে কেবল সেই দেবোপম সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; ভক্তিভরে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "প্রভু, এই আনন্দ-সমাগমের জন্য কি আমাকে এইরূপ ঘোরতর পরীক্ষায় ফেলিয়াছিলেন? প্রার্থনা, আপনার চরণ-দর্শনে যেন বঞ্চিত না হই।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর হরেন্দ্রকুমারকে বলিলেন, "বৎস, মনোরমা যাই হউক না কেন, সে তোমার পরিণীতা ভার্য্যা। তাহার পাপের শাস্তি ভগবান্ দিয়াছেন, তুমি তাহাকে ক্ষমা কর। এখন সে তোমার শরণাপন্না, সুতরাং এখন যেন দুর্ভাগিনী অন্নবস্ত্রের জন্য আর ভিক্ষা না করে।"

হরেন্দ্রকুমার তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। তাহার পর সন্ন্যাসী ঠাকুর রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দিকে ফিরিয়া সদানন্দকে বলিলেন, "বৎস, ইনি আমার এক জন প্রিয়শিষ্য। ইঁহারই আলয়ে তোমার স্ত্রী এত দিন প্রতিপালিত হইয়া-

ছেন। সুখদাকে ইনি কন্যার মত স্নেহ করেন। আমা-দের কালীঘাটে আসিবার পূর্ব্বে দিনস্থির করিয়া সুখদাকে আর ইহাঁর কন্যাকে এখানে আনিবার জন্য আমি ইহাঁকে পত্র লিখিয়াছিলাম। ইনি সপরিবারেই এখানে আসিয়া নিকটেই বাসা করিয়া আছেন।"

রামকান্ত বাবুর কন্যা শোভনা সুন্দরীর দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, "মা, তুমি ত এখন তোমার স্বামী-পুত্র লইয়া সুখী হইয়াছ। আমি ত তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে তোমার দুঃখের নিশি সত্বরেই অবসান হইবে।"

তাহার পর তিনি সুখদার হস্ত ধরিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা, আমার পুণ্য-প্রতিমা নিজের পুণ্যে নিজের স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়াছেন। আর এইরূপ পুণ্য-প্রতি-মার অস্তিত্বে আমাদের হিন্দু-ধর্ম্মের অস্তিত্ব। তোমরা সকলেই মনে রেখ, ধর্ম্মকে রাখিলে ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করেন।

সম্পূর্ণ।

অনর্থক গল্প নহে, বাজে উপকথা নহে, অদ্ভুত কল্পনা জল্পনা নহে,
সাজান মনোরম্য মিথ্যা উপাখ্যান নহে বা
ঠাকুরমার রচা কথা নহে—

যাহা জানিবার জন্য, যাহা বুঝিবার জন্য জাত ব্যক্তিমাত্রেই
ব্যাকুল, যে অবস্থা আজ পর্যন্ত কোন জীবিত
ব্যক্তিরই উপলব্ধির বিষয় নহে, সেই
নিদারুণ মৃত্যুরহস্যপূর্ণ বঙ্গের
অভিনব পুস্তক—

পরলোক ও প্রেততত্ত্ব

সুবিখ্যাত বসুমতী সম্পাদক, বঙ্গের যাবতীয় মাসিকপত্রে গবেষণা-
পূর্ণ প্রবন্ধ লেখক শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

বেদান্তের আত্মা সম্বন্ধে গভীর হইতে গভীরতম মতবাদ সমূহ, আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকবাদ কিরূপ সত্য-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ পরলোক ও প্রেততত্ত্বে পাইবেন।

'যে রোগী বিকারাবস্থায় মৃত ব্যক্তি দর্শন করে, তাহার জীবনের আশা নাই' এই প্রচলিত বিশ্বাসের বহু নিদর্শন ইহাতে পাইবেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ আত্মা, পরলোক ও প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল অলৌকিক অদ্ভুত রহস্য স্বচক্ষে দেখিয়া, তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া, যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই সকল ভৌতিক দৃশ্যাবলী ও তাহার প্রমাণগুলি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

মানবের পরিণাম, আত্মার অবিনশ্বরত্ব, ভৌতিক দৃশ্যাবলী, অ-চিন্ত্য স্বপ্নাবলী, কোন্ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার বিবরণ পড়িলে সমূহ আশ্চর্য্য হইতে হইবে। মূল্য ১৲ এক টাকা।

সকলে পত্র লিখুন,

আর্য্য-সারস্বত ভাণ্ডার।

১৮।১ নং গ্রে-ষ্ট্রীট, শোভাবাজার কলিকাতা।